সঙ্গীত-পরিক্রমা

নারায়ণ চৌধুরী

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—রাস পূর্ণিমা ১৩৬৭

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

মায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ন'বছর আগে 'সঙ্গীত-পরিক্রমা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালের চার বছরের মধ্যেই সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তির দরুন তখন তখুনি বইয়ের আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্বের অন্যান্য হেতুর মধ্যে এই একটি হেতু যে, বইখানাকে ইতোমধ্যে আগাগোড়া পরিমার্জিত করা হয়েছে। পুরাতন প্রবন্ধগুলির উপরে ছটি প্রবন্ধ এই সংস্করণে নূতন সংযোজিত হল। এ ছাড়া বইয়ের উপসংহারে পাঠকদের সুবিধার জন্য একটি বিশদ নির্ঘণ্ট জুড়ে দেওয়া হল। ফলে গ্রন্থের কলেবর পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংস্করণে সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞানীদের একাধিক ছবি দেওয়া হল; পূর্ব-সংস্করণে ছবি ছিল না। এই সব নানা কারণে গ্রন্থের প্রকাশে বিলম্ব হল।

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে রীডার্স কর্নারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন, এই সুযোগে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থকার

সূচী

সঙ্গীত-পরিচয়

ন্যায়শাস্ত্রে বলে, কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে কিংবা সে সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে আগে বিষয়টির সংজ্ঞা (Definition) নির্দেশ করা প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লোকের ধারণা যদি অস্পষ্ট থাকে তা হলে আলোচনা করেও কোন ফল হয় না—অস্পষ্টতার কুয়াসায় বুদ্ধি এবং বোধ ঝাপসা হয়ে আলোচনাকে দুর্বোধ্য করে তোলে মাত্র।

সঙ্গীতের আলোচনাতেও এই সংজ্ঞানির্ণয়ের প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করি এমন ভাবে যেন সকলেই সঙ্গীতের বিশিষ্ট পরিভাষাগুলি জানেন; যেন ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী কাকে বলে এগুলি কারও জানবার দরকার নেই। এদের নাম গোত্র পরিচয় সকলেরই জানা আছে এইরূপ ধরে নিয়েই আমরা আলোচনা শুরু করি। কিন্তু এতে করে অজ্ঞাতসারে সাধারণ পাঠকের প্রতি আমরা কত যে অবিচার করি তা একবার ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখা কর্তব্য। সকলেই কিছু আর সঙ্গীতজ্ঞ নন; সঙ্গীত সম্বন্ধে একেবারে কিছু না জানাও কারও কারও পক্ষে সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে লেখকের স্পষ্ট কর্তব্য হল সঙ্গীতের আলোচনার মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের পরিচয় সর্বজনসমক্ষে উপস্থাপিত করা এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি সবাইকে ধরিয়ে দেওয়া। তা না করে আমরা যদি শুধু technical আলোচনা চালিয়ে যাই তা হলে মুষ্টিমেয় সংখ্যক পাঠকের দরবারে হয়ত পৌছতে পারব, কিন্তু সাধারণ পাঠকের বিরাট জনতা আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। এইজন্যেই প্রয়োজন সর্বজনবোধ্য রচনার, বিশেষতঃ সঙ্গীতের মত একটি technical বিষয়ের আলোচনায় তার প্রয়োজন আরও বেশী। জটিল বিষয়ের জট ছাড়িয়ে তাকে সহজ সরল করে তোলাই হল লেখকের প্রাথমিক কাজ। অস্পষ্টতার চড়ায় ঠেকে মহান্ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কত রচনা যে বানচাল হয়ে যায় তার আর ইয়ত্তা নেই।

আমরা বর্তমান নিবন্ধে আর কিছু পারি আর না পারি, সুস্পষ্ট হতে চেষ্টা করব। আলোচ্য নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল সঙ্গীতের বিভিন্ন শ্রেণী ও

'স্টাইলের' সঙ্গে সাধারণ পাঠকের একটা মোটামুটি পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া। এই আলোচনা যদি পাঠকদের ভাল লাগে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু পরিমাণেও তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহকে জাগ্রত করে তা হলে ভবিষ্যতেও এই ধরনের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারি।

ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি

ভারতীয় সঙ্গীতের কী করে উৎপত্তি হল সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। আমাদের প্রত্যেকটি শিল্পকলার পিছনে ধর্মের উদ্দীপনা বর্তমান, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, ভরতমুনি ভগবান ব্রহ্মার কাছ থেকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখে তা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের শেখান ; তা থেকেই সঙ্গীতের প্রচার আরম্ভ হয়। এখানে 'সঙ্গীত' বলতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিকে বুঝতে হবে। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে সঙ্গীতের অপর নাম 'তৌর্যত্রিক'—অর্থাৎ গীত বাদ্য নর্তনের একীভূত রূপ হল সঙ্গীত। অপর এক মতানুসারে মহাদেব সপ্তস্বরের মধ্যে পাঁচটি স্বর আবিষ্কার করেছেন, আর বাকী দু'টি স্বর আবিষ্কার করেছেন তাঁর ঘরণী পার্বতী। শোনা যায় শাস্ত্রোক্ত ছয় রাগ মহাদেবেরই সৃষ্টি।

এ সবই পৌরাণিক বৃত্তান্ত। তাদের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই ; অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে সব সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় নি। ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার করলে দেখা যায়, ঋগ্‌বেদের অধ্যায়েই প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের সূচনা। ঋগ্‌বেদের স্তোত্রগুলি তিনটি সুরে আবৃত্তি করা হত—সেই উদাত্তমধুর কণ্ঠের আবৃত্তির ভঙ্গি অব্যাহত ধারায় আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে স্থায়ি-ভাবে বসতি স্থাপন করলেন, তখন ঋষিদের দ্বারা সৌম্য শান্ত আশ্রমিক আবহাওয়ায় 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষদ্'গুলি রচিত হয়। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ উভয়ই আবৃত্তির ভঙ্গিতে রচিত। তবে সঠিক কী কী সুরে তাদের আবৃত্তি করা হত অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করেও আজ পর্যন্ত তা জানা যায় নি। কেবল এটা বোঝা যায়, ভারতভূমিতে আর্যদের আগমনের পরে এ দেশে সঙ্গীতের একটি নির্দিষ্ট রূপ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং রামায়ণ মহাভারতের যুগে তা বিস্তার লাভ করে স্থায়ী শিল্পকলার মর্যাদা লাভ করে। স্বার

উইলিয়াম হান্টাবেব মতে পাণিনিব (খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ সাল) অভ্যুদয়েব পূর্বেই ভাবতে সপ্তস্ববেব প্রকৃতি ও পদ্ধতি স্থিবীকৃত হয়ে গিয়েছিল ; 'সা বে গা মা' অক্ষবগুলিব উদ্ভব তখন থেকেই।*

সঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ

ভাবতীয় সঙ্গীতকে দুই ভাগে ভাগ কবা যায়। এক 'মার্গ সঙ্গীত', অপব 'দেশী সঙ্গীত'। শাস্ত্রমতে মার্গ সঙ্গীতকে বলা হত স্বর্গবাজ্যেব সঙ্গীত, আব দেশী সঙ্গীতকে মর্ত্য অঞ্চলেব সঙ্গীতরূপে অভিহিত কবা হত। কিন্তু বর্তমানে এই অর্থেব পবিবর্তন ঘটেছে। এখন মার্গ সঙ্গীত বলতে বোঝায় উচ্চাঙ্গ ভাবতীয় সঙ্গীত (যেমন 'ধ্রুপদ', 'খেয়াল' ইত্যাদি), আব দেশী সঙ্গীত বলতে সঙ্গীতেব লৌকিক রূপ, যেমন ভাটিয়ালী, সাবি, বাউল, মাবফতী, ঝুমুব, লাউনি ইত্যাদি গান বোঝায়।

এবাবে ভাবতীয় সঙ্গীতেব কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীব গানের সঙ্গে পাঠকদেব পবিচয় কবিয়ে দেবাব চেষ্টা কবা হবে। ধ্রুপদ, হোবী, ধামাব, খেয়াল, তেলেনা, কাওয়ালী, ঠুংবী, টপ্পা ও গজল এই কয়েকটি শ্রেণীব গানেব উপবই আপাততঃ আমবা আমাদেব লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত কবব। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ভাবতীয় সঙ্গীতেব আওতা থেকে আমবা ইচ্ছা কবেই দক্ষিণ ভাবতীয় সঙ্গীতকে বাদ দিয়েছি। কাবণ দক্ষিণী সঙ্গীত শাস্ত্রানুসাবী হলেও তাব ধবনধাবন উত্তব ভাবতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি থেকে এত আলাদা যে তাব আলোচনাব জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। সুতবাং বর্তমান আলোচনায় শুধু উত্তব ভাবতীয় সঙ্গীতেব উপবই দৃষ্টি নিবদ্ধ কবা হবে।

ধ্রুপদ

ধ্রুপদ উত্তব ভাবতীয় সঙ্গীতের আদি এবং বিশুদ্ধ রূপ। এব আগে যে সঙ্গীত প্রচলিত ছিল তা ছিল একপ্রকার টানা বচনা। তাকে সঙ্গীত না

* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' নামক বিশাল গ্রন্থে ভারতীয় সঙ্গীতেব আদি ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকদেব সে আলোচনা পড়ে দেখতে অনুরোধ কবি।

বলে সঙ্গীতের কাঠামো বলাই অধিক সঙ্গত। তাকে 'প্রবন্ধ' বলা হত। এই 'প্রবন্ধ' থেকেই ধ্রুপদের উৎপত্তি। কীর্তনও 'প্রবন্ধের' অন্য আর এক-প্রকার ঘনীভূত রূপ। আজকাল এই সঙ্গীতের রূপ নিম্নস্তরের গায়কদের কণ্ঠে যদিও অনেকখানি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে তা হলেও ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সহজাত গাম্ভীর্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই। ধ্রুপদ গানের এমনই একটি বিশিষ্ট মহিমা আছে যা আর কোন শ্রেণীর গানে চোখে পড়ে না। শোনা যায় গোয়ালিয়রের রাজা মান হিন্দু-মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞদের আহ্বান করে প্রথমে ধ্রুপদকে একটি নির্দিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে এ থেকে তিনিই ধ্রুপদ গানের উদ্ভাবয়িতা এ কথা বলা যায় না, যা অনেক ঐতিহাসিক ভুল করে বলেন। বস্তুতঃ, ধ্রুপদ বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল—রাজা মান তাকে একটি সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন মাত্র। ধ্রুপদের 'গীত' রূপের উল্লেখ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা ধ্রুপদের যে রূপ দেখতে পাই তার সূচনা আলাউদ্দিন খিলিজীর সময় থেকে। গোপাল নায়ক, আমীর খস্রু, বৈজু বাওবা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়ক সকলেই এই সময়কার এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই গান ধ্রুপদাঙ্গে রচিত। ধ্রুপদেরই একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাম হল 'হোরী' যা বসন্তকালে গীত হয়। আমীর খস্রুর সময়ে 'হোরী' আর 'ধামার' এই দুটি কথা সমার্থক ছিল। কিন্তু তাদের ভিতর অর্থভেদ আছে। 'হোরী' হল ধ্রুপদের একটি শ্রেণীর নাম, কিন্তু 'ধামার' তা নয়, ধামার হচ্ছে একটি তাল যাতে 'হোরী' গাওয়া হয়। হোরীর সঙ্গে ধামারের নিকট সম্বন্ধ আছে বলেই অনেকে ভুল করে ধামারকে একটি গানের শ্রেণী বলে মনে করেন, এমন কি ওস্তাদদেরও এ ভুল করতে দেখা যায়। আবার এদিকে 'হোরী' আর 'হোলী' এক বস্তু নয়। 'হোরী' হচ্ছে ধামার তালে গাওয়া বসন্তকালীন ধ্রুপদাঙ্গ গান, আর 'হোলী' হল ধামার তাল ছাড়া অন্য তালে (যথা চাঁচর বা দীপচাঁদি) গাওয়া বসন্ত-সঙ্গীত।

'ধ্রুপদ' কথাটি অর্থব্যঞ্জক। ধ্রুপদের কলিগুলি এমন ভাবে গাইতে হবে যাতে শাস্ত্রকথিত বিধির এতটুকু নড়চড না হয়। সুরের প্রকাশ হবে ধ্রুবতারার মত স্থির, অচঞ্চল ; চটুলতার কোন অবকাশ তাতে থাকবে না। ধ্রুপদের চারটি কলি, পারিভাষিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'তুক' ; যথা,

'আস্থায়ী' 'অন্তরা', 'সঞ্চারী', 'আভোগ'। ধ্রুপদ গায়ক প্রথমে আলাপ অর্থাৎ 'তা না না না' প্রভৃতি কতকগুলি ধ্বনিবাচক অর্থহীন কথার সাহায্যে ধ্রুপদের রাগরূপ ফুটিয়ে তোলেন, তারপর আরম্ভ হয় গান। সাধারণতঃ চৌতাল, ধামার প্রভৃতি ছন্দে ধ্রুপদ গাওয়ার নিয়ম। ধ্রুপদকে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের সহায়ক বলে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলি সবই ধ্রুপদাঙ্গে রচিত। ধ্রুপদিয়াদের বহুদিন সযত্নে কণ্ঠ-সাধনা করতে হয়। কণ্ঠ আশানুরূপ মার্জিত না হলে ধ্রুপদ গাওয়ায় সুফল পাওয়া যায় না। সুরের অবিকৃত রূপ কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ধ্রুপদ ধ্রুপদ নয়; স্বরের গাম্ভীর্য ও বিশিষ্টতাও সেইজন্য দরকার। কাজেই দীর্ঘকালস্থায়ী অনুশীলন ব্যতিরেকে ধ্রুপদ গান গাওয়া চলে না। ধ্রুপদে তানকর্তব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তান খেয়ালের অঙ্গ, ধ্রুপদে তার স্থান নেই। 'শুদ্ধবাণী' ও 'খাণ্ডারবাণী' এই দুই ধরনের ধ্রুপদ শুনতে পাওয়া যায়। 'খাণ্ডারবাণী' ধ্রুপদে 'গমক' নামক অলঙ্করণের স্থান প্রশস্ত, খানিকটা বৈচিত্র্যেরও তাতে অবতারণা করা চলে। কিন্তু 'শুদ্ধবাণী' একেবারেই শুদ্ধ, তাতে বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই। তানসেন তাঁর গুরু স্বামী হরিদাসের অনুসরণে শুদ্ধবাণী ধ্রুপদই শুধু গাইতেন, খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়।

ধ্রুপদেবই সমজাতীয় এক শ্রেণীব গান আছে, নাম তার 'সাদ্‌রা'। 'সাদ্‌বার' গতি ত্বরান্বিত; লাফ দিয়ে দিয়ে সে চলে। ঝাঁপতালের লয়ে ও প্রধানতঃ বীররসপ্রধান বিষয়কে নিয়ে সাদ্‌রা রচিত হয়। এতেও তানের অবকাশ নেই।

ধ্রুপদ গানের ধারা পৃষ্ঠপোষকতাব অভাবে অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বর্তমানে ভাল ধ্রুপদ গাইয়ে নেই বললেই চলে। যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী ও অঘোরবাবুর পর এ যুগে গোপালবাবু ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ললিতবাবু ধ্রুপদ গানে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন; দুঃখের বিষয় শেষোক্ত দুজনেই আজ স্বর্গত। ধ্রুপদের চর্চা ম্রিয়মাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখোয়াজেব চর্চাও দেশ থেকে প্রায় উঠে গেছে। দুর্লভবাবুর পর আর ভালো পাখোয়াজী হল কোথায়? কিছুদিন আগে পর্যন্ত দানিবাবু (সতীশচন্দ্র দত্ত) ও কেবলবাবুই (অরুণপ্রকাশ অধিকারী) ছিলেন একমাত্র ভরসা। তাঁরাও আজ মৃত। উত্তর ভারতেও বর্তমানে ভাল ধ্রুপদিয়ার

একান্ত অভাব। একে একে সবগুলি দেউটিই নিভে গেছে। ওস্তাদ আলাবন্দে খাঁ ও ওস্তাদ জাকরুদ্দিন খাঁর পর ইন্দোরের নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব ছিলেন সবচেয়ে বড় ধ্রুপদিয়া। তিনিও বেশ কয়েক বৎসর হল পরলোক গমন করেছেন। নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব একবার কলকাতায় অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন, সে কথা সঙ্গীতরসিকগণ নিশ্চয় ভুলে যান নি।

খেয়াল

মুঘল যুগে ধ্রুপদের জায়গা জুড়ে বসল খেয়াল। মুঘল বাদশারা সঙ্গীতকে জাগতিক সুখভোগের অন্যতম উপকরণ বলে মনে করতেন। সুখলাভের সোপানরূপে ছিল তার ব্যবহার। কাজেই সঙ্গীতের প্রাচীন মহিমা ও আধ্যাত্মিক গৌরব আর টিকল না; ধ্যানের আসন থেকে সঙ্গীতকে নেমে আসতে হল আলোকমালাসজ্জিত, আতরসুবাসিত আসরে। আর যেহেতু খেয়াল গানে সুরবিকাশের স্বাধীনতা (freedom of interpretation) অবারিত এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমায় তা উজ্জ্বল, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ধ্রুপদের সমাদর কমে গিয়ে বিলাসব্যসনের যুগে খেয়ালের কদর বাড়ল। খেয়াল গায়করা কী হলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক বাদশারা খুশি হন সর্বদা সেই চেষ্টা করতেন। তার ফলে সুরে এল বৈচিত্র্য; গানে নতুন নতুন ভঙ্গি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা দেখা দিল। তান এই নূতনত্ব প্রয়াসের একটি প্রধান উপকরণরূপে সমাদৃত হতে লাগল। রাগিণীর বিস্তারেও ওস্তাদরা নিত্য নতুন চটক দেখাবার পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন।

কথিত আছে, আলাউদ্দিন খিলিজির সভাগায়ক প্রথিতযশা সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খস্রু 'খেয়াল' আবিষ্কার করেন। 'তেলেনা'ও নাকি তাঁর আবিষ্কার। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরের শাসনকর্তা হুসেন শাহ শর্কী খেয়াল গানের উন্নতি বিধান এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেন। এতৎসত্ত্বেও ওস্তাদমহলে বহুদিন পর্যন্ত খেয়ালের কোনরূপ সমাদর ছিল না। আজকাল কাওয়ালি প্রভৃতি চটুলভাবাপন্ন গানকে আমরা যে মর্যাদা দিই, সে যুগে খেয়ালের মর্যাদা তার চাইতে বেশী ছিল না। অথচ কালপ্রভাবে খেয়াল গানের আজ কতই না সমাদর! আকবর বাদশাহের পর থেকেই ধীরে

ধীরে খেয়াল জাতে উঠতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে ক্ষীণপ্রভ মুঘল বাদশাহ মোহম্মদ শাহ্ রঙ্গিলার সভাগায়ক সদারঙ্গ (নিয়ামৎ খাঁ) ও অদারঙ্গের প্রচেষ্টায় খেয়াল বিশেষ কৌলিন্যলাভ করে। সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ উভয়েই ছিলেন ধ্রুপদিয়া। তাঁদের প্রবর্তিত ঢিমা খেয়ালের উদ্দেশ্য ছিল বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদের বলিষ্ঠতা ও গাম্ভীর্যকে খেয়ালে রূপ দান, সঙ্গে সঙ্গে আমীর খস্রু ও হুসেন শাহ শর্কীর জলদ খেয়ালের রঙ ও রস নষ্ট হতে না দেওয়া। এতদুভয়ের সমন্বয়ে তাঁরা খেয়ালের যে রূপ দাঁড় করালেন তা সত্যই অভুতপূর্ব। দুঃখের বিষয়, সদারঙ্গ-অদারঙ্গ প্রবর্তিত 'ঢিমা খেয়ালের' অবিকৃতরূপ আজকাল আর চোখে পড়ে না, শুধু তানের জৌলুসটাই এ যুগের ওস্তাদরা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

খেয়ালে ধ্রুপদের মত চারটি কলি থাকে না—আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুই অঙ্গতেই সে পূর্ণাবয়ব। খেয়ালেও ধ্রুপদেব মত আলাপের ধরনে গান আরম্ভ হয়; আলাপবন্দনা শেষ হলে তবে আস্থায়ীর বাক্‌স্ফূর্তি। বাগের সীমার মধ্যে গায়ক সুরকে যদৃচ্ছা লীলায়িত করতে পাবেন, খেয়াল গানে সে সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নেই। এই যদৃচ্ছা গাওয়ার পদ্ধতি থেকে আলাদা আলাদা 'ঘরানা'র সৃষ্টি। এক এক ঘবানা এক এক ভাবে সুরকে লীলায়িত করেন, এমন কি একই ঘবানার বিভিন্ন গায়ক ওই ঘবানার নির্দিষ্ট রূপটিকে বজায় রেখে ইচ্ছামত বিভিন্ন গায়কীতে (গাইবার ধরন,—এক কথায় যাকে বলে 'স্টাইল') গান গেয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। আজকাল অনেকেরই গায়কী মল্লযুদ্ধে রূপান্তব লাভ করেছে, সেগুলিকে গান বলা আর অধিকাংশ আধুনিক 'কবির' গদ্যচর্চিত রচনাকে কবিতা আখ্যা দেওয়া একই কথা।

তেলেনা

তেলেনা আমীর খস্রুর সৃষ্টি, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তুম্, তা না, দেরে, না দানি দিম্ প্রভৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কথার সমন্বয়ে রাগিণীর রূপ ফুটিয়ে তোলা তেলেনাব কাজ। রামপুরের বাহাদুর সেন খাঁ তেলেনায় অনেক গান বেঁধে গেছেন; আজও সে সব ওস্তাদদের মধ্যে প্রচলিত ও সমাদৃত। খেয়াল বহু বিলম্বে প্রচার সৌভাগ্য লাভ করে, তেলেনার ভাগ্যে কিন্তু বহুপূর্বেই সমাদর লাভ ঘটেছিল। আকবরের যুগে তেলেনা এমনই

আদরণীয় হয়ে উঠেছিল যে, আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে তাকে দিল্লীর 'দেশী সঙ্গীত' বলে অভিহিত করে গেছেন।

ঠুংরী

খেয়াল গানের চাইতে অপেক্ষাকৃত চটুলভাবাপন্ন, প্রেমবিষয়ক ঠুংরীর বিকাশ হয় লক্ষ্ণৌর নবাবদের আমলে। বিশেষতঃ নবাব ওয়াজিদ আলি শার প্রচেষ্টায় ঠুংরী অপরিসীম জনসমাদর লাভ করে। প্রথমে ওস্তাদদের আসরে ঠুংরী একেবারেই অপাংক্তেয় ছিল। কিন্তু কৌশলী ঠুংরী গায়কেরা জলদ খেয়ালের ঢঙে এমন ভাবে ঠুংরী গাইতে আরম্ভ করলেন যে ঠুংরী গাওয়া হচ্ছে কি খেয়াল গাওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে শ্রোতারা মনস্থির করে উঠতে পারলেন না। ঠুংরী গায়কদের তূণীরে এই কটি রাগের শর ছিল, যথা পিলু, খাম্বাজ, সোহিনী, তিলক-কামোদ, দেশ ইত্যাদি। এইজন্য ওই রাগগুলিকে আজিও শূদ্ররাগ বলা হয়। ঠুংরী সাধারণতঃ একাধারে কয়েকটি রাগের মিশ্রণ। তবে ঠুংরী গানে দরবারী-কানাড়া, ভৈরোঁ, শ্রী প্রভৃতি বড় বড় রাগের আশ্রয় সচরাচর গ্রহণ করা হয় না, ছোট ছোট হাল্কা রাগিণী নিয়েই তার কারবার। ঠুংরী গান আবেগপ্রধান, স্নুতরাং সেই সব রাগিণীই ঠুংরীতে প্রশস্ত যাদের ধাঁচটি হাল্কা। দরবারী-কানাড়া, শ্রী প্রভৃতির মত গুরুগম্ভীর প্রকৃতির রাগ ঠুংরীর প্রকৃতির সঙ্গে তেমন খাপ খায় না। তাছাড়া ঠুংরী মিশ্রণজাত গান বলে রাগরূপের কৌলীন্য অব্যাহত রাখা তাতে বড় কথা নয়, রাগের মিশ্রণের সাহায্যে ভাবকে রূপায়িত করে তোলাই তার প্রধান কাজ। একই ঠুংরী গানে গায়ক ইচ্ছা করলে পিলু, ভীমপলশ্রী, তিলক-কামোদ, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগিণীর ব্যবহার করতে পারেন, তবে দেখতে হবে রাগিণীগুলি যেন এক গোত্রের হয়—ভীমপলশ্রীর সঙ্গে পূরিয়ার মিশ্রণ, জৌনপুরীর সঙ্গে মূলতানীর মিশ্রণ, কিংবা এ-জাতীয় যে কোন বিপরীতধর্মী সুরের মিশ্রণ সেখানে অপ্রশস্ত।

টপ্পা ও দাদরা

লক্ষ্ণৌর নবাব আসাফ-উদ্‌-দৌল্লার আমলে পাঞ্জাবের মিঞা শৌরী টপ্পা গানের প্রবর্তন করেন। টপ্পাও ঠুংরীর মত শুদ্ধমাত্র পূর্বোক্ত শূদ্র রাগিণী-

গুলিতে গাওয়া হয়, বড় বড় রাগিণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। টপ্পায় কথার ভাগ হ্রস্ব, তানের অংশ দীর্ঘ। দীর্ঘবিলম্বিত ও আত্যন্তিক দানাদার তান-প্রয়োগের প্রভাবে টপ্পা গান প্রায়ই চটুলতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে—টপ্পায় অচঞ্চল স্থিতির ভাবটি নেই। সাধারণতঃ টপ্পা দাদরা তালে গাওয়া হয়, তা থেকে 'দাদরা' কথাটি আজকাল একটি বিশেষ শ্রেণীর গানের সমার্থক হয়ে পড়েছে।

গজল

সর্বশেষে গজল। গজল গান প্রেমবিষয়ক। মুঘল গৌরবের যুগে যে কাওয়ালী একদা লোকচিত্ত আকর্ষণ করত ও সূফী কবিদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, সেই কাওয়ালীরই ছিঁটেফোঁটা নিয়ে আজকালকার গজল গান তৈরী। গজল গানের প্রেরণা আসে পারস্যদেশ থেকে। গজল গানে সুরের ভাগ হ্রস্ব, কথাই সেখানে প্রধান অংশ জুড়ে আছে। নিতান্ত তাকে তালে ফেলা দরকার নইলে মান থাকে না, এই জন্যে গজল লয়ে গাইবার নিয়ম। কিন্তু খতিয়ে দেখলে গজলকে সুরে আবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। মাঝে মাঝে যেখানে ছন্দ ভেঙে একটানা দীর্ঘস্বরে পদ আবৃত্তি করতে হয়, সেই জায়গাগুলিকে বলা হয় 'শ্যের'। 'শ্যের' গজল গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা দেশে গজল গানের বিশেষ সমাদর ছিল। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল কাজী নজরুল ইসলামের অবারিত কল্পনার অকুণ্ঠ দান। আজকাল গজল গানের জনপ্রিয়তার স্রোতে ভাটার টান লেগেছে মনে হয়, কিন্তু সুরের পূর্ণ জোয়ার আর কোন দিক দিয়ে উপছে পড়ছে কি?

ভারতীয় রাগসঙ্গীত ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে

আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে হালে অনেকখানি উৎসাহবোধের সঞ্চার হয়েছে দেখতে পাই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁদের ঔদাসীন্যের অন্ত ছিল না। শুধু যে তাঁরা ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মর্মরস অনুধাবনে অপারগ ছিলেন তা-ই নয়, সে বিষয়ে তাঁদের আগ্রহেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিছুদিন হল এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা উপলব্ধি করেছেন যে, সঙ্গীতকে জীবনের ক্ষেত্র থেকে বাদ দিয়ে পূরোপূরি সংস্কৃতিবান মানুষ হওয়া চলে না; সাহিত্য কিংবা অন্যান্য প্রধান কলাশিল্পের মতই সঙ্গীত মানুষের মনের পরিপুষ্টি ও চরিত্রবিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মাটি-জল-হাওয়া প্রভৃতির মত কলাশিল্পের এক একটি শাখা সংস্কৃতির লতাটিকে এক এক উপাদানের সাহায্যে বাঁচিয়ে রেখেছে; সংস্কৃতির পোষণ ও বর্ধনে কেউ কারও চাইতে কম প্রয়োজনীয় নয়।

যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির সাধনার ফলে সঙ্গীত সম্বন্ধে এই নূতন চেতনার উদ্ভব হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী। ভারতের সঙ্গীতক্ষেত্রে এত বড় মহৎপ্রাণ উপকারকের আর আবির্ভাব হয়েছে কিনা সন্দেহ। তিনি যে নিজে একজন মস্ত বড় ওস্তাদ ছিলেন ঠিক তা নয় এবং এই দিক থেকে যাঁরা তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করে দেখতে চান তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ ঘটবারও কারণ দেখছিনে। কিন্তু যেজন্য তিনি বড়, এবং সম্ভবতঃ সকলের চেয়ে বড়, সে কথা চাপা দিয়ে ওস্তাদির ক্ষেত্রে তাঁর আশানুরূপ যোগ্যতার অভাব নিয়ে হৃদয়হীন মন্তব্য করতে যাওয়ার মধ্যে একটা দীনতা আছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ এই দীনতা থেকে মুক্ত নন। ভাতখণ্ডেজীর mission ছিল ব্যাপক সঙ্গীতপ্রচারের মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে যথার্থ সঙ্গীতবোধ সঞ্চারিত করা; অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই দিক দিয়ে তিনি অনেকাংশে সফলকাম হয়েছিলেন। সঙ্গীতজগতে তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে আমরা হয়ত দেখতে পেতাম, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

মুষ্টিমেয় বাতিল সামন্তবাজা ও জমিদাব এবং নূতন-ধনী ও তাদেব অনুগৃহীতদেব কেন্দ্র কবে আজও পঙ্কিল আবর্ত সৃষ্টি কবছে : সে ক্ষেত্রে সঙ্গীতেব বন্ধনমুক্ত দুর্বাব স্রোতকে জনসাধাবণেব হৃদয়তীবে পৌঁছে দেওয়াব চেষ্টা দুরূহ হত। পণ্ডিতজী সঙ্গীতেব এই মধ্যযুগীয় আবহাওয়াকে নষ্ট কববাব জন্য বদ্ধপবিকব ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সঙ্গীতেব যথার্থ বিকাশ ও মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তা আব কতিপয় ভাগ্যবানেব কবধৃত হয়ে থাকবে না, পক্ষান্তবে লোকবঞ্জনেব উদ্দেশ্যে বহুব মধ্যে বিচিত্রভাবে যাবে ছড়িয়ে। ধনীনন্দনেবা সঙ্গীতকে নিয়ে যে নিস্তবঙ্গ হ্রদেব সৃষ্টি কবেছিল, প্রাণপ্রবাহে আন্দোলিত কবে তাব স্রোতোবেগকে জনসমুদ্রেব অভিমুখী কবে তোলাতেই সঙ্গীতেব সম্যক সার্থকতা। ভাতখণ্ডেজী সঙ্গীতেব সেই সার্থকতা ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁব কৃতিত্ব-বিচাবেব এইটিই কষ্টিপাথব হওয়া উচিত।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেব অভ্যুদযেব পূর্বে ভাবতীয় সঙ্গীতেব কী অবস্থা ছিল? দেখতে পাই যে, বড় বড় বাজা-মহাবাজাবা মোটা মাইনে দিয়ে ওস্তাদ পুষছেন শুধু তাঁদেব দববাবী আবহাওযাটাকে সবগবম কবে রাখবাব জন্যে, যাতে সামন্ততান্ত্রিক বীতি-পদ্ধতিতে কোন ফাঁক না থাকে সেইজন্য ওস্তাদদেব মাথায় লাল পাগড়ী ও গায়ে বিচিত্র বর্ণেব উর্দি এঁটে দেওয়া হচ্ছে, ছাদ থেকে ঝুলানো বেলোয়াবী ঝাড়লণ্ঠনেব আলোকে তাদেব পোশাক ঝলমল কবছে, তাদেব সোনা-রূপাব পদকগুলি জলজ্বল কবে উঠছে, আব ওস্তাদেব দল সেই রাজোচিত আবহাওয়ায় পবিষদপবিবেষ্টিত হয়ে খানদানী গানেব দ্বাবা প্রভুদেব মনোবঞ্জন কববাব চেষ্টা কবছেন। ওস্তাদ হিসেবে হয়ত এঁদেব অনেকেবই কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁদেব গান শুনতে পেত কাবা? বাজা, জমিদাব ও তাঁদেব তাঁবেদাববাই শুধু নয় কি? তখন গ্রামোফোন ছিল না, ছিল না বেডিও, এবং আজকেব মত music conference-এব আযোজন তখন প্রায় স্বপ্নাতীত ছিল। সুতবাং ভাগ্যবান কতিপয় মাত্রে সেই সঙ্গীত শুনতে ও তাব বসগ্রহণ কবতে পারত। সঙ্গীত-শ্রবণেব ক্ষেত্রই যখন এত সঙ্কুচিত, তখন সঙ্গীতশিক্ষাব ক্ষেত্র আরও কত সঙ্কীর্ণ ছিল তা আমবা সহজেই অনুমান কবতে পাবি। অল্পশিক্ষিত, কুসংস্কারান্ধ ওস্তাদদের অনুদাবতা ও অনগ্রসবতাও এইজন্য কম দায়ী নয়। পাছে সর্বসাধারণের স্পর্শদোষে তাঁদেব 'ঘরানা' সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা নষ্ট

হয়ে যায় সেই ভয়ে এঁরা আত্মজ ছাড়া বলতে গেলে আর কাউকেই গান শেখাতেন না ; ফলে একই বংশ, একই শ্রেণী-পরম্পরার মধ্যে সঙ্গীতের প্রচার সঙ্কুচিত হওয়ায় অবশেষে এক সময় তার বিলুপ্তি প্রায় অবধারিত ছিল। এই ভাবে কত বিচিত্র সঙ্গীতসম্পদ যে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেছে এবং এক সময়ে নিঃশেষে লোপ পেয়েছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। ওস্তাদদের এই ধনরত্ন আগলে রাখবার যক্ষ-মনোবৃত্তির পিছনে রাজা-মহারাজাদের অনুমোদন ছিল। এই কারণে যে, ভোক্তার সংখ্যাবৃদ্ধি যত হবে তাঁদের অধিকারের সীমা তত সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। সঙ্গীতকে ঘিরে যে একটা রাজোচিত ঐশ্বর্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, জনসাধারণের আড়ম্বরহীনতায় তাতে দৈন্যলক্ষণ প্রকাশ পাবে—অধিকার সম্পর্কে অতি-মাত্রায় সচেতন কোন রাজরাজড়াই সেই সম্ভাবনাকে আশঙ্কার চোখে না দেখে পারেন নি।

ঠিক এমনি সময়ে ভাতখণ্ডেজীর আবির্ভাব। তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিমুখী, তাই তিনি সহজে বুঝেছিলেন যে, সঙ্গীতকে ওস্তাদির নাগপাশ মুক্ত করে জনসাধাবণেব নাগালের মধ্যে পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত সঙ্গীতের বিকাশ অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে সাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা দিক চিরকালেব জন্যে পঙ্গু হয়ে থাকতে বাধ্য। সুতরাং এই অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন। পণ্ডিতজী উঠে পড়ে লাগলেন সঙ্গীতপ্রচারের কাজে। বহু চেষ্টায় ও বহু ধৈর্যের পরীক্ষা অতিক্রম কবে তিনি ওস্তাদদের কাছ থেকে সঙ্গীতের মণিখণ্ড সংগ্রহ করে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন! ওস্তাদরা একযোগে তাঁর এই অসাধ্যসাধন প্রয়াসকে পরিহাস করতে লাগল এবং কেউ কেঁউ তাঁব উদ্যম প্রতিহত করতেও চেষ্টা করল। কেউ কেউ আবার এই বলে নাসিকাকুঞ্চন করল যে, স্বরলিপির সাহায্যে সঙ্গীতশিক্ষা দেবার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু ক্ষান্ত হবার পাত্র তিনি নন। দ্বিগুণ উদ্যমে উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান হলেন। এতদিন শিক্ষিত এবং শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিরা সঙ্গীতকে অপাংক্তেয় জ্ঞানে পরিহার করে এসেছিলেন। ভাতখণ্ডেজী দেখলেন, সঙ্গীতের প্রতি এঁদের মন আকৃষ্ট করতে হলে সর্বজনবোধ্য স্বরলিপির মাধ্যমে সঙ্গীতপ্রচার ছাড়া গত্যন্তর নেই ; স্বরলিপি পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেও তাই তিনি স্ববলিপিকে সঙ্গীতেব বাহনরূপে ব্যবহার করতে

লাগলেন। আপামর জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতপ্রীতি বরাবরই খানিকটা ছিল; ব্যাপক সঙ্গীতপ্রচারের ফলে তাদের স্থূল অথচ সহজাত সঙ্গীতপ্রীতি অনেকাংশে মার্জিত হল। এইভাবে বহুদিন অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভাতখণ্ডেজী কতিপয়ের ভোগের সামগ্রীকে সর্বসাধারণের ভোগ্য করে তুললেন।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। একদল ওস্তাদপন্থী, সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি আক্রোশবশতঃ, বলে বসল যে, 'ঘরানা' ওস্তাদদের কাছ থেকে গুরুশিষ্য-ক্রমে যে সঙ্গীতশিক্ষা না হয়েছে, সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। যে সব নবীন সঙ্গীতকার নিজেদের ভিতরকার তাগিদে প্রচলিত রাগসঙ্গীতের উপর নূতন রঙ ও রস যোজনা করতে গেল তাদের এই বলে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হল যে, পূর্বতন ওস্তাদরা যা দিয়ে গেছেন তাতেই কেবল দাগা বুলনো উচিত, তাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টি করবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু ওস্তাদের দল এ কথা বোঝেন না, শিল্পকলা মাত্রই গতিশীল; এক জায়গায় এসে তার চলা কখনও থেমে থাকতে পারে না। পূর্বতন সঙ্গীতাচার্যরা যত বড় গুণীই হোন, তাঁদের কণ্ঠে সঙ্গীতের শেষবাণী উচ্চারিত হয় নি, হতে পারে না; তাঁরা আজন্ম সঙ্গীত সাধনা করেছেন পরবর্তী কালে যাঁরা আসবেন তাঁদের হাতে সাধনার ফল তুলে দেবেন বলে। ভবিষ্যদ্বংশীয়রা নানা নূতন ভাবে সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবেন এই সম্ভাবনা নিশ্চয় তাঁদের চিন্তার অগম্য ছিল না। তবে কী জন্যে আমরা কেবলই পুরাতনের জাবর কাটব? কেন নূতন নূতন পথে সঙ্গীতের বিকাশের চেষ্টা করব না? এতে ওস্তাদরা যদি 'মার-মার' 'কাট-কাট' করে ওঠেন, কেন তাতে আমরা কর্ণপাত করব?

'ঘরানা' ওস্তাদদের ঠিকুজী-বিচার ঢের হয়েছে, সঙ্গীত-পারিজাত, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি বই নিয়ে শাস্ত্রের কচকচিও যথেষ্ট আমরা করেছি। নূতন সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি কিছু দান রেখে যেতে পারি তো সে চেষ্টা করব, নইলে শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে বিদ্যা জাহির করে কী লাভ? কোন্‌টা কোন্ 'ঘরের' গান, কোন্ 'ঘরে' বেহাগে কড়ি মধ্যম নিষিদ্ধ, বাগেশ্রীতে স্পষ্টভাবে পঞ্চম লাগালেও কোন্ 'ঘর' সেটাকে আপত্তিকর মনে করে না এসব তুচ্ছ আলোচনার সার্থকতা প্রায় নেই বললেও চলে। তথাপি এ-জাতীয় তুচ্ছ আলোচনায় সঙ্গীতজ্ঞরা যে কত সময় নষ্ট করেন ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

আসল কথা, পুরাতন পুরাতনের জায়গায় থাকুক, তাকে যথাযোগ্য

মর্যাদা দিয়েও আমরা আমাদের দৃষ্টিকে সম্মুখে প্রসারিত করতে পারি। পুরাতন থেকে যা কিছু ভাল তা আহরণ করব অথচ তার দ্বারা আচ্ছন্ন হব না, অভিভূত হব না—এইটাই আমাদের সঙ্গীতচর্চার আদর্শ হওয়া উচিত। কেউ যদি নূতন রাগিণী সৃষ্টির চেষ্টা করেন কিংবা পুরাতন রাগিণীকে নূতন-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান তা হলে 'ঘরানা' ওস্তাদদের নজির দেখিয়ে তাঁকে আমরা দাবিয়ে রাখব না, বরং সেই চেষ্টাকে অভিনন্দন জানাব। সঙ্গীতের ব্যাকরণে পান থেকে চুন খসলে যাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তাঁদের বলব, সঙ্গীত-রাজ্যে টোলের অনুশাসন চলবে না ; সৃষ্টিকে নূতন পথে চালনা করতে গেলে ব্যাকরণের এক-আধটু ভুল হবে বৈকি, তাই বলে নবসৃষ্ট সৌন্দর্যকে অস্বীকার করবে কোন্ মূঢ় ? এত অল্পতেই যদি আমাদের সঙ্গীত-মহাভারত অশুদ্ধ হয় তো সেই মহাভাবত নূতন ভাবে লিখবাব দিন এসেছে।

অনেক ওস্তাদ আবার পুবাতন সুরকে এখান থেকে ওখানে চেলে মনে করেন—সুরকে নূতন রসে সঞ্জীবিত করা হল, কাজেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার কৃতিত্বটুকুও সেই সূত্রে দাবি করে বসেন। কিন্তু এঁদের এই আত্মপ্রসাদ আত্মবঞ্চনা শুধু নয়, পরকেও বঞ্চনা। যে সৃষ্টিতে জনসাধারণ তৃপ্ত হয় না, মুষ্টিমেয়সংখ্যক ব্যক্তিমাত্র পবিতৃপ্ত হয়, সে সৃষ্টি আংশিকভাবে মাত্র সার্থক। তেমন সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ স্ফূর্তি আসতে পারে না। যে-কোন শিল্পসৃষ্টির. মূল্য-বিচারে জনসাধারণের ভাল-লাগা না-লাগাকে মানদণ্ডরূপে খাড়া করা উচিত ; এই মানদণ্ডে কোন জিনিস টিকে যায় তো তার উৎকর্ষ সম্পর্কে সন্দেহ করার আর অবকাশ থাকা উচিত নয়। জনসাধারণের ভাল লেগেছে অতএব তাতে স্থূলরুচির দাগ না লেগেই পারে না, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাব আর্টের ক্ষেত্রে আর বেশিদিন জায়গা জুড়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। যে-যুগে জনসাধারণের রুচি অমার্জিত ছিল, সঙ্গীতের সূক্ষ্মকারুকারিতা বোঝবার মত কান তৈরি হয় নি, তখন হয়ত এ মনোভাবের খানিকটা অর্থ ছিল। কিন্তু আজ জনসাধারণ আর আগের জায়গায় নেই ; ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গীত প্রচারেব ফলে তাদের কান সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওঠাপড়ার ছন্দ ও মর্ম খানিকটা বুঝে ফেলেছে এবং রুচিও তাদের সেই অনুপাতে মার্জিত হয়েছে। অতএব এখন যদি কেউ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোহাই পেড়ে সঙ্গীতকে কতিপয়ের সম্পত্তি জ্ঞান করেন, তাঁর সে মনোভাব লোকে সমর্থন করবে কিনা সন্দেহ।

বস্তুতঃ, সঙ্গীতের ন্যায় সাহিত্য, চিত্র প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রেও রসবোধকে সর্বজনীন করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গীতের ন্যায় অন্যান্য শিল্পেও ওস্তাদপন্থী আছেন, শিল্পের শুচিতা-প্রয়াসী সংরক্ষণকামী তাঁরা, তাঁরা শিল্পকলার গণতান্ত্রিক ঝোঁকটিকে বাধা দেবার কম চেষ্টা করছেন না। কিন্তু নূতন চেতনা ও নূতন অধিকারেচ্ছার দুর্বার স্রোতে তাঁদের সেই চেষ্টা বানের মুখে কুটোর মত ভেসে যেতে বাধ্য। শেক্‌সপীয়র অথবা রবীন্দ্রনাথ সকলের বোধগম্য নয় এই অজুহাতে উচ্চ শিল্পসৃষ্টিকে জনসাধারণের নাগালের বাইরে রাখার কোন অর্থ হয় না, কেন না শিক্ষার প্রচার বহুধা-বিস্তৃত হলে শেক্‌সপীয়র কিংবা রবীন্দ্রনাথকে বোঝা দুরূহ হত না। শিক্ষা যত ব্যাপক হবে উচ্চ শিল্পসৃষ্টির তাৎপর্য বোঝা তত সহজ হবে। ফলতঃ, বড় বড় কবি ও শিল্পীরা ততটুকু পরিমাণে অসার্থক যতটা তাঁরা সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য তাঁদের দায়ী করা চলে না, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকই সেজন্য দায়ী। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযোজ্য। শিল্পের প্রচারটাই আসল, রসবোধ তার পরের কথা। সুতরাং যাঁর চেষ্টার ফলে এই প্রচারের পথ সুগম হয়, তিনি আমাদের নমস্য। ভাতখণ্ডেজী সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করবার উপায় উদ্ভাবন করে জনগণের মহামঙ্গল সাধন করে গেছেন। সঙ্গীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক।

পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়ে আবার বলি, সাধারণের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়েই শিল্পের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হওয়া উচিত। জানি, ওস্তাদপন্থীরা এই মানদণ্ডকে আমল দিতে চাইবেন না, তবু আমরা মনে করি শিল্পবিচারের এইটেই একমাত্র নিরিখ হওয়ার যোগ্য। পরলোকগত আবদুল করিম খাঁ সাহেব মস্ত গুণী ছিলেন, শুধু তাঁর গলা সুরেলা ও মিষ্ট ছিল তাই নয়, যথার্থ কালোয়াতী পদ্ধতির গানেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু এমন অভিযোগ তো কই কখনও শোনা যায় নি যে জনসাধারণেব কানে তাঁর গান খারাপ লেগেছে? আপামর সাধারণ সকলেরই আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গান ভাল লাগে, সেইটেই কি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের চরম পরিচয় নয়? ওস্তাদ হয়েও তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়, সকলের অধিগম্য, তাইতেই বোঝা যায় শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ওস্তাদি-নিরপেক্ষ মানদণ্ড একটি আছে এবং সেইটেই যথার্থ মানদণ্ড।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আরও উন্নতি কি সম্ভব ?

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই তো বড় রকমের একটা মিউজিক কনফারেন্স হয়ে গেলো, উত্তর ভারতের সেরা সব ওস্তাদরা গেয়ে গেলেন, নিশ্চয়ই শুনতে গিয়েছিলে?' আমি সাড়া দিই নি। আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে বন্ধুরা একটু আশ্চর্যই হয়েছিল।

তাঁদের আশ্চর্য হবার কারণ আছে। আমাকে তাঁরা বরাবরই ওস্তাদি সঙ্গীতের একজন মস্ত বড় সমর্থক ও অনুরাগী বলে জেনে এসেছে। সেই আমি হাতের কাছে পেয়েও এত বড় একটা অনুষ্ঠানে গান শোনার সুযোগ ছেড়ে দিলুম এতে তাঁরা অবাক হবে বৈকি।

বাস্তবিক, আমি গান শুনতে যাই নি। এমনতর সুযোগ বৎসরে দু'বার আসে না জেনেও। কেন হঠাৎ ওস্তাদি গানের প্রতি এতদূর বিমুখ হয়ে উঠলুম—বিমুখ যদি বা নয়, উদাসীন—সেইটে বলব মনে করেই আজ কলম ধরেছি।

আমার তো মনে হয়, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত—শাস্ত্রের ভাষায় যার নাম মার্গ সঙ্গীত—যতই কেন না ঐশ্বর্যবান হোক, তার চলার বেগ থেমে এসেছে। আর সেইটুকু সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিয়েছে দেশী সঙ্গীত। জাতীয় সঙ্গীতের প্রবাহে সক্রিয় স্রোতোবেগ সঞ্চার করবার ক্ষমতা এ যুগে একমাত্র দেশী সঙ্গীতেরই আছে। দেশী সঙ্গীত এসেছে লৌকিক ধারা থেকে—তাই ক্রমাগত নিত্য নূতন পথে তার সঞ্চরণ। আজকের দিনে সঙ্গীতপ্রিয়দের ভরসা করতে হলে দেশী সঙ্গীতের উপরই সেই ভরসা রাখতে হয়—এই পথ ছাড়া সঙ্গীতের মুক্তির পথান্তর নেই।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে এমনতর আশার বাণী উচ্চারণ করা যায় না। আজ থেকে থেকে এই প্রশ্নটিই শুধু মনে উঠছে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আরও উন্নতি কি সম্ভব ?

এ কথা সবাই জানেন যে, আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত খুব প্রাচীন জিনিস। যুগে যুগে বিভিন্ন ওস্তাদ আর সঙ্গীতজ্ঞ তার পদ্ধতি-প্রকরণ

বদলিয়েছেন, তাকে নতুন সাজে সাজিয়েছেন, তার সুরের দেহে নতুন রঙ চড়িয়েছেন; কিন্তু সমস্ত পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার আসল চেহারা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলতে হবে। বহু বিচিত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ওস্তাদরা আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে এমন এক স্তরে নিয়ে এসেছেন যেখান থেকে তাকে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা সেটা সত্যি ভেবে দেখা দরকার।

আমার তো মনে হয়, ওস্তাদি গানের উন্নতিবিধায়ক যত প্রকার অলঙ্করণ সম্ভব তার সবই ওস্তাদরা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন; সুরবিকাশের কোন পথই বলতে গেলে আর খোলা নেই। যখনই যে আসরে ওস্তাদদের গাইতে শুনি, দেখি এঁরা সবাই একই ধরনের আলাপ, একই ধাঁচের তান, ঠিক একই মাপের বিস্তার প্রয়োগ করছেন। এঁদের ভিতর গুণের তারতম্য নেই তা বলছি নে—গলা আর গাইবার গুণে এঁদের কারো গান শুনতে ভাল লাগে; গলা আর গাইবার দোষে কারো গান তেতো মনে হয়। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, যে পদ্ধতিতে এঁরা গান করেন এবং যেভাবে সে গানের সুরবিস্তার আর তানকর্তব প্রয়োগ করেন, প্রায় সবারই বেলায় সে সব অল্পবিস্তর এক। একই তান দুজন গায়ক হয়ত একই ভাবে প্রয়োগ করছেন—একজনের কণ্ঠে তা মধুর শোনাচ্ছে এইজন্য যে তাঁর কণ্ঠ সুরেলা, নমনীয় আর আবেগময়; অন্যজনের কণ্ঠে বিসদৃশ শোনাচ্ছে, কেন না গলা তাঁর বাজখাঁই, ভাঙা আর নিরাবেগ। অনেক সময় ভাঙা গলা নিয়েও ভাল গাওয়া যায় যদি 'মেজাজ' ব'লে পদার্থটি গায়কের আয়ত্তে থাকে।

আসল কথা হচ্ছে, বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিবর্তন-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আজকের দিনে ওস্তাদি গানের যে চেহারা দাঁড়িয়েছে, তাতে তার উপর আর অধিক রঙ চড়াবার অবকাশ নেই। বিভিন্ন যুগের কালোয়াতরা নূতন অলঙ্কার যোজনা করতে করতে অলঙ্কারের ভাণ্ডার প্রায় শূন্য করে ফেলেছেন—চেষ্টা করেও তাঁরা আর নতুন ডিজাইন আমদানী করতে পারছেন না। এমন কি, যে সব ডিজাইন নতুন মনে করে তাঁরা ব্যবহার করতে যাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে কোন না কোন এক ভাবে পুরনো সব ডিজাইনের সঙ্গে সে সব মিলে যাচ্ছে! উৎসাহী নতুন ওস্তাদ হয়ত এই ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন যে, তিনি একটি রাগকে এমন বিশেষ এক ভঙ্গিতে কণ্ঠে লীলায়িত করলেন যা এর আগে কেউ আর করেন নি। কিন্তু সত্যিই যদি খোঁজ নেওয়া

যেত—বিশেষতঃ, পূর্বতন আচার্যদের গানের যদি রেকর্ড থাকত— তা হলে দেখা যেত, তাঁদের কারো না কারো গলায় ওই বিশেষ ভঙ্গির সুর কোন এক সময়ে ঠিক একই ভাবে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। ওস্তাদি গানের ধরনটাই এমন যে কারও জোর করে বলার যো নেই, যে বিশেষ সুরের অলঙ্কারটি তিনি প্রয়োগ করলেন সেটি নিঃশেষে তাঁরই, আর কোন গায়ক তার দাবীদার নন। আর যেখানেই হোক, ওস্তাদি গানের ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্যনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য দাবি করা চলে না। পরম্পরাক্রমে সঙ্গীতের যে ঐতিহ্য একবার তৈরি হয়ে গেছে তাকে অনুসরণ করা এবং সম্ভব হলে তার উপর নূতন রঙ চড়ানো—এই হল উত্তর-গায়কদের কাজ। খুব প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক যিনি, তিনি তাঁর অপূর্ব প্রতিভার যাদুস্পর্শে ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের স্রোত নতুন পথে চালনা করতে পারেন—কিন্তু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহুকালস্থায়ী, সুদীর্ঘ ইতিহাসে এত অধিকসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক এর আগে জন্মলাভ করেছেন এবং সঙ্গীতকে এত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন যে, সত্যি কথা বলতে, শক্তিশালী নূতন গায়কের প্রতিভার স্ফুরণের পথ বড় আর একটা অবশিষ্ট থাকে নি। নূতন গায়ক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কেবল মাত্র ভোগ করার অধিকারী; সেই সম্পদ তিনি সম্প্রসারিত করতে পারছেন না। সঞ্চিত ঐশ্বর্য এতই স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে যে, উত্তরাধিকারীর কাঁধে তা বোঝার মত চেপে আছে; তা দিয়ে কোন কাজও হচ্ছে না, তাকে ঝেড়ে ফেলাও মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন গায়ক যতই চেষ্টা করুন, ওস্তাদি গানে নতুন চটক দেখাতে তিনি মোটামুটি অপরাগ, কারণ যা চটক দেখাবার তার সবই পূর্বতন গায়করা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর জন্যে কিছু বাকী রেখে যান নি।

এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক। সঙ্গীতজ্ঞদের মূল অবলম্বন সুর—আর সেই সুরের উপাদান হল সা রে গা মা প্রভৃতি সাতটি স্বর। সপ্ত স্বর আর বাইশ শ্রুতি, এই সংস্কারের উপর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি। আর সেই সংস্কার সকল ওস্তাদের মধ্যে সমান বদ্ধমূল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সাতটি সুরকে কত নতুনভাবে আর খেলানো যায়? 'কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখী'। পোষা পাখীর নতুন কী কৌশল আর দেখাবার আছে? সাতটি সুর বই তো

নয়, যতই চেষ্টা করুন তাকে কত ভাবে আপনি লীলায়িত করতে পারেন? বিভিন্ন ওস্তাদের কণ্ঠ এই সাতটি সুরের উপর দিয়ে এত নানা ভাবে ও এত অধিক বার দৌড়ঝাঁপ করেছে যে, সপ্তস্বরকে প্রায় তাঁরা তুলোধুনো করে ছেড়েছেন, তার শাঁস আর কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি। তাই ওস্তাদি গানের বেলায় নতুন কিছু করব মনে করলেই তা করা যায় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা পুরাতনের জাবর কাটার সামিল হয়ে পড়ে। বোধ হয় এই কারণেই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমাধির উপর নাট্যসঙ্গীতের ভিত্তি রচনা করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। ধবা যাক মালকোষ। এটি ঔড়ব জাতীয় রাগ—এর বিন্যাস সা গা মা দা ণা। এখন মালকোষের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা বজায় রেখে এই পাঁচটি স্বরের যত বিভিন্ন বকমের বিন্যাস হতে পারে তার সবই ওস্তাদরা গেযে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মালকোষের সুরের যত রকম ফেরতা হতে পারে তার সবই ওস্তাদরা গলায় বের করেছেন। অবশ্য এ জিনিস একদিনে নিষ্পন্ন হয় নি, হতে বহু সময় লেগেছে। এ আমাদের নিছক অনুমান নয়। রাগ-রাগিণী সম্পর্কিত প্রাচীন পুঁথিগুলি ঘাঁটলে এবং বিভিন্ন 'ঘরানার' ওস্তাদের গান শুনলে কিংবা তাঁদের সংরক্ষিত সঙ্গীতগ্রন্থগুলি দেখলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, এক একটা রাগের বিচিত্র সম্ভাব্যতা তাঁরা পরীক্ষা করে গেছেন এবং সেই রাগের অন্তর্নিহিত রূপ তাঁরা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটনও করে গেছেন। বিভিন্ন ঘরানার গায়কদের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা নিছকই 'গায়কী'ব পার্থক্য—অর্থাৎ গাইবার ধবনের পার্থক্য—স্বরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের পার্থক্য খুব সামান্য। কিংবা বড জোর গানের 'বন্দেজ্' এক এক ঘরে এক এক রকম—কিন্তু রাগ-রাগিণীর চেহারাটা প্রায় সবাইর ঘরে এক। একটা রাগকে এঁরা নানাভাবে পরীক্ষা করে এর বহুমুখী সম্ভাব্যতাকে টেনে বার করেছেন এবং তার পর তা সকল ঘরেরই সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। তাই গাইবার ধরনের পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন ঘরের মধ্যে রাগ-রাগিণীর গঠনে বড একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। কোন ঘরে বেহাগ রাগিণীতে কড়ি মধ্যম একেবারেই ব্যবহার করা হয় না; কোন ঘরে দেশী টোড়ী কেবল মাত্র শুদ্ধ ধৈবত দিয়ে গাওয়া হয়, এইগুলি নিতান্তই অবান্তর সংবাদ—রাগের মূল স্বরূপ তাতে ব্যাহত হয় না।

বিজ্ঞান বল, সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, কিংবা যে কোন প্রকারের শিল্প-কলা বল—একবার শিল্পকলার যে কোন বিভাগে যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়ে যায় তা অচিরেই সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে পড়ে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নিয়ম সবচাইতে বেশী খাটে। ওস্তাদরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা রাগের যে সম্ভাব্যতা ফুটিয়ে তোলেন তা অচিরকালের মধ্যে সর্বসাধারণের সম্পদে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব মেনে নিলে দেখা যায়, রাগের বিভিন্ন ফেরতা আর combinationগুলি আজ সবারই আয়ত্তে চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, নতুন কিছু করবার চেষ্টা করলেই দেখা যাচ্ছে, একটা-না-একটা পুরাতন সুরের কাঠামোর ভিতর তা পড়ে যাচ্ছে। আজকের দিনের ওস্তাদদের মধ্যে কেউ বড় কেউ ছোট সেটি এইজন্যে নয় যে, তাঁদের সুরবিস্তারের পদ্ধতির তফাৎ রয়েছে; সেটা মূলতঃ এইজন্য যে, তাঁদের কারও গাইবার মেজাজ ভাল, গলা ভাল; কারও ভাল নয়।

আজ পর্যন্ত যত ওস্তাদের মুখে ভৈরবী ঠুংরী শুনেছি, সবারই এক চাল এক ধরন এক কায়দা। অর্থাৎ ভৈরবীর সংস্কার প্রায় সব গায়কের মধ্যেই এক প্রকার। ঠিক কোন্‌খানটায় গায়ক আচমকা কড়ি মধ্যমের খোঁচ লাগাবে বা বিলাসখানি টোড়ীর ঢঙ আনবে তা আগে থেকে বলে দেওয়া যায়। তারপর দেখুন, ভৈরবীর প্রচলিত ঠাট সা ঋা জ্ঞা মা পা দাণা এই সাতটি স্বরের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু গাইতে গাইতে এমন হয়েছে যে, ভৈরবী আর এই সাতটি স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই,কড়ি কোমল নিয়ে আজ বারোটা পর্দাই অনায়াসে ভৈরবীতে লাগাচ্ছেন ওস্তাদরা। ভৈরবীতে অপ্রকাশিত আর এমন কিছু নেই যা নতুন গায়ক তাঁর কণ্ঠের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন—এখন এই রাগিণীটির ক্ষেত্রে খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়ের রাজত্ব চলছে।

ব্যাপারটি আরও বিশদ করে বোঝাতে গেলে উপমার সাহায্য নিতে হয়। গণিতশাস্ত্রে permutation আর combination বলে দুটা কথা আছে; permutation-combination-এর প্রক্রিয়ায় রাশির সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতা নিঃশেষ করে দেখানো হয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই permutation-combination-এর প্রক্রিয়া চরমে গিয়ে ঠেকেছে। যেমন সা রা গা পা ধা সা। এই স্বরসমষ্টির যত বিভিন্ন সমাবেশ সম্ভব তার সবই পরীক্ষিত ও উদ্ভাবিত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যাঁরা ভুপালী (ধরা যাক) গাইছেন

তাঁরা পুরাতনের জাবর কেটে চলছেন মাত্র—রাগিণীটিতে আর নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারছেন না। শুধু ভূপালীই নয়, সমস্ত রাগিণীর রূপায়ণই আজ পৌনঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে উঠেছে; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খোল নৈচে সম্পূর্ণ না বদলানো পর্যন্ত এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার প্রতিকার হবার নয়।

জানি, অনেকে বলবেন, রাগ-রাগিণীর বিচারে এইরূপ mechanical দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিসঙ্গত নয়। গান সা রে গা মা প্রভৃতির সমষ্টি হলেও সেটা মূলতঃ প্রাণের জিনিস। স্বরসমষ্টির সুপ্রয়োগের দ্বারা রসসৃষ্টিই লক্ষ্য, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার permutation-combination বিচার করলে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয় মাত্র; তার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হয় না। সবই মানলুম কিন্তু কথা হচ্ছে, যে কোন বস্তুর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় খানিকটা বিশ্লেষণের দরকার হয়ই—তাতে "ইম্প্রেশনবাদীরা" ক্ষুণ্ণ হোন আর যাই হোন। তা যদি না হত, তা হলে আর স্বরলিপির সাহায্যে সঙ্গীতকে বেঁধে রাখার চেষ্টা হত না; পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীও প্রত্যেক রাগের ঠাটপ্রকরণ আর 'পকড়' (রাগের বিশেষত্বজ্ঞাপক স্বরবিন্যাস) নির্দেশের চেষ্টায় অতটা শ্রম আর শক্তিক্ষয় করতেন না। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা গানের ভাবরূপের আলোচনা নয়, তার কাঠামোর আলোচনা। এমতাবস্থায় বিষয়টিকে আমরা যদি খানিকটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকি, খুব বেশী দোষ হয় নি নিশ্চয়।

গোড়ায় যে কথা বলেছিলুম সে কথায় ফিরে আসি। ওস্তাদদের গান শুনতে শুনতে এই ধারণাই আমাদের হয়েছে যে, তাঁদের অনুশীলিত সঙ্গীত-শিল্প উন্নতির চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে, তার আর উন্নতির অবকাশ নেই। এখন ওস্তাদী গানের নামে যা চলছে সেটা একঘেয়ে পুরাতনের উদ্গার মাত্র; নূতন জীবনের স্পন্দনে তা স্পন্দিত নয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে নূতন জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত করে তুলতে হলে তার সঙ্গে দেশী বা লৌকিক ধারার সুরের মিতালি পাতানো দরকার। কিন্তু সে প্রয়োজনের বোধ ওস্তাদদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁরা এখনও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতেই একান্তভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি। কিন্তু নিছক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বোধহয় অন্ধকার। ফুল সম্পূর্ণ ফুটে গেলে যেমন তার পাপড়িগুলি আস্তে আস্তে ঝরে যায়, আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও হয়েছে সেই দশা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমস্ত পাপড়িগুলিই ফুটে গেছে, এখন তার ঝরে পড়বার পালা।

রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ

সেদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন অব্ মিউজিক্-এর উদ্যোগে একটি সাঙ্গীতিক আলোচনা-সভা আহূত হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল—ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ যাকে আমরা ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত বলি, সেই সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কিছু আছে কিনা সেইটে পরীক্ষা ও নির্ণয় করা ছিল আলোচনার লক্ষ্য।

জনৈক বক্তা বললেন, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের কখনও বিনাশ হতে পারে না। আধুনিক নামধারী সঙ্গীত সাময়িক ভাবে লোকের মনে মোহ বিস্তার করলেও তার স্থায়ী মূল্য কিছু নেই। আধুনিক সঙ্গীত বড় হাল্কা, চটুল, তরল; অপর পক্ষে রাগসঙ্গীত সুরগম্ভীর, আর এই সুরগাম্ভীর্যই হল রাগ-সঙ্গীতের অবিনশ্বরতার নিশানা।

যুক্তির দিক দিয়ে বক্তব্যটির ভিতর ফাঁক রয়েছে। তবু এ কথা বোঝা যায় যে, বক্তার অভিমত একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের প্রতীক। রাগসঙ্গীতের স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্বের প্রশ্নে একাধিক ব্যক্তি উক্ত মতের পোষকতা করবেন বলে মনে হয়।

বিরুদ্ধপক্ষীয় বক্তা বললেন, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সুরৈশ্বর্য অনস্বীকার্য, তবে তার রূপ চিরকাল একই রকম থাকবে এমন মনে করা যায় না। বরং যত দিন যাবে তত তার ঢঙ বদলাবে, তত তার নূতন নূতন ভঙ্গিমা দেখা দেবে। ভবিষ্যতের রাগসঙ্গীত আজকের রাগসঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র বস্তু হবে। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের পরম্পরাগত ঐতিহ্য আর যুগপ্রভাবঘটিত নূতন সৃষ্টি—এ দুয়ে মিলে ভবিষ্যৎ রাগসঙ্গীতের পরিধি বহু গুণে সম্প্রসারিত হয়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা হবে। সঙ্গীতের প্রগতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা এই অধ্যায়টিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবেন।

স্পষ্টতঃই উক্ত মত মধ্যপন্থাশ্রয়ী। এতে প্রগতিকেও মানা হয়েছে আবার ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা হয় নি। আজকের দিনের প্রগতিশীল মতাবলম্বী অধিকাংশ মানুষ এই মতটিকেই সমর্থন করবেন তা না বললেও চলে।

এ ছাড়া আরও একটি মত হতে পারে। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ

আলোচনা প্রসঙ্গে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেদিন এই লেখককেও কিছু বলতে হয়েছিল। তিনি এই তৃতীয় মতের কথাই উত্থাপন করেছিলেন। তবে রাত অনেক হওয়ায় তিনি তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান করবার সময় পান নি ; মতটিকে সূত্র আকারে উপস্থিত করেই ক্ষান্ত হন।

এক্ষণে মতটিকে আরও একটু ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

মত মাত্রেরই একটা পক্ষ আছে, প্রতিপক্ষ আছে। উপরে যে দুটি মত পর পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের সম্পর্ক অনেকটা এই পক্ষ-প্রতিপক্ষের সম্পর্ক। চেষ্টা করলে এই দুই বিরুদ্ধ মতের ভিতর সামঞ্জস্যবিধান করা যেতে পারে। কিন্তু মতামত বিচারের ক্ষেত্রে এমন একটা সময় আসে যখন আর সামঞ্জস্যে কাজ হয় না, সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তৃতীয় যে মতের কথা বলা হয়েছে তা এই প্রকার অপরিহার্যতারই ফল। ভূমিকা বিস্তারিত না করে সরাসরি কথাটা পাড়ি।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের চারিটি স্বীকৃত রূপ—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পা। এর ভিতর প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর গান ক্রমশঃ বিরলশ্রবণ হয়ে আসছে। ধ্রুপদ তার পূর্বতন মাহাত্ম্যে আর প্রতিষ্ঠিত নেই ; তার প্রতিপত্তি এখন খেয়ালের করতলগত। টপ্পা সুরের রেশ শ্রোতার কান ও মন থেকে মিলো-বার উপক্রম ; পক্ষান্তরে ঠুংরীর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

কিন্তু এটা তো হল রাগসঙ্গীতের শ্রেণীচতুষ্টয়ের তুলনামূলক বিচার। এ ছাড়াও বিচার আছে। এক হিসাবে দেখতে গেলে—হিসাবটা আকস্মিক নয়, অনিবার্য—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরা, টপ্পা কারুরই কোন ভবিষ্যৎ নেই ; ও পথে আরও অগ্রগমনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম ব্যতীত কিছু নয়। চোরাগলিতে প্রবেশের পথ আছে, তা থেকে নির্গমনের পথ নেই। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের পথও অনেকটা এই চোরাগলির মত। তা থেকে বেরোবার পথ নেই ; একবার ও চৌহদ্দির মধ্যে পা বাড়ালে কেবল পাক খেয়ে ফেরাই সার হবে। অর্থাৎ রাগসঙ্গীত বর্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে তাকে আঁকড়ে থাকার অর্থ পৌনঃপুনিকতার বৃত্তের মধ্যে বিরামবিহীন ভাবে আবর্তিত হওয়া। দুষ্টনেমির অন্তহীন পরিক্রমণের পথে শিল্পের অগ্রগতি কোনক্রমেই সাধিত হতে পারে না।

ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত এবং অধুনাপ্রচলিত রাগ-রাগিণী মিলে অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার স্বরবিন্যাস এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হয়েছে। সঙ্গীতজ্ঞরা মনে করেন, সঙ্গীতের মূলীভূত যে সপ্তস্বর—সা রে গা মা পা ধা নি—তার যত রকম বিন্যাস সম্ভব সমস্তই উপরি-উক্ত তিন হাজার রাগ-রাগিণীর ভিতর পরীক্ষিত হয়ে গেছে। এখন কেউ যদি সপ্তস্বরের নূতন কোন বিন্যাস উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন সে চেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উক্ত নূতন বিন্যাস হয় পুরাতন কোন বিন্যাসের হুবহু অনুকরণ, নয় তারই কাঠামোয় রচিত আপাত-নূতন কিন্তু কার্যতঃ পুরাতন একটি বিন্যাস। অর্থাৎ যাকে নূতন রাগ ভাবা যাচ্ছে তা আদৌ নূতন রাগ নয়, পূর্বে কোন না কোন আকারে রাগটির অস্তিত্ব ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নূতন রাগ-নামধেয় 'হেমন্ত-বেলাবল্' ও 'পুষ্পচন্দ্রিকার' উল্লেখ করা যেতে পারে। আসলে ও দুটি পুরাতন রাগ, নূতনের ছদ্মবেশ নিয়েছে মাত্র।

প্রাচীন সঙ্গীতকারদের উদ্ভাবন-শক্তি প্রখর ছিল। স্বরের একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা তাঁরা স্বরের স্বরূপ, তার বিচিত্র সম্ভাব্যতা নিপুণভাবে চিনে নিয়েছিলেন। সাতটি স্বরকে বিচিত্র ভাবে খেলিয়ে কত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করা যায় হাতে-কলমে তার পরীক্ষাও তাঁরা করেছিলেন। এক কানাড়া রাগেরই আঠারো প্রকারের বিন্যাস ভারতীয় সাঙ্গীতিক কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে—এ ছাড়া কানাড়া-ভঙ্গিম অগণিত উপবিন্যাস তো আছেই। মল্লারেরই বা কত বিভিন্ন ছাঁদ। এক কাফি রাগিণীকে কেন্দ্র করে কত উপরাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

রাগ-রাগিণীর এই উদ্ভাবনা, বলাই বাহুল্য, এক যুগে নিষ্পন্ন হয় নি ; যুগে যুগে নূতন নূতন সঙ্গীতকারের উদ্ভব হয়েছে, নূতন নূতন স্বরবিন্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী কালের অনাদর কিংবা অজ্ঞতার দরুণ আজ হয়ত সে সব রাগ-রাগিণীর কতক লোপ পেয়েছে, কিন্তু এক সময়ে তাদের প্রচলন ছিল সবিশেষ। সাঙ্গীতিকদের চেষ্টায় কিছু কিছু লুপ্ত রাগিণীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে ; স্বরলিপির প্রসাদে অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর প্রচার আজ ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই সব লুপ্ত-অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর দেহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, প্রাচীন সঙ্গীত-

কারেরা স্বরের বিচিত্র বিন্যাসের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং স্বরের সর্বসাধ্য permutation-combination দ্বারা কার্যতঃ সে সম্ভাবনাকে অবারিতও করেছিলেন। Permutation-combination এর কথায় মনে হতে পারে, বুঝি তাঁরা আঙ্কিক পদ্ধতিতেই এই উদ্ভাবন-ক্রিয়া সম্পন্ন করতেন, বুঝি তাঁদের উদ্ভাবনার পিছনে সৃষ্টিপ্রেরণা ছিল না। কিন্তু তা নয়। আসলে তাঁরা প্রেরণার বশেই রাগসৃষ্টি করেছেন, কেবল বলবার কথা এই যে, সে প্রেরণা ছিল সজ্ঞান ও সক্রিয় বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত। সাত (সম্পূর্ণ), ছয় (খাড়ব) বা পাঁচ (ঔড়ব) স্বরের সর্বপ্রকার কল্পনীয় বিন্যাস এই সজ্ঞানতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

বিচিত্র রাগ-রাগিণীর ছলে সাত ছয় বা পাঁচ স্বরের এই যে বিচিত্র বিন্যাস, তা যেমন রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে তেমনি অন্যদিকে তার সম্ভাবনাকে বহুলাংশে রুদ্ধ করেও দিয়েছে। নূতন রাগসৃষ্টির অবকাশ আজ আর প্রায় নেই বললেই চলে। যদি বা কেউ সে চেষ্টা করেন, নূতনের ছদ্মবেশে তিনি পুরাতনকেই রূপ দেবেন মাত্র। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগতে একটা কথা চলিত আছে যে, যা কিছু মহৎ ভাবনা বা কল্পনা তা অনেক আগেই ভাবা হয়ে গেছে। বর্তমানে নূতন চিন্তার আকারে যেটা চলছে তা পুরাতন চিন্তার উপর নূতনের পালিশ বই নয়। এ-ও অনেকটা তা-ই। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার রাগরূপ পূর্বাহ্নেই পরিকল্পিত ও সুচিহ্নিত হয়ে গেছে। এখন নূতন সৃষ্টি করতে যাওয়ার অর্থ অজ্ঞাতসারে প্রাচীন রাগ-রূপের নিকট আত্মসমর্পণ করা। নূতন সৃষ্টির নামে তাতে পুরাতনের উপর দাগা বুলোনোই সার হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। তার বর্তমান অতিরিক্ত সমৃদ্ধির মধ্যেই লেখা রয়েছে তার ভবিষ্যৎ অবলুপ্তির পরোয়ানা। রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আর নূতন সৃষ্টি কিছু হচ্ছে না; যেটা হচ্ছে তাকে পুরাতনের জাবর-কাটা বলা চলতে পারে। অর্থাৎ রাগসঙ্গীতের প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে পৌনঃপুনিকতাদোষ। এই পৌনঃপুনিকতা দোষই একদিন রাগসঙ্গীতের প্রকৃত হন্তারক হয়ে দাঁড়াবে।

শুধু যে রাগ-রাগিণীর দিক থেকেই রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে তা নয়, রাগসমূহের গায়নপদ্ধতিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য।

ওস্তাদেরা যতই চেষ্টা করুন, সুরের দিক থেকে তাঁরা শ্রোতাদের আর বিশেষ নতুন কিছু ধরে দিতে পারছেন না। রাগ-আলাপ, রাগবিস্তার, তানকর্তব, সরগম্ ইত্যাদি ব্যাপারে সেই খাড়া-বড়ি-থোড়, থোড়-বড়ি-খাড়ার রাজত্ব চলছে। এমন কোন শক্তিমান নূতন ওস্তাদের অভ্যুদয় ঘটতে দেখলুম না যাঁর কণ্ঠে রাগসঙ্গীতের গায়নপদ্ধতি একটা নূতন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে বলা চলে। পূর্বাচার্যরা গায়নের যে বিশেষ প্রক্রিয়া, যে বিশেষ পদ্ধতি-প্রকরণ বেঁধে দিয়ে গেছেন, পরবর্তী কালের ওস্তাদেরা হুবহু সেই ধারার অনুবর্তন করে চলেছেন—সেই একই ঢঙের বিস্তার, একই ঢঙের তান, একই ঢঙের সরগম্। বৈজু বাওরা কিংবা তানসেন কিংবা আরও পরেকার সদারঙ্গ অদারঙ্গ ঠিক কী ভাবে গান গাইতেন আজ আর তা নির্ণয় করবার উপায় নেই। তাঁদের প্রদর্শিত পথেই কণ্ঠসঙ্গীতের অনুশীলন এতাবৎ চলে এসেছে মনে করা যেতে পারে। এ যুগের কতিপয় শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী, যথা, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ, শ্রীমতী কেশর বাঈ কারকার, হীরাবাঈ বরোদকার ও ৺জোহরা বাঈ (শেষোক্ত শিল্পীর গান রেকর্ড মারফতে), এঁদের প্রত্যেকেরই কণ্ঠনৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু মুগ্ধতার অবস্থাতেও এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, তাঁরা সকলে ঘরানাক্রমেই গান করেছেন; নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন কেউ করেন নি। তাঁদের যা কিছু কলাকুশলতা সব ঐতিহ্যক্রমে আগত গায়ন-পদ্ধতিকে অবলম্বন করে; এর বাইরে তাঁরা পা বাড়ান নি। আবদুল করিম খাঁ সাহেব বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রাগসঙ্গীতশিল্পী। তাঁর কণ্ঠনৈপুণ্য ও সুরবোধ তুলনাহীন ছিল; কিন্তু তাঁকে বিপ্লবী শিল্পী বলা চলে কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁর কলাকুশলতার দ্বারা যদি কিছু করে গিয়ে থাকেন সে হল পুরাতন গায়নপদ্ধতির অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতার সমধিক বিকাশ সাধন, তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যদি দেখা যেত, খেয়ালের গায়ন-রীতিতে তিনি এক বা একাধিক নূতন অঙ্গ যোজনা করেছেন, সুরবিস্তার, তানকর্তব, সরগম্ ইত্যাদির মধ্যেই শুধু তিনি তাঁর নৈপুণ্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; তা হলে তাঁকে আমরা সেরা ওস্তাদ তো বলতুমই, সেই সঙ্গে এও বলতুম যে, তিনি একই কালে বৈপ্লবিক শিল্পীও বটেন। পুরাতনের নিপুণ অনুবর্তন নয়, পক্ষান্তরে অভিনবত্ব-প্রয়াসও তাঁর শিল্পসাধনার মূল কথা। কিন্তু এ ধারণার

অনুকূলে একান্তই প্রমাণাভাব। আবদুল করিম খাঁ সাহেব যে বর্তমান ভারতের সবসেরা শিল্পী ছিলেন সেটি এজন্য নয় যে, তিনি সুরসৃষ্টিতে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সেটি এইজন্য যে, তাঁর সুরবোধ অসাধারণ এবং তাঁর কণ্ঠস্বর অতীব মধুর ছিল ; স্বর তাঁর কণ্ঠ থেকে অমৃতনির্ঝরের মত ঝরে ঝরে পড়ত। কিন্তু তিনি যত বড় শিল্পীই হোন, তানসেনের চাইতেও কি তিনি উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন ? তা যদি না হয়, তবে রাগসঙ্গীতের গায়নপদ্ধতিতে অগ্রগতি সূচিত হল কিসে ? কোন্ প্রমাণের বলে আমরা বুঝব যে, রাগসঙ্গীতের অনুশীলনকারীর দল নূতন পথ কেটে চলবার প্রয়াসী, পুরাতনের নির্বিচার অনুসরণই তাঁদের একমাত্র ব্যসন নয় ? সেই যদি বারে বারে কিছু সময়ের অন্তে একটি করে পুরাতন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নূতন সংস্করণ নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়, বিপ্লবী সঙ্গীত-প্রতিভার সাক্ষাৎ না মেলে, তবে কার্যতঃ ব্যাপারটা কি এই দাঁড়ায় না যে, রাগসঙ্গীত একটি নির্দিষ্ট অচলপ্রতিষ্ঠ রীতিকে কেন্দ্র করে কেবলই পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে, দুষ্টচক্রেব পৌনঃপুনিক আবর্তনের কবল থেকে তাব নিস্তারের কোন আশাই নেই ? এই কি রাগসঙ্গীতের চিরন্তনত্বের পথ ?

সুতরাং রাগসঙ্গীত সম্পর্কে সকল দিক বিবেচনা করলে এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ও বস্তুর ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। রাগসঙ্গীত তার সকল সম্ভাব্যতা উজাড করবে ঢেলে দিয়েছে ; ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিঃশেষিত। রাগসঙ্গীতেব একটা সমৃদ্ধিময় অতীত ও বর্তমান আছে, কিন্তু সেইটেই বোধকরি তার ভবিষ্যৎ বিনাশের কারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ভবিষ্যৎ সঙ্গীতের জন্য আমাদের নূতন দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। রাগসঙ্গীতের অনুসরণ বা সম্প্রসারণের পথে ভবিষ্যৎ সঙ্গীতকে খুঁজতে গেলে নিরাশ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ভারতের ভবিষ্যৎ সঙ্গীত কী আকার পরিগ্রহ করবে, কোন কোন উপাদানের দ্বারা তার দেহ গঠিত হবে, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চলতে পারে—চলা উচিত ; পরে এই নিয়ে আলোচনা করাও হয়েছে কিন্তু বর্তমান নিবন্ধ তার ক্ষেত্র নয়। এই বিবেচনায় এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খা

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব একাধিকবার কলিকাতায় এসেছেন। বহু সঙ্গীতামোদী কলিকাতাবাসীরই কনফারেন্সে তাঁর গান শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। যে কয়বারই তিনি এখানে এসেছেন, এখানকার নিস্তরঙ্গ সাঙ্গীতিক আবহাওয়াটকে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে গেছেন। একদিকে তাঁর গানের নিন্দায় যেমন কান রাখা দায় হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রশংসায়ও একমুখ পাঁচমুখ হয়ে উঠতে দেখেছি। এ দুয়েরই কোন তালবেতাল ছিল না। কলকাতায় সঙ্গীতক্ষেত্রে এত এত সমালোচক রসজ্ঞ রয়েছেন, কিন্তু কেউ কাগজে-কলমে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানের স্বতন্ত্র মূল্যবিচার করেছেন বলে মনে পড়ে না।

আবদুল করিম খাঁ সাহেব কলিকাতায় এসেছিলেন মাত্র দুবার। আজ থেকে প্রায় ২৬।২৭ বছর আগে দ্বিতীয়বার যখন তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সেবারে সঙ্গীত-মহলে একটা সাড়া পড়ে যায়। তাঁর গান লোকের মনে একটা জাদু বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। রসিক, আধারসিক তো আছেই, এমন কি নিতান্ত অরসিককেও তাঁর গানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখেছি। এই একটি মাত্র গায়ক, যাঁর বেলায় একেবারেই কোন মতদ্বৈধ দেখা দেয় নি—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে, না, এতদিনে সত্যিকার ওস্তাদি গান শুনলুম। প্রথম যেবার তিনি কলকাতায় আসেন সে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকোবিদ্ শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁকে নিয়ে আসেন। কিন্তু তখন খাঁ সাহেবের এত নাম ছড়ায় নি, সুতরাং আশানুরূপ সাড়াও জাগে নি। কারণ, দ্বিতীয়বার অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের মত সর্বজন-অধিগম্য সাধারণ সঙ্গীত-বাসরের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর গান সাধারণ্যে প্রচারিত হতে পেরেছিল ; প্রথমবারে সে সুবিধা ছিল না। দিলীপকুমারের সমাজ অর্থাৎ ধনী ও অভিজাত সমাজের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে শুধু কতকগুলি ঘরোয়া বৈঠকের একান্তেই সে গান গুঞ্জরিত হয়েছে, প্রাচীর অতিক্রম করে জনগণের মধ্যে তা বাহিত হতে পারে নি।

সঙ্গীতরসজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা স্বাতন্ত্র্যবাদী, অর্থাৎ জনসাধারণের রুচি থেকে নিজেদের রুচিকে ভিন্নধর্মী ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে ভালবাসেন, তাঁরা বলেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁ সাহেবের তুলনায় অনেক বড় গুণী। এঁদের মতে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ঠিক ততটা অনায়ত্ত, যতটুকু লোকে তাঁকে বুঝতে পারেনা। জনগণের রুচি একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উঠেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে—ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গীতবিহার তার উর্ধ্বে। করিম খাঁ সাহেব সাধারণ শ্রোতার অধিগম্য, সেইজন্যই তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি।

রুচির এই উন্নাসিকতা আমরা সমর্থন করি না। জনগণের রসবোধের অসম্পূর্ণতা কিংবা রসগ্রহণের আংশিক অপারগতা মেনে নিয়েও এ কথা বলা যায় যে, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ঠিক ততটুকুই অসার্থক যতটুকু তিনি সাধারণের অধিগত নন। আবদুল করিম খাঁ সাহেব শুধু সস্তা সুরের চটক দেখিয়ে লোকচিত্ত জয়ে চেষ্টিত ছিলেন এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ওস্তাদির ক্ষেত্রে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে হয়ত তাঁর উনিশ-বিশ ছিল—কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন না এ অভিযোগ তাঁর অতিবড় বিরূপ সমালোচকও করতে পারবেন না। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মত তাঁর গানের পিছনেও সুদীর্ঘকালবিলম্বিত সঙ্গীতসাধনার ইতিহাস লুকায়িত আছে।

ধ্রুপদ সঙ্গীতে করিম খাঁ সাহেবের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। করিম খাঁ সাহেব একজন শ্রেষ্ঠ বীণকার ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতে অপ্রতিবাদ্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে তৎপূর্বে বহু বৎসর একাগ্র সাধনায় ধ্রুপদ সাধনা দরকার—যন্ত্রীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ও রেওয়াজ প্রচলিত। করিম খাঁ সাহেবের বেলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাঁর কণ্ঠ অপরূপ মিষ্টি ও সুরেলা ছিল, সেটি তাঁর সঙ্গীতের একটি অতিরিক্ত সম্পদ, তাতে তাঁর ওস্তাদিয়ানা খারিজ হয়ে যায় না। নিছক সস্তায় বাজী মাৎ করার বাড়া আর কোন কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয় এই অভিমত আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি।

'ওস্তাদ হিসেবে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম, কিন্তু কেন জানি না তাঁর গানে সম্পূর্ণ মন ভরে না। যে কয়বারই তিনি কলকাতায় এসেছেন—প্রত্যেকবার আশান্বিত হৃদয়ে তাঁর গান শুনতে গেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই গান শোনবার পর কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি থেকে গেছে, মনে হয়েছে পরিপূর্ণ রসাস্বাদে ফাঁক রয়ে গেল।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সুরসৃষ্টির কৌশল অনুধাবনীয়। কোথাও অর্ধস্ফুট স্বরে, কোথাও কণ্ঠে জোর দিয়ে তিনি যেভাবে সুরসৃষ্টি করেন এবং তুম্‌-তা-না-না-না-র সাহায্যে সেই সুর চারিদিকে ছড়িয়ে দেন, তাতে মুগ্ধবিস্মিত হতে হয়। গানের প্রারম্ভে অনেকটা সময় তাঁর এই সুরসৃষ্টির চেষ্টায় ব্যয়িত হয়। খাদ থেকে ক্রমশঃ চড়ার দিকে তিনি এমন কৌশলের সঙ্গে রাগিণীর বিস্তার করেন যে সুর আপনা থেকে আবহাওয়ায় গম্‌ গম্‌ করতে থাকে। এইভাবে সুর একবার জমে গেলে তাঁকে আর বিশেষ বেগ পেতে হয় না, গানের মূল পর্দায় গলা রাখলুম কি না রাখলুম সুর নিজে থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুরের মহিমায় অস্ফুট স্বর তখন দূর থেকে স্পষ্ট শ্রুত হয়; এমনকি কণ্ঠে আওয়াজ না তুললেও মনে হয় যেন এইমাত্র আওয়াজ শুনতে পেলুম। এ যেন অনেকটা সানায়ের পোঁ—মূল সুরটুকু কানে লেগে থাকার মত। সেই সুরের সঙ্গে যখন আবার রাগিণীর স্থায়ী স্বর এসে মিলিত হয় তখন এক অনির্বচনীয় সুরের আবেশে মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চায়।

আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কায়দা অন্যরকম। তিনি গানের প্রারম্ভিক অধ্যায়ের সুরবিস্তারের জন্য অত চেষ্টা ও সময় ব্যয় করেন না—খানিকটা আলাপ করেই গান ধরে দেন। এবং গানের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সুরের রসরূপ প্রকাশ করতে থাকেন। গান যত অগ্রসর হতে থাকে সুরের অপরূপ মায়া ততই শ্রোতার মনকে অভিভূত করে—শ্রোতা এক অনির্বচনীয় সুরের আনন্দলোকে প্রবেশ করে চরম চরিতার্থতা লাভ করে। ফৈয়াজ খাঁর গানে আসল গানের অংশটুকু হ্রস্ব, আলাপের অংশটাই দীর্ঘ। করিম খাঁর গানে আলাদা আলাপের অংশ বলে কিছু নেই, সবটাই আস্থায়ী-অন্তরার অন্তর্ভুক্ত। গানের মধ্য দিয়েই তিনি রাগিণীর রূপপ্রতিষ্ঠা করেন, গানের শুরুতে তাঁকে আর আলাপের গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতে হয় না। তাঁর কণ্ঠের এমনই জাদু যে গানের এক-একটি কথা তিনি উচ্চারণ করতে থাকেন আর মনে হয় যেন তিনি সুরের এক-একটি ভাঁজ খুলছেন। যাকে বলে সুরের জাল বিস্তার করা, সেটি তিনি গানের মধ্য দিয়েই সম্পাদন করেন, তার জন্য তাঁর আর আলাপ-বন্দনার প্রয়োজন হয় না। উভয়ের মুখেই আমরা টোড়ির খেয়াল শুনেছি—কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গিতে কত পার্থক্য! ফৈয়াজ খাঁ সুর সৃষ্টি করে তবে গান ধরেন, করিম খাঁ গান ধরলেন কি সুরের আবেশে বিভোর

হয়ে পড়লেন। অনেক প্রকরণ-প্রক্রিয়ার পরে তবে ফৈয়াজ খাঁর ভাবাবেশ ; করিম খাঁ ধ্যানে বসামাত্রই সমাধিস্থ। একের ষোড়শোপচারে দেবী-আবাহন ; অপরের গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

দুইয়ের স্বরবন্দনা-পদ্ধতির এই মূলগত পার্থক্যবিচারে তাঁদের কণ্ঠের তুলনামূলক বিচার অবান্তর নয়। ফৈয়াজ খাঁর গলা খাদের দিকে, করিম খাঁর গলা উঁচু পর্দায় বাঁধা। একের গলা যদি bass, অপরের tenor, যদিও করিম খাঁর চড়া গলার মধ্যে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতার আভাস চেষ্টা করলে আবিষ্কার করা যায়। ফৈয়াজ খাঁর গলা গম্ভীর ; করিম খাঁর গলা হাল্কা ও সুচিক্কণ। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ পুরুষোচিত কিন্তু বাজখাঁই ; করিম খাঁর কণ্ঠ তত বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু মিষ্ট। তবে মনে রাখতে হবে এই মিষ্টত্ব নারীসুলভ মিষ্টত্ব নয় ; চড়া গলায় যতদূর মিষ্টত্ব ধারণ ও ধারণা করা যায় করিম খাঁ সেই মিষ্টত্বেরই অধিকারী। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠে সূক্ষ্ম কলাকারুর অভাব ; করিম খাঁর কণ্ঠ অপূর্ব নমনীয় ও সূক্ষ্ম চারুতাযুক্ত। ফৈয়াজ খাঁ মোটা মোটা ঢেউ তুলে স্বর সৃষ্টি করেন ; করিম খাঁর স্বরসৃষ্টিতে শতসহস্র বীচি-বিভঙ্গের লীলা। স্বরের পাতে একের মোটা হাতের কাজ ; অপরের হাতে সেখানে সূক্ষ্ম কট্‌কি ঝালর।

তবে এক বিষয়ে ফৈয়াজ খাঁর জিৎ। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ স্বভাবতঃ কর্কশ হলেও তাতে মূলস্বরের পাশে পাশে সেতারের 'জোয়াড়ি'র মত একটি সমান্তরাল স্বর নিয়ত বিদ্যমান। এর প্রসাদে এমন যে বাজখাঁই আওয়াজ তাও দরদায়িত হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ 'তারা'র পর্দায় দরদের ভাবটুকু যেন আরও বেশী পরিস্ফুট। কিন্তু করিম খাঁর কণ্ঠে 'জোয়াড়ি'র একান্ত অসদ্ভাব —তাতে সেতারের ঝঙ্কারের ভাবটুকু পাওয়া যায় না। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ গম্ভীর ও ভারী বলে খেয়ালের অধিকতর উপযোগী ; করিম খাঁর কণ্ঠে ঠুংরীর লীলা সমধিক স্ফূর্তিময়। তানের ক্ষেত্রেও ফৈয়াজ খাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হয়। ফৈয়াজী তান শুধু অসম্ভব দানাদারই নয়, তার ঘোরপ্যাঁচও করিম খাঁর তানের চাইতে বেশী। বিশেষ করে 'বোলতান' করবার বেলায় ফৈয়াজ খাঁ যে ছন্দের কাজ করেন তা তাঁর গানের এক বিশেষ সম্পদ। করিম খাঁর তানের এই বৈশিষ্ট্য নেই। তবে করিম খাঁর তান অনেক শান্ত ও সমাহিত ; ফৈয়াজ খাঁর তানের মত তা উদ্বেল আলোড়ন সৃষ্টি করে

না। এক হিসেবে রসসৃষ্টির পক্ষে শান্তসুন্দর তানই প্রশস্ত; তান নিয়ে অতিরিক্ত হৈ চৈ রসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে বইকি।

করিম খাঁর গানে এমন একটা সুরের আবেশ আছে যাতে সমস্ত মন থিতিয়ে আসে—ফৈয়াজ খাঁর গানে সে ভাবটি পাওয়া যায় না। করিম খাঁ রসিক অরসিক নির্বিশেষে সকলের চিত্ত জয় করতে পারতেন; ফৈয়াজ খাঁ শুধু একশ্রেণীর শ্রোতাকেই তৃপ্তি দিতেন। সাধারণের ভাল-লাগা-মন্দ-লাগা দিয়ে রসের বিচার করার সময় এখনও আসে নি সত্য (পরিপূর্ণ সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সেটা সম্ভব), কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, করিম খাঁ সমভাবে রসিকজনের চিত্তও আকর্ষণ করতে জানতেন। জনগণের অধিগম্য বলেই তিনি কমগুণী এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। বরং সেইটাই কারণ যার জন্য ফৈয়াজ খাঁর গানের চাইতেও করিম খাঁর গানকে আমাদের সমধিক মূল্যবান মনে করা উচিত। একই সঙ্গে যিনি বিদগ্ধ অবিদগ্ধ জনের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন নিঃসন্দেহে তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। ফৈয়াজ খাঁ সেই অনুপাতে অসার্থক যে অনুপাতে তিনি জনমনের গ্রাহ্য নন। রসবিচারের ক্ষেত্রে এতদিন এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতার অভিমতটাই প্রামাণ্য ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জনমতের হিসাবটাও গ্রহণীয়। ক্রমেই রসবিচারের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার চিহ্নমণ্ডিত এই সামাজিক লক্ষণ চারিদিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই লক্ষণ মিলিয়ে রসবিচারের মাপকাঠি নতুন করে তৈরি হোক।

সঙ্গীতে তিন পুরুষ

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ বাংলার উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এঁদের গুণপনার পরিচয় বহুদিন লোক-লোচনের অন্তরালে সংগুপ্ত ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ চারিদিকে নিয়মিতভাবে যে সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাদের কল্যাণে কলিকাতার জনসাধারণ আজ তাঁদের সঙ্গীতনৈপুণ্যের সহিত বিশেষভাবেই পরিচিত। এই দুই সঙ্গীতশিল্পীর নাম শোনে নি এমন লোক আজকের দিনে কলকাতা শহরের গীতামোদী মহলে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ দীর্ঘকাল মাইহার রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও মাইহারের সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। মধ্য-প্রদেশের অধুনাবিলুপ্ত ছোট একটি রাজ্য এই মাইহার স্টেট, তথায় এই বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের জীবনধারা স্বতঃই নিস্তরঙ্গ ছন্দে প্রবাহিত ছিল। এই স্তিমিত জীবনপ্রবাহের ভিতর প্রথম বেগের চাঞ্চল্য এল যখন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ভারতবিখ্যাত নর্তক শ্রীউদয়শঙ্কর ও সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এলেন। শ্রীউদয়শঙ্কর ওস্তাদপ্রবরকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ইউরোপের যেখানেই উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা প্রদর্শিত হয়েছে সেখানেই নৃত্যের পরিপূরক হিসাবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। ওস্তাদ ইউরোপ ভূখণ্ড থেকে বহু সম্মানে ভূষিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর উদয়শঙ্করের নৃত্যসম্প্রদায়ের সহিত স্বদেশেও বহু স্থলে তাঁর সঙ্গীত-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তখন থেকে ওস্তাদজীর নাম সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জনপরিচিতির এই হল প্রথম পর্ব। তারপর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতনায়ক-চতুষ্টয়ের অন্যতম হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর থেকে ওস্তাদজীর নাম আরও ব্যাপকভাবে ভারতের সর্বপ্রান্তে প্রচারিত হয়। এখন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর নাম সঙ্গীতজগতে একটি প্রাত্যহিক শব্দ বললেও চলে।

সাধারণের মধ্যে, এমন কি সঙ্গীতামোদী মহলেও ওস্তাদ আলাউদ্দীন

খাঁর সম্পর্কে অনেক কাল একটি ধারণা ছিল যে, তিনি অবাঙালী। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা উত্তর ভারতেই সমধিক মাত্রায় হয়ে থাকে। এই নজীরে ওস্তাদজীকে উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনে করার অনুকূলে আপাতগ্রাহ্য যুক্তি ছিল। কিন্তু বাঙালী মাত্রের পক্ষেই পরম সন্তোষ ও গর্বের বিষয় এই যে, ওস্তাদ এই বাংলা দেশেরই সন্তান। তাঁর বাড়ী বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান ত্রিপুরা জিলার শিবপুর গ্রামে। ওস্তাদ সাধারণ মুসলমান কৃষক পরিবারের সন্তান। পরিবারটির মূল পেশা হল বাদ্যকর বৃত্তি, তবে অবসরকালে কৃষিকার্যও তাঁরা করতেন। ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় পেশাদার বাদ্যকরদের বলা হয় 'নাগারচি'। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পিতা সদু মিঞা একজন সুপরিচিত নাগারচি ছিলেন। উৎসবে অনুষ্ঠানে বিবাহাদি ক্রিয়ায় শিবপুরের এই পরিচিত নাগারচি দলটির ঘন ঘন ডাক পড়ত। আলাউদ্দীন খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফ্‌তাবুদ্দীন খাঁ ছিলেন একজন বাঁশী ও তবলাবাদক। আউলবাউলপন্থী সহজিয়া সাধনভজনের পথেও তিনি অনেকদূর অগ্রসর ছিলেন। এই জন্যে লোকে তাঁকে আফ্‌তাবুদ্দীন ফকির বলত। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শিবপুরের এই বাদ্যকর বংশটি ধর্মে মুসলমান হলেও হিন্দুধর্মের অনুমোদিত সাধনভজনের প্রক্রিয়ায় বীতরাগ ছিলেন না। আফ্‌তাবুদ্দীন ফকির ও ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এই দুই ভ্রাতা তাঁদের যৌবনে শ্রীকাইলের কালীসাধক ভুবন রায়ের সংস্পর্শে আসেন। এঁর প্রভাব ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গীতসাধনার উপর বিশেষ ভাবেই পড়েছিল। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মুসলমান, মুসলমানের আচরিত প্রাত্যহিক নিয়মাদি তিনি অতিশয় সম্ভ্রমভরে পালন করেন; তৎসত্ত্বেও এক অজ্ঞাত আকর্ষণ বশে তিনি অদ্যাবধি মাতৃভাবের একজন একান্ত সাধক। ওস্তাদজীর কন্যার নাম অন্নপূর্ণা। এ থেকেও হিন্দু দেবদেবীর প্রতি পরিবারটির অনুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেতারবাদনে একজন নিপুণা শিল্পী। পিতা অতি যত্নের সঙ্গে কন্যাকে আবাল্য সঙ্গীত শিক্ষা দান করেছেন। ওস্তাদজীরই সুযোগ্য শিষ্য ভাবতবিখ্যাত সেতার-বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের সহিত শ্রীমতী অন্নপূর্ণার বিবাহ হয়েছে।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ যৌবনে সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে অশেষ কষ্ট ভোগ করেন। ত্রিপুরার অখ্যাত অঞ্চলের অজ্ঞাত এক মুসলমান পল্লীযুবক সাধারণ

নাগারূচি হয়েই যদি জীবন শেষ করতেন তা হলে বলবার কিছু থাকত না। কিন্তু আলাউদ্দীন খাঁ সাধারণ ধাতুতে গড়া ছিলেন না। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অতি প্রবল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি প্রথম যৌবনে সংসারী জীবনের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে গোপনে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন এবং নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কলকাতায় উপনীত হন। কলকাতায় তিনি তৎকালীন বিখ্যাত কর্নেটবাদক হাবু দত্তের নিকট একাদিক্রমে বারো বৎসর কর্নেট ও ক্লারিওনেট শিক্ষা করেন এবং অন্যান্য ওস্তাদের সংস্পর্শে আসেন। কলকাতায় ওস্তাদজীর অবস্থিতিকাল অপরিসীম সংগ্রামময়, দুঃখ-লাঞ্ছনায় কানায় কানায় ভরা। প্রথমতঃ একজন সহায়সম্বলহীন যুবকের পক্ষে অভিজাত ধনীশাসিত সঙ্গীতের অধিকার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করাটাই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার; তার উপর তিনি মুসলমান হওয়ায় অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ওস্তাদকে অনেক সময় প্রকৃত নাম গোপন করে সঙ্গীত শিক্ষা করতে হয়। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি সামান্য বেতনে ক্লারিওনেট-বাদকের কাজ করতেন, তখন নিরুপায় হয়ে হিন্দু নামের আশ্রয়ে তাঁকে জীবিকার সংস্থান করতে হয়েছে। ওস্তাদের প্রাথমিক জীবনের সঙ্গীত শিক্ষার ইতিবৃত্ত উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর। এ সব কাহিনী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংকলিত হয়েছে। ওস্তাদ স্বমুখেও সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের (রিপোর্টার) নিকট এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আমাদের আলোচনার পরিসরের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাহুল্যবোধে সে কাহিনী এখানে সংকলনে বিরত রইলাম।

কলকাতায় থাকাকালীন ওস্তাদ একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে উচ্চাঙ্গ যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরে নি। যে ব্যক্তি উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষার জন্য আত্মীয়-পরিজন, নববিবাহিতা পত্নী, গ্রামের আবাল্য পরিচিত পবিবেশ ও অনায়াসলভ্য জীবিকার আকর্ষণ ত্যাগ করে অনাত্মীয় আবেষ্টনীর রূঢ় কঠোর জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গীতসাধনা একটা পর্যায়ে এসে থেমে থাকবে এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন—এ হতে পারে না। শ্রেষ্ঠ সাধনা আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত আলাউদ্দীন খাঁর শান্তি ছিল না। তাঁর ভিতরকার আবেগই তাঁকে নিত্য নূতন অনুশীলনের পথে চালিত করেছিল। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার সঙ্গীতোৎসাহী জমিদার

রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর গৃহে ওস্তাদ আহমেদ আলী খাঁর যন্ত্রবাদন-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের এই দৃঢ় ধারণা হয় যে, তিনি এ যাবৎ যা শিক্ষা করেছেন তা ছেলেখেলা মাত্র, তাঁকে আরও অনেক বেশী কঠোর সাধনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সঙ্গীতসাধনায় এই নিরতিশয় অপূর্ণতার বোধ মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং উত্তর ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্র রামপুরে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন বিখ্যাত বীণবাদক ওস্তাদপ্রবর ওয়াজির খাঁ সাহেব রামপুর দরবারের প্রধান সভাশিল্পী। রামপুরের নবাব ওয়াজির খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং স্বয়ং একজন গুণী কলাকার। আলাউদ্দীন খাঁ ওয়াজির খাঁ সাহেবের নিকট প্রথমে কোন-প্রকার উৎসাহই পান নি। একে আলাউদ্দীন খাঁ রাগসঙ্গীতের অনুশীলন-কারী 'ঘরানা' কোন সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সন্তান নন, তার উপর তিনি বাঙালী। বাঙালীর সাঙ্গীতিক অধ্যবসায়ে খাঁ সাহেবের আস্থা ছিল না। কিন্তু এই অমিতোৎসাহ বাঙালী সঙ্গীতার্থীর আগ্রহাতিশয্য দর্শনে শেষ পর্যন্ত ওয়াজির খাঁ সাহেবের মন টলে। প্রায় আড়াই বৎসর সাধ্যসাধনা ও বিরতিচ্ছেদহীন উপেক্ষামণ্ডিত অপেক্ষার পর আলাউদ্দীন খাঁ ওয়াজির খাঁ সাহেবের শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু এ অধিকারও শর্তহীন নয়। ওয়াজির খাঁ দূরদেশাগত অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে বীণের শিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ হন, পরিবর্তে স্বরোদ শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেন। আলাউদ্দীন খাঁ তাতেই খুশী। একেবারে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিও আশীর্বাদস্বরূপ। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ একাগ্র নিষ্ঠায় স্বরোদ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘকাল ওয়াজির খাঁ সাহেবের সেবা পরিচর্যা ও নির্দেশ অনুসরণ করে স্বরোদ যন্ত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হয়ে ওঠেন। ওয়াজির খাঁ সাহেব একদা অবজ্ঞাত শিষ্যের এই অপ্রত্যাশিত কৃতিত্বে যৎপরোনাস্তি প্রীত হয়ে তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন।

প্রায় একটানা তেত্রিশ বৎসর আলাউদ্দীন খাঁ শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষাপর্ব শেষ হওয়ার পর ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ মাইহার মহারাজের অনুরোধে মাইহার দরবারের প্রধান সভাশিল্পীর পদ গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর জীবনের

দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়। মাইহারেই ওস্তাদজীর সংসার-জীবনের সূত্রপাত। পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি এখানেই হয়। মাইহারে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের অন্যতম প্রধান কীর্তি মাইহার ব্যাণ্ড গঠন। এই ব্যাণ্ডে দেশী-বিদেশী অন্যূন চল্লিশটি যন্ত্রের সমাবেশ ঘটানো হয় এবং তার দ্বারা এক আড়ম্বরপূর্ণ ঐকতানিক দল গড়ে তোলা হয়। ওস্তাদ মুখ্যতঃ স্বরোদবাদক হলেও বহু যন্ত্রে তাঁর অভ্যাস ও নিপুণতা আছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতাদর্শের প্রতিও তিনি অশ্রদ্ধাশীল নন। বেহালার তিনি একজন ওস্তাদ শিল্পী, তৎসত্ত্বেও এইক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিল্পীদের উৎকৃষ্টতর বাদননৈপুণ্য তিনি স্বীকার করেন। শোনা যায়, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকের বেহালা শুনে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর আর নিজে বেহালা স্পর্শ করেন নি। ওস্তাদজী ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের গভীর অনুরাগী হওয়া সত্ত্বে অভারতীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণে অবহেলাপরায়ণ নন। তা যদি হতেন, বিভিন্নদেশীয় যন্ত্রের সমবায়ে মাইহার ব্যাণ্ড গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাঁর মনে জাগত না। সত্য বটে, ভারতীয় রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি ও স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে ওস্তাদজীর মধ্যে অনেকখানি পরিমাণে নৈষ্ঠিক রক্ষণশীলতা আছে, তবে সে রক্ষণশীলতা ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই বিনিঃশেষে সীমাবদ্ধ। ঐকতানিক অর্থাৎ অর্কেস্ট্রা-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় হার্মনির রীতি প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী। বস্তুতঃ এই আদর্শের ভিত্তিতেই তাঁর মাইহার ব্যাণ্ড গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় যন্ত্রে ইউরোপীয় অর্কেস্ট্রেশনের রীতি প্রয়োগের তিনিই বোধ করি এদেশে প্রথম দৃষ্টান্তস্থল। তারপর তাঁরই শিষ্য তিমিরবরণ ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই রীতিটির আরও অনুশীলন করেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ মূলতঃ স্বরোদবাদক। স্বরোদ অতি ভারী যন্ত্র; বাদনপদ্ধতিতে তা বীণ, রবাব, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি ধ্রুপদী সঙ্গীতের রসাশ্রিত যন্ত্রের স্বগোত্র। স্বভাবতঃই আলাপ অঙ্গের কাজে এর সমধিক উপযোগিতা। গৎ বাদনেও এর স্ফূর্তি কম নয়, তবে বড় দরের শিল্পীরা গতের চাইতে আলাপই পছন্দ করেন বেশী। ওস্তাদ একজন শ্রেষ্ঠ আলাপী। ওস্তাদের আলাপের রস সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে তাঁরই মত পরিশুদ্ধ অন্তরে তন্ময়তার সহিত সঙ্গীতের গহনে তলিয়ে যাওয়া দরকার। হাল্কা-চটুল মন

নিয়ে আলাউদ্দীন খাঁর সুরের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। গৎ যত ভাল হোক, গতের মধ্যে এক ধরনের চটুলতার আমেজ আছে বলে গৎকে শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে তোলা অসম্ভব। এই কারণে স্বভাবতঃ গভীর-গম্ভীর ওস্তাদ গৎ পারতপক্ষে পরিবেশনে করতে চান না। আলাপেই তাঁর স্ফূর্তি, আলাপেই তাঁর সহজ তন্ময়তা। আলাপকে তিনি ভগবানের সহিত একাত্মতার উপলব্ধির উপায় স্বরূপ মনে করেন। সেইজন্য এর সম্পর্কে ন্যূনতম হেলা-ফেলার মনোভাবও তিনি বরদাস্ত করতে নারাজ। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবেরই গুরুভাই, ওয়াজির খাঁ সাহেবের শিষ্য ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ (গোয়ালিয়র) স্বরোদের একজন নিপুণ শিল্পী, তাঁর হাত অতি সুমিষ্ট। তবে গৎ অঙ্গেই তাঁর কৃতিত্ব ; আলাপ অঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। আলাউদ্দীন খাঁর তুলনায় হাফেজ আলি খাঁর হাত মিষ্টতর বটে, লোকে তাঁর বাজনা শুনে সমধিক মুগ্ধ হয় সে কথাও সত্য ; তবে সুররসিক মহলে এ প্রতিতুলনা গুরুত্বহীন। চটুলতা ও সহজ মিষ্টত্বের আদর্শকে যাঁরা প্রকৃত সুরসৃষ্টির অন্তরায় মনে করেন তাঁদের বিচারের মানদণ্ডে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ অবিসম্বাদিভাবে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদার অধিকারী।

তবে সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর বাদনক্রিয়ার মধ্যে এক ধরনের শুষ্ক কঠোরতা আছে, যা সুরের ঐন্দ্রজালিক সম্মোহের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। খুব সম্ভব দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের দুঃখ-কষ্টের পীড়ন ও বহুবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতা ওস্তাদের বাদনক্রিয়ার মধ্যে কঠোরতার আভাস এনে থাকবে। জীবনে যিনি বহুকাল আনন্দের আবহাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন তিনি যত বড় মাপের শিল্পীই হোন, তাঁর সর্বাত্মক আনন্দসৃষ্টির প্রয়াস কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হতে বাধ্য।

ওস্তাদ স্বয়ং কতিপয় নূতন রাগ সৃষ্টি করেছেন—এদের মধ্যে হেমন্ত-বিলাব্‌ল, নাগার্জুন, মায়াবতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ওস্তাদের কাছে বাঙালী যে সকল শিল্পী তালিম নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ওস্তাদের অনুজ ভ্রাতা আয়েত আলী খাঁ, পুত্র আলী আকবর খাঁ, ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর হোসেন, শ্রীতিমিরবরণ, শ্রীরবিশঙ্কর, শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী, শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনীহারবিন্দু চৌধুরী।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পর স্বরোদ-বাদনে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য যে মুষ্টিমেয়সংখ্যক শিল্পী ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। এঁর বর্তমান বয়স পঁয়তাল্লিশ। অতি শৈশবেই পিতার নিকট এঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়। তারপর একাদিক্রমে বহু বৎসর একাগ্র সাধনায় ইনি স্বরোদ অভ্যাস করেন। ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে তিনি সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ একাধিক সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি বিদেশেও তাঁর সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শন করে এসেছেন। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ তাঁর স্বরোদ বাদ্য শ্রবণে বিমুগ্ধ হন। আলী আকবর অনেক কাল কার্যসূত্রে রেডিওর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আলী আকবর খাঁর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হল, এঁর হাত অতি দ্রুত সঞ্চরণক্ষম, অথচ তা সুমিষ্ট। দ্রুত বাদনক্রিয়ার দ্বারা তাক লাগাতে যেমন তিনি ওস্তাদ, সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে শ্রোতার চিত্ত বিগলিত করতেও তিনি সমান নিপুণ। তালের সূক্ষ্ম কূটক্রিয়াতেও তিনি কম সুদক্ষ নন। আলী আকবর খাঁ দ্রুতগতি ও সুরস্রষ্টা দুই-ই। আলী আকবর খাঁ সাধারণ-প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলিই সচরাচর বাজিয়ে থাকেন, আজকের অনেক গায়ক-বাদকের মত কূটরাগ বা লুপ্তপ্রায় রাগ নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি করবার অভ্যাস তাঁর নেই। বহু জনপ্রিয় রাগরাগিণী থাকতে খ্যাতিলাভের শুরুতেই কূটরাগ নিয়ে আত্যন্তিক উৎসাহ প্রকাশ চাপল্যের পরিচায়ক। সুখের বিষয় আলী আকবর খাঁ এ প্রদর্শনবাদী দুর্বলতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত।

ওস্তাদ আলাউদ্দীনের কথায় জানা যায়, তিনি সঙ্গীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ যা-কিছু দেবার, তা তাঁর কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণাকে (শ্রীযুক্তা রবিশঙ্কর) দান করেছেন। অন্নপূর্ণা ধ্রুপদাঙ্গ ঐতিহ্যের গানে ও বাদনে পিতার কাছ থেকে তালিম পেয়েছেন সব চাইতে বেশী। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা আসরে বাজান না, একটি সাময়িক পত্রের রিপোর্ট অনুসারে, "মাঝে মাঝে ভগবৎসাধনার জন্য শেষরাত্রে একক বাজিয়ে থাকেন।"

আলী আকবর খাঁর পুত্রের নাম আশীষ খাঁ। বয়স সাতাশ-আটাশের কোঠায়। মাস্টার আশীষও আজকাল পিতামহ ও পিতার সঙ্গে আসরে

আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছেন। পিতামহের সঙ্গে বসেই বেশী বাজান। কয়েক বছর আগে মহম্মদ আলী পার্কে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আসরে দাদু ও নাতির যৌথ বাদনক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলাম। রাত্রির শেষ যামের স্তব্ধ আবহাওয়া সেই অনবদ্য সম্মিলিত বাদনের সম্মোহে থমথম করে উঠেছিল। ছবিটি বহুকাল মনে থাকবে।

কেশরবাঈ কারকার ও হীরাবাঈ বরোদকার

প্রায় পঁচিশ বছর আগে শ্রীমতী কেশরবাঈ কারকার ও শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকার সঙ্গীত সম্মেলনের আমন্ত্রণে প্রথম যখন কলকাতায় গান গাইতে আসেন, এই দুই গুণী মহিলা সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গীতনৈপুণ্যের তুলনামূলক আলোচনায় কলকাতার সাঙ্গীতিক মহল বিশেষ সরব হয়ে ওঠেন। পত্র-পত্রিকায় এঁদের গায়নপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবন্ধ নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। এ সকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল, শ্রীসোমনাথ মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ। সে সময় এই অকিঞ্চিৎকর লেখকও আলোচনাকারীদের দলে ছিলেন। আলোচনা স্পষ্টতঃই দ্বিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এক দলের অভিমত ছিল এই যে, কেশরবাঈ কারকারের সঙ্গীতনৈপুণ্যের সঙ্গে হীরাবাঈ বরোদকারের নৈপুণ্যের তুলনা হয় না; অন্য দল এ মতের প্রতিকূলতা করেছিলেন। তাঁরা শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের সমধিক পাণ্ডিত্য ও কলাকুশলতার উৎকর্ষ স্বীকার করে নিয়েও বলতে চেয়েছেন যে, সুরসৃষ্টির দিক দিয়ে শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকারের গানের আবেদন বেশী। রস যদি শিল্পের প্রধান বস্তু হয়ে থাকে তা হলে গানের বেলায় সুরের মাধুর্যকে সকলের উপরে মর্যাদা দিতে হয়। এই মান-দণ্ডে শ্রীমতী হীরাবাঈএর গানের 'পরেই তাঁরা তাঁদের সুস্পষ্ট পক্ষপাত ন্যস্ত করেন।

মামলাটি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দরবারে উঠেছিল। সে সময় কবিগুরু বেলঘরিয়াস্থিত 'গুপ্তনিবাস'-এ বাস করছিলেন, পরে এ বাড়ীটিতে শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সন্ন্যাসপন্থী হলেও দিলীপকুমার রায় চিরউদ্যমশীল, তিনি কবির শ্রবণার্থে গুপ্তনিবাসে কেশরবাঈ কারকারের গানের একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। কবি কেশরবাঈ-এর গান শুনে অতিশয় প্রীত হন এবং উচ্ছ্বসিত ভাষায় সে গানের প্রশংসা করেন।

কলকাতার শীতকালীন সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠানগুলিতে এই দুই গুণী প্রায়ই এসে থাকেন। ভবিষ্যতেও হয়ত আসবেন। এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে এই দুই মহিলা রাগসঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গীতনৈপুণ্য ও গায়নপদ্ধতির একটি

তুলনামূলক আলোচনা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সহজিয়া পন্থার সাধক হওয়া সত্ত্বেও কবির কেশরবাঈ-এর গান কেন ভাল লেগেছিল সে বিচারও এ প্রসঙ্গে একনজর করা যেতে পারে।

শ্রীমতী কেশরবাঈ কারকার পঞ্চাশোত্তীর্ণা। দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সঙ্গীত-সাধনা তাঁর কৃতিত্বের পশ্চাতে লুক্কায়িত আছে। সঙ্গীতসাধনায় তাঁর গুরু হলেন পরলোকগত ওস্তাদ আহ্লাদিয়া খাঁ সাহেব। শ্রীমতী কারকার এঁর নিকট বহু বৎসর শিক্ষা করেন। আহ্লাদিয়া খাঁ সাহেবের ঘরানার বৈশিষ্ট্য হল স্বরবিস্তারে গভীর-গম্ভীর বিলম্বিত ঢঙ এবং গানে দানাদার তানের প্রাচুর্য। এঁদের ধারায় খেয়াল-অঙ্গের গানে যে ধরনের বিস্তার করা হয় তার মধ্যে চাপল্য বা চটুলতা আদৌ নেই, সবটাই সুস্থির, সংযত, সংহত। ধ্রুপদের আলাপ-অঙ্গের ঢঙ-এর সঙ্গে এঁদের খেয়ালের স্বরবিস্তারের মিল আছে। তান-কর্তবের ভঙ্গির মধ্যে টপ্পার দানাদার তানের কিঞ্চিৎ আমেজ থাকলেও টপ্পার চাপল্যের দ্বারা এ তানক্রিয়া কলুষিত নয়। বছর তেইশ-চব্বিশ আগে ওস্তাদ আহ্লাদিয়া খাঁ সাহেব কলকাতা এসেছিলেন, সে সময় বর্তমান গ্রেস সিনেমা হলে তাঁর সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করবার আমাদের সুযোগ হয়। তখন তিনি নিতান্তই বৃদ্ধ, কণ্ঠে সুর ফোটে কি ফোটে না দেহের এমনি জীর্ণ অবস্থা। ওই অশীতিপর বৃদ্ধের খেয়াল গানের ভিতর সেদিন যে-শ্রেণীর তানকর্তব শুনে-ছিলাম ঠিক ওই জাতের তান একমাত্র কেশরবাঈ-এর কণ্ঠেই শুনতে পাওয়া যায়। এ থেকে শিষ্যার তানক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের উৎস নিরূপণ করতে কষ্ট হয় না। মৃত্যুর সমীপবর্তী খাঁ সাহেবের গান সুরমাধুর্যের দিক থেকে সেদিন আমা-দের সামান্যই আনন্দ দিতে পেরেছিল, তবে গানের ভঙ্গিমার মধ্যে একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ ঘরানার অনতিব্যক্ত সংকেত খুঁজে পেয়েছিলাম। যৌবনের পূর্ণ দীপ্তিময় অবস্থায় এ ঘরানার গানের কী রূপ হতে পারে তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় নি। শ্রীমতী কেশরবাঈ এই যোগ্য গুরুরই যোগ্যা শিষ্যা।

শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকার 'কিরানা' ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইনি প্রথম জীবনে এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ বাবুমানের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, পরে ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবদুল ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের নিকট ইনি বহু বৎসর সযত্ন নিষ্ঠায় সঙ্গীতাভ্যাস করেছেন। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কাছেও ইনি তালিম

পান। রাগবিস্তারের বিশিষ্ট ভঙ্গী ও গমক তানের বৈচিত্র্যের জন্য কিরানা ঘরোয়ানা বিখ্যাত। কিরানা ঘরানার আরও দুজন মহিলা শিল্পীর নাম সুবিদিত—শ্রীমতী হীরাবাঈ-এর ভগিনী শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ রানে এবং হুবলীর শ্রীমতী গঙ্গুবাই হাঙ্গাল। এঁরা দুজনেই কলকাতায় একাধিকবার এসেছেন।

শ্রীমতী হীরাবাঈ মূলতঃ হালকা চালের গানের কৃতী শিল্পী। হীরাবাঈ-এর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মাধুর্য ও সুরের স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি তাঁর গানের একটা প্রধান ঐশ্বর্য, তবে মনে হয় তাঁর এ বৈশিষ্ট্য হাল্কা অঙ্গের খেয়াল, তারাণা ও ঠুংরী গানে যেমন অবলীলায়িত প্রকাশ লাভ করে এমন ভারী চালের গানে নয়। শ্রীমতী হীরাবাঈয়ের তানদক্ষতাও অসীম। তাঁর তান অতিশয় দ্রুত ও অনাড়ষ্ট। হীরাবাইয়ের সুরবিস্তারের কায়দাটুকুও তারিফ করবার মত।

শ্রীমতী কেশরবাঈ ভারী চালের গানের একজন সবিশেষ নিপুণা শিল্পী। কেশরবাঈয়ের কণ্ঠস্বর হীরাবাঈয়ের কণ্ঠস্বরের মত সুরেলা ও মাধুর্যমণ্ডিত না হওয়া সত্ত্বে গায়নপদ্ধতির বিশিষ্টতা ও উচ্চতর উৎকর্ষের জন্য তা গানের ক্ষেত্রে সমধিক ফলপ্রদভাবে প্রযুক্ত। বিলম্বিত ও মধ্য লয়ের খেয়ালের গভীর-গম্ভীর সংযত রূপটি শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের কণ্ঠে অতি সুষ্ঠুভাবে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। মহিলা শিল্পীরা সাধারণতঃ হাল্কা চালের গানেই সমধিক স্ফূর্তি অনুভব করেন। তাঁদের কণ্ঠস্বরটিও এই জাতীয় গানেরই বিশেষ উপযোগী। কণ্ঠস্বরের স্ত্রীলোকসুলভ চড়া (shrill) ভাবটি গাম্ভীর্যের সহায়ক নয়। পুরুষের মোটা গলায় ধ্রুপদাঙ্গ ও বিলম্বিত খেয়াল-জাতীয় গান যত ভাল খোলে, স্ত্রীলোকের হাল্কা ধাতব কণ্ঠে তেমন খোলে না। অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম হলেন পরলোকগতা জোহ্‌রা বাঈ, গহরজান বাঈ এবং এখনকার কালের শ্রীমতী কেশরবাঈ। এঁরা মহিলা শিল্পী হয়েও বিলম্বিত ঢঙয়ের খেয়ালে বিচক্ষণ পুরুষশিল্পীর মতই সমান সুদক্ষ। এঁদের কণ্ঠস্বরেও চটুলতার কোন আমেজ পাওয়া যায় না। শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের কণ্ঠে দরবারী কানাড়ার খেয়াল শুনেছি। দরবারী কানাড়া রাগের গভীর-গম্ভীর রূপ পরিস্ফুটনের পক্ষে স্বভাবতঃই ভারী গলার কার্যোপযোগিতা অধিক, কিন্তু মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করেছি, কেশরবাঈয়ের কণ্ঠস্বরে দরবারীর গভীর-গম্ভীর সংহত রূপটির কিছুমাত্র বিকার ঘটে না। শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের

কণ্ঠস্বরের ভিতর কোথায় যেন পরুষ কণ্ঠস্বরের একটা আভাস আছে, সেটি ভারী রাগের বিশেষ সহায়ক বলে মনে হয়। কেশরবাঈয়ের কণ্ঠস্বরের এই বৈশিষ্ট্য তার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে সন্দেহ নেই, তবে ক্ষতির পিঠে একটা লাভও হয়েছে। কণ্ঠস্বরের এই পরুষ ভাবদৃপ্ত বলিষ্ঠতার কারণে ভারী অঙ্গের গানে তিনি সহজেই দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন, যে দক্ষতা হাল্কা গলায় কখনও অধিগম্য হত বলে মনে হয় না। শ্রীমতী হীরাবাঈ হাল্কা চালের গানের যত নিপুণা শিল্পীই হোন-না কেন, ভারী অঙ্গের গানে তাঁর কণ্ঠস্বরের অপূর্ণতা সুপ্রকট। তাঁর সুচিক্কণ গলায় গাওয়া অতি ভারী অঙ্গের খেয়ালও মনের ভিতর দাগ কাটে না। তাঁর সুর ভেসে যায়, কোথাও স্থির হয়ে বসে না। শ্রীমতী কেশরবাঈ ও শ্রীমতী হীরাবাঈ-এর শৈল্পিক উৎকর্ষের তারতম্যের মূল সংকেতটি 'এখানেই নিহিত আছে বলে মনে করি।

সঙ্গীতাদর্শের ক্ষেত্রে সহজিয়া পন্থার পরিপোষক হয়েও রবীন্দ্রনাথ কেন কেশরবাঈয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন এই আপাতরহস্যের কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের গানে ধ্রুপদ সঙ্গীতের আদর্শ অবিচল নিষ্ঠায় অনুসরণ করেছেন। বিলম্বিত ঢঙয়ের হিন্দুস্থানী খেয়ালের ছায়ায় রচিত কিছু কিছু খেয়াল গানও তাঁর আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের এই আদর্শ পরিহার করে সুরের মিশ্রণের আদর্শটিকে গ্রহণ করেছিলেন। যে সুরবিন্যাসের সাহায্যে প্রাণের সহজ আকুতি অবলীলায়িত ছন্দে ফুটিয়ে তোলা যায় তিনি এই কালের গানে ঠিক সে জাতীয় সুরবিন্যাসই অবলম্বন করেছেন দেখা যায়। উত্তর জীবনের রবীন্দ্রসঙ্গীত ধ্রুপদের দৃঢ় সংবদ্ধ ঋজু-কঠিন রূপের অনুবর্তী নয়, পক্ষান্তরে মিশ্রণভিত্তিক সহজ সুরাদর্শের অনুগত। সুরের স্বতঃস্ফূর্ত লীলাই সে যুগের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর প্রধান হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সহজের সাধনাটিকেই মূল সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তার মানে এ নয় যে, রাগসঙ্গীতের আদর্শ তিনি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছিলেন। পরবর্তী স্তরের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যেও রাগসঙ্গীতের সূক্ষ্ম

প্রভাবের সাক্ষাৎ মিলবে। মূলতঃ ধ্রুপদের ভিত্তিভূমির উপর তিনি সহজিয়া গানের প্রাকার খাড়া করে তুলেছিলেন। এই জিনিসটি ভালো করে বোঝা দরকার, কারণ এটি না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সের গানে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্লাসিকাল আদর্শ গ্রহণ করেন নি সত্য, তবে তাঁর তাবৎ সাঙ্গীতিক প্রয়াস—সে প্রথম বয়সেরই হোক আর মধ্য বা শেষ বয়সেরই হোক—মুখ্যতঃ ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ঐতিহ্যের উৎস থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে এসেছে। মধ্য ও শেষ বয়সের রচিত গানে তিনি রাগসঙ্গীতসুলভ ঋজুতার ও কাঠিন্যের আদর্শটি মেনে নেন নি এই মাত্র তফাৎ। এই ঋজুতা ও কাঠিন্যকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। বাংলা গানের প্রকৃতি নমনীয় ও সুকুমার, কাঠিন্যের ভর তার উপর সয় না, এইটিই সম্ভবতঃ বাংলা গানের সুরের কাঠামোয় ঋজু ভঙ্গি প্রয়োগে কবির আপত্তির মূল হেতু। কিন্তু এই আপত্তি নিছক বাংলা গানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাগসঙ্গীতের নিজস্ব পরিধির মধ্যে ঋজু কাঠিন্যের আদর্শকে তিনি মূল্য দিতেন না এমন মনে করবার হেতু নেই। কবির শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজম্-এর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। যেখানে কবি ঐতিহ্যের পরিপোষক সেখানে তিনি ক্লাসিসিস্ট, যেখানে তিনি স্বয়ং স্রষ্টা সেখানে মূলতঃ রোমান্টিসিস্ট। বাংলা গানে তিনি রোমান্টিক ভাবাদর্শের অনুসারী, পক্ষান্তরে রাগসঙ্গীতের স্বক্ষেত্রে তিনি ক্লাসিকাল আদর্শেরই সমধিক অনুরাগী ছিলেন বলে মনে হয়।

শিল্পবিচারের এই পটভূমিটি মনে রাখলে শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক সপ্রশংস মনোভাবের কারণ খুঁজে বার করা কঠিন হবে না। কেশরবাঈয়ের গানে ঋজুতার তথা দার্ঢ্যের প্রভাব সবিশেষ ; পক্ষান্তরে হীরাবাঈয়ের গান কোমল লতিকাতুল্য নমনীয়, ভঙ্গুর, দুর্বল। আমাদের ভারতীয় রাগসঙ্গীতের আদর্শের মধ্যে সৃজনী আবেগের স্ফূর্তির অবকাশ সুবিস্তৃত, সুরকে যথা ইচ্ছা বিকশিত করে তোলার সুযোগ অবারিত ও অপরিমিত ; কিন্তু হাল্কাচটুল নমনীয়তার স্থান তাতে নেই। থাকলেও সে স্থান খুব প্রশস্ত বলা যায় না। রাগসঙ্গীতের আদর্শের মধ্যে যে শিল্পদৃষ্টি প্রতিফলিত তা সৃজনী প্রতিভার সহায়ক হয়েও গাম্ভীর্যের পোষক। জীবনের গভীর-গম্ভীর তদ্‌গত ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে রাগসঙ্গীত

বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে, উপরন্ত এর সঙ্গে ঈশ্বর-অনুভূতি যুক্ত হওয়ায় সে গানের আবেদন গ্রহিষ্ণু চিত্তে আরও বেশী প্রবল হয়ে দেখা দেয়। রাগসঙ্গীত গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে এক গভীর ঐক্যের চেতনা সৃষ্টি করে। এই চেতনা ঐশী চেতনার স্বগোত্র। রাগসঙ্গীতের সুর যখন প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়ায় গমগম করে, কী এক অলক্ষিত বন্ধনসূত্রে গায়ক, যন্ত্রী ও শ্রোতা নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায়। নাদরূপী যে পরম সত্তা জগৎ সংসারের অন্তরালে চূড়ান্ত সত্যরূপে বিরাজমান, সেই সত্তার সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি জাগ্রত হলেই বুঝি বহু মানুষের মধ্যে এমন গভীর ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হওয়া সম্ভব।

শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের গানের সুরসৃষ্টির মধ্যে আছে এই তদ্গত ভাবের সমৃদ্ধ আশ্বাস; তাঁর সুরবিস্তারের গভীর-গম্ভীর ভঙ্গির মধ্যে আছে আত্মসমর্পণের শ্রেষ্ঠ তন্ময়তা। সেই তুলনায় হীরাবাঈয়ের গান জাগতিক ব্যাপার। সে গান সুরমাধুর্যে মুগ্ধ করলেও প্রাণে কোন গভীর আকুতির সৃষ্টি করে না। হীরাবাঈয়ের সঙ্গীত সৃজনীপ্রতিভার লক্ষণযুক্ত সন্দেহ নেই, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার, ওই সৃজনী প্রতিভা মধ্যবর্তী স্তরের প্রতিভা; শ্রীমতী কেশরবাঈয়ের খানদানী কৃতিত্বের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্তরে আমরা আভিজাত্যের আদর্শে বিশ্বাস করি না, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে করি। সামাজিক সম্বন্ধের বেলায় বনেদিয়ানার দাম নেই এই জন্য যে, তা প্রায়শঃ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এবং নিছক গায়ের জোরে অপরের উপর আরোপিত। কিন্তু শিল্পগত আভিজাত্য শিল্পীর স্বকীয় সাধনার উপর পূর্ণাংশে নির্ভরশীল। এই আভিজাত্য বংশানুক্রমে আসে না, ধনকৌলীন্যের খাত বেয়ে আসে না, আসে স্বোপার্জিত কৃতিত্বের জোরে। এই মানদণ্ডে শ্রীমতী কেশরবাঈ অতি উচ্চশ্রেণীর একজন শিল্পী, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

বাংলাদেশের বিষ্ণুপুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার জন্য বিখ্যাত। বিশেষতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধ্রুপদ শাখায় বিষ্ণুপুরের একটি দীর্ঘকালাগত বিশিষ্ট ঐতিহ্য বর্তমান। বাংলা দেশ প্রত্যন্ত প্রদেশ, এই কারণে মুঘলদরবারের আবহাওয়ায় পুষ্ট উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বাংলাদেশের সাঙ্গীতিক জীবনের উপর অনেক কাল তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। হিন্দু ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রভাব বাংলায় বহু দিন অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত ছিল। ধ্রুপদের রাগবিশুদ্ধির আদর্শ ত্যাগ করে উত্তর ভারতের মুসলমান ওস্তাদগণ যখন ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় খেয়ালের রসবৈচিত্র্য ও ঠুংরীর মিশ্রণভিত্তিক স্বরমাধুর্যের আদর্শের দিকে ঝুঁকলেন, বাংলার সঙ্গীতচর্চা-কারিগণ তখনও ধ্রুপদকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা তেমন ব্যাপক নয়। সেটিও একটি কারণ যেজন্য বাঙালীর সঙ্গীতপ্রীতি দীর্ঘকাল যাবৎ খেয়াল-ঠুংরীর পরিবর্তে ধ্রুপদকে অবলম্বন করেই মুখ্যতঃ বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছে। বাংলার প্রধান গৌরবের বস্তু ধ্রুপদ এবং সঙ্গীতের এই ধ্রুপদী সংস্কার বাংলার প্রবীণ সঙ্গীতামোদী মহলে আজিও অল্পবিস্তর অপরিম্লান আছে।

বিষ্ণুপুর এ জাতীয় রক্ষণশীল সঙ্গীতচর্চার একটি কুলীন কেন্দ্র। প্রধানতঃ দুইটি সাঙ্গীতিক পরিবারকে অবলম্বন করে বিষ্ণুপুরের এই কৌলীন্য-লক্ষণমণ্ডিত সঙ্গীতানুরাগ আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে—বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ও গোস্বামী পরিবার। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে যেমন বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের জন্ম হয়েছে, তেমনি গোস্বামী পরিবারেও একাধিক শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেছে। সঙ্গীতাচার্য অনন্তলাল, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সত্যকিঙ্কর—বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কয়েকজন কৃতী সঙ্গীতকার। অন্য পক্ষে জগৎচাঁদ গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামী বংশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। উভয় পরিবারই মুখ্যতঃ ধ্রুপদ সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী, এঁদের চেষ্টায়ই বিশেষ করে বাংলা দেশে ধ্রুপদের চর্চা আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে বলা চলে। এই

ক্ষেত্রে এতদুভয়ের একের প্রয়াস অপরের পরিপূরক হয়েছে। সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রেও দুই পরিবারের মধ্যে উদার লেনদেনের সম্পর্ক বহু কালাবধি বিদ্যমান। এক পরিবারের শিক্ষার্থীর পক্ষে অন্য পরিবারে গুরুবরণ মোটেই বিরল ঘটনা নয়।

এর দৃষ্টান্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী স্বয়ং। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রণালীবদ্ধ ভাবে বেশ কিছুকাল ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। অনন্তলাল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদেব। সেই সুবাদে রাধিকাপ্রসাদ ছিলেন এঁদের গুরুভাই। ধ্রুপদ শিক্ষার পাশে পাশে তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর নিকট খেয়ালের শিক্ষাও গ্রহণ করতে থাকেন। এই ভাবে একটানা বারো বৎসর শিক্ষা গ্রহণের পর রাধিকাপ্রসাদ কলকাতায় আসেন এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভা-গায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নির্দেশক্রমে বেতিয়ার মহারাজ নন্দকিশোরের ঘরানাশ্রিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মধ্যে কিছুদিন তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপাল চক্রবর্তী ('নুলো গোপাল') মহাশয়ের কাছেও সাগরেদি করেছিলেন। শিবনারায়ণ মিশ্র ধ্রুপদ ও ধামারের ক্ষেত্রে একজন গুণী কলাবিৎ ছিলেন, অন্য পক্ষে গুরুপ্রসাদ ছিলেন খেয়ালের কৃতী শিল্পী। এঁদের কাছ থেকে রাধিকাপ্রসাদ ধ্রুপদ-খেয়াল দুইয়েরই গভীর শিক্ষা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ যদু ভট্টের নিকটেও তিনি কিছুকাল ধ্রুপদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। রাধিকাপ্রসাদ এস্রাজ বাদনে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর পিতা জগৎচাঁদ গোস্বামী ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক, তবে মৃদঙ্গ বাদনের দিকে পুত্র তেমন ঝোঁকেন নি।

শিক্ষা সমাপনান্তে গোঁসাইজী সঙ্গীত শিক্ষাদান কার্যে বিশেষ ভাবে ব্রতী হন। ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় আসরে তাঁর সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শন চলতে থাকে। গোঁসাইজীর সহিত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর বিশেষ যোগ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে ঠাকুরবাড়ীর শেষ সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র। একই কালে গোঁসাইজী আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়কের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এই দ্বিবিধ কাজে তাঁর দশ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাধিকাপ্রসাদের নিকট

কিছুকাল সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই অনুপ্রেরণায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুসরণে ধ্রুপদ গান রচনায় প্রবৃদ্ধ হন।

রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীতশিক্ষাদান কার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে সঙ্গীতজ্ঞ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এইরূপ কতিপয় কৃতী ছাত্রের নাম—মহীন মুখোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র ললিত মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি মালাকার, শ্রীবিশ্বনাথ সান্ন্যাল, নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় এবং ভারতবিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী। রাধিকাপ্রসাদ যখন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় তত্রস্থ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কর্মরত, সেই সময় গিরিজাশঙ্কর দীর্ঘ আট বৎসরকাল রাধিকাপ্রসাদের নিকট ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়ালের শিক্ষাও গ্রহণ করেন। (পরে গিরিজাশঙ্কর ভাইয়াসাহেব গণপৎ রাও ও মৈজুদ্দীন খাঁ সাহেবের নিকট বিশেষভাবে ঠুংরীর তালিম প্রাপ্ত হন।) রাধিকাপ্রসাদ কাশিমবাজার থেকে পুনরায় কলকাতা আসেন এবং পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতপ্রিয় জমিদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতায় উত্তর কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হন। যুগপৎ সঙ্গীত অনুশীলন ও সঙ্গীতশিক্ষাদান চলতে থাকে। রাধিকাপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (বিপিনচন্দ্র গোস্বামীর পুত্র) এই সময়ে পিতৃব্যের নিকট নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদী রীতির একজন বিশিষ্ট প্রকাশক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক জীবনে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের অভিজ্ঞতালাভ মূলতঃ রাধিকাপ্রসাদের সূত্রেই সংসাধিত হয়। কবি রাধিকাপ্রসাদের প্রশংসা কীর্তন করেছেন এইভাবে—

“রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশিষ্ট একটি রূপসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশি।”

গোঁসাইজী ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে আমন্ত্রিত হন। সেখানে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (সম্মেলনের সভাপতি) তাঁর সঙ্গীতের ঔপপত্তিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রয়োগনৈপুণ্য উভয় কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে বিশেষ মুগ্ধ হন। তিনি রাধিকাপ্রসাদের সম্পর্কে লেখেন :

Professor Radhika Prasad Goswami came and sang at the conference and was much appreciated by the connoisseurs. I have also had the pleasure of discussing matters musical with him more than once. His knowledge of the theory is really worthy of a veritable Professor of music. His style is also fine. He really deserves the title "Sangit-Visarad" conferred on him by Bharati Mandali of Benare ."

অস্যার্থ, সঙ্গীতাধ্যাপক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী সম্মেলনে এসেছিলেন এবং গান গেয়েছিলেন। তাঁর গান রসিক শ্রোতারা খুবই তারিফ করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে একাধিকবার আমার আলোচনার সুযোগ হয়েছে। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক দিকে তাঁর যে জ্ঞান, তা একজন বিচক্ষণ সঙ্গীতাচার্যেরই উপযুক্ত। তাঁর গায়ন পদ্ধতিও চমৎকার। কাশীর ভারতী মণ্ডলী তাঁকে 'সঙ্গীত-বিশারদ' উপাধি প্রদান করেছেন, এ উপাধি তাঁর সর্বাংশে প্রাপ্য।

এ থেকেই রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সাঙ্গীতিক গুণপনার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে। লক্ষ্ণৌ সম্মেলন থেকে প্রত্যাগত হবার কিছুদিনের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই অসুখেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। দিলীপকুমার রায় তাঁর ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায় লিখেছেন—"গোঁসাইজীর তিরোধানে বাংলা আজ মুকুটহীন হয়েছে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এঁর মৃত্যুতে শুধু বাংলা নয় ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হল সে ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়।"

সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল হল পরলোকগমন করেছেন। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তিতে বাংলা ধ্রুপদী সঙ্গীতের জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। বাংলাদেশের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারার সার্থক প্রতিনিধি আর বিশেষ কেউ বেঁচে নেই; গোপেশ্বর ছিলেন বলতে গেলে এই ধারার শেষ সফলতম প্রতিনিধি। তাঁর তিরোধানে, সুতরাং, একটি যুগের অবসান হল বলা চলে।

গোপেশ্বর ছিলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের সুসন্তান। বিষ্ণুপুর দীর্ঘকাল যাবৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে এসেছে। আমরা আগেও বিষ্ণুপুরের বিষয়ে আলোচনা করেছি, এই প্রবন্ধেও বিষ্ণুপুরের কথা বলতে হবে। বস্তুতঃ বিষ্ণুপুরকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ক কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হবার নয়। বিষ্ণুপুরের দুটি বিশিষ্ট হিন্দু পরিবার—গোস্বামী পরিবার এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার—বাংলাদেশে রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংস্পৃষ্ট। শেষোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেরই সন্তান হলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এই কৃতী পরিবারে গোপেশ্বর ছাড়াও আরও অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের জন্ম হয়েছে। যথা, সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপেশ্বরের পিতৃদেব), সঙ্গীতবিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় ধারার সঙ্গীত চর্চাতেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বিশিষ্টতার ছাপ বর্তমান।

বাংলার তানসেনরূপে খ্যাত প্রসিদ্ধ গায়ক যদু ভট্টেরও জন্মস্থান এই বিষ্ণুপুর।

ক্ষুদ্র এক মফঃস্বল শহরের সীমিত পরিসরের মধ্যে এতগুলি সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব স্থানটির বিশিষ্টতা সূচিত করে। বাংলার সাঙ্গীতিক মানচিত্রে বিষ্ণুপুরের যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

বিষ্ণুপুর ধ্রুপদচর্চার কেন্দ্র। উত্তর-ভারতের ধ্রুপদী ঐতিহ্য থেকে এখান-

কার ধ্রুপদী ঐতিহ্যের কিছু পার্থক্য আছে। উত্তর-ভারতের ধ্রুপদী ঐতিহ্য মুঘল আমলে মুসলমানী দরবারী আবহাওয়ায় তার পূর্বতন বিশুদ্ধতার আদর্শ থেকে বহুলপরিমাণে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় ধ্রুপদ প্রাচীন প্রবন্ধ সঙ্গীত থেকে জাত ও মূলতঃ হিন্দু সঙ্গীত। ভগবদ্ভক্তির বাহনরূপে প্রধানতঃ এই সঙ্গীতের চর্চা হয়ে এসেছে হিন্দু যুগে। বাদশাহী শাসনের যুগে ধ্রুপদের এই কুলীন আদর্শ আর বজায় থাকে নি। দরবারের পৃষ্ঠপোষিত মুসলমান কলাবতের দল ধ্রুপদের বিশুদ্ধতা ও গাম্ভীর্যের হানি ঘটিয়ে তাতে নানা রঙ-রসের যোজনা করে চলেছিলেন। ধ্রুপদের স্থিরভাব ঘুচে গিয়ে তাতে এল চাঞ্চল্যের বেগ। বিলম্বিত লয়ের বদলে দ্রুত ও মধ্যলয়ের গান বেশী গীত হতে লাগল। এইভাবে ধ্রুপদ ভেঙে খেয়ালের সৃষ্টি হল। দেখতে দেখতে ধ্রুপদের প্রভাব কমে গিয়ে গোটা উত্তর ভারতে খেয়ালের সবিশেষ আধিপত্য বিস্তৃত হল।

কিন্তু বাংলাদেশে উত্তর-ভারতের এই রূপান্তর-ক্রিয়ার ছোঁয়াচ তেমন লাগেনি। বাংলাদেশ যেহেতু প্রত্যন্ত প্রদেশ সেই কারণে উত্তর-ভারতের প্রভাব থেকে তা সব সময়েই অল্পবিস্তর মুক্ত ছিল। যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতাপ্রিয়তা একটি ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি সুবিদিত। বরাবরই বাংলার একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শ বর্তমান। এই কারণ বশতঃ বাংলায় ধ্রুপদের আদর্শ বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত ছিল; উত্তর-ভারতীয় খেয়ালের প্রভাব এখানে ক্রমবিস্তৃত হতে বহু সময় লেগেছে। প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করেই বাংলায় এই বিশুদ্ধ ধ্রুপদচর্চার ঐতিহ্যটি বহমান ছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগুণী পরিবারগুলি নানা পরিবর্তন ও রূপান্তরের ডামাডোলের মধ্যেও হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন গৌরব বাঁচিয়ে রাখতে সবিশেষ সহায়তা করে এসেছেন।

পরিবর্তনের মুখে পুরাতনকে আঁকড়ে থাকা এক ধরনের রক্ষণশীলতা সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় এই রক্ষণশীলতার প্রয়োজন ছিল। তখন যদি বিষ্ণুপুরের ঘরানার সঙ্গীতজ্ঞরা ধ্রুপদের বিশুদ্ধি রক্ষায় যত্নপর না হতেন তা হলে হয়ত পরবর্তীকালে ধ্রুপদের অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যেত বাংলাদেশ থেকে। ধ্রুপদের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য হারিয়ে আমরা কোন দিক দিয়েই লাভবান হতুম না।

বিষ্ণুপুরের গোস্বামী ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ বাংলায় ধ্রুপদাশ্রয়ী হিন্দু সঙ্গীতের সংরক্ষণের আধার স্বরূপ ছিলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ধ্রুপদের কৌলীন্য ও বিশুদ্ধি প্রধানতঃ রক্ষা পায়। এইজন্য সঙ্গতভাবেই এই দুই বংশ বাংলার সঙ্গীতামোদী সকল শ্রেণীর লোকের কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদেরও এই কারণে তাঁদের নিকট ঋণী বোধ করা উচিত।

ইংরেজী ১৮৭৮ সালে গোপেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন। তাঁর পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেইকালের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। গোপেশ্বরের অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতী সঙ্গীতজ্ঞরূপে সারা ভারতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এ দুইয়ের কাছ থেকেই গোপেশ্বর সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পান। গোপেশ্বরের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ অতি মধুর ছিল; পরে উত্তর জীবনে গভীর অনুশীলনের দ্বারা কণ্ঠস্বরের সেই স্বাভাবিক মাধুর্যকে আরও পরিমার্জিত করেন। শুধু যে একজন প্রতিভাধর ধ্রুপদ গায়ক রূপেই গোপেশ্বরের খ্যাতি বিস্তৃত হয় তা নয়; সঙ্গীতের ঔপপাত্তিক তথা তাত্ত্বিক আদর্শের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যাতেও তিনি বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেন। আমাদের সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রয়োগনৈপুণ্য ও তাত্বিক জ্ঞানের এককালীন সমাহারের দৃষ্টান্ত খুব কমই চোখে পড়ে; কিন্তু সুখের বিষয় গোপেশ্বরের মধ্যে সেই বিরল সমন্বয় সহজেই সাধিত হয়েছিল। এবং যেহেতু গোপেশ্বরের সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বে এই সমন্বয় সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেই কারণে অচিরকালের মধ্যেই সঙ্গীতজগতে তাঁর মাথা সকলের মাথা ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে। নানা জায়গা থেকে ক্রমে গোপেশ্বরের কাছে আহ্বান আসতে থাকে। বাংলার একাধিক প্রসিদ্ধ রাজপরিবার ও অভিজাত পবিবারের মানী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগ এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ও গোপেশ্বরের মধ্যে সঙ্গীত বিষয়ে নানা সময়ে বহু মূল্যবান আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞানী গোপেশ্বরের কাছ থেকে নানা কূট রাগের কলাকৌশল শিক্ষা করেন এবং এই শিক্ষা তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত-রচনায়

সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক ব্রহ্মসঙ্গীতের সুর-যোজনার পিছনে গোপেশ্বরের প্রত্যক্ষ উদাহরণের প্রভাব কাজ করেছে। অন্যপক্ষে গোপেশ্বরও কবিগুরুর গান জনসমক্ষে প্রচারে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি আগাগোড়া ধ্রুপদের ভঙ্গীতে রচিত। এগুলিকে বিশুদ্ধ বাংলা ধ্রুপদের উদাহরণ রূপেও গ্রহণ করা চলে। সুতরাং সেগুলির প্রকাশে ও প্রচারে কুশলী ধ্রুপদ গায়কের সহযোগিতা অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী ও সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গোপেশ্বরের সঙ্গীতজ্ঞানের গভীরতা ও প্রয়োগনৈপুণ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, "বর্তমান বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গায়ক। গোপেশ্বরের চেয়ে বড় ওস্তাদ কেউ আছেন কিনা সে কথা বলা কঠিন।"

নাটোরাধিপতি যোগীন্দ্রনাথ রায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গোপেশ্বর সম্পর্কে লিখেছেন, "সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন গায়ক, যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমগ্র ভারতবর্ষে আছে কিনা সন্দেহ।"

প্রসিদ্ধ বীণকার সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছেন —"সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভারতে আজ সুবিখ্যাত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই বঙ্গদেশের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন, কেন না ভারতের সঙ্গীতগুণী সুরশিল্পীদের মধ্যে ইহার আসন অতি উচ্চে।"

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বহু সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ভজন বিবিধ শ্রেণার গান তিনি রচনা করেছেন এবং সেগুলির অধিকাংশ বিশেষ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। এসব গান ও সেগুলির স্বরলিপি তার সঙ্গীতপুস্তকগুলিতে বিধৃত আছে। সঙ্গীতপুস্তক-গুলির কয়েকটির নাম হল—গীত-প্রবেশিকা, গীতদর্পণ, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, বহুভাষা গীত, গোপেশ্বর-গীতিকা ইত্যাদি।

গোপেশ্বর পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছেন—মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮৪ হয়েছিল—, সুতরাং সেই দিক থেকে তাঁর লোকান্তরপ্রাপ্তিতে

শোক করবার কিছু নেই। কিন্তু ক্ষোভের কারণ ঘটবে যদি দেখা যায় তিনি যে সঙ্গীতাদর্শের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় আমৃত্যু প্রযত্ন করেছেন সেই আদর্শকে আমরা আমাদের অবহেলায় পরিম্লান হতে দিই বা তাঁর স্মৃতিরক্ষার যথাযথ উদ্যোগ না করি। গোপেশ্বরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের (যিনি নিজে একজন কৃতী সঙ্গীতজ্ঞ এবং বর্তমানে যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর ডীন রূপে বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের দায়িত্বপূর্ণ কর্মে অধিষ্ঠিত) সঙ্গীতকুশলতার মধ্যে গোপেশ্বরের স্মৃতি কিছু পরিমাণে বেঁচে থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। বিষ্ণুপুরের সাঙ্গীতিক খ্যাতি সারা ভারতে সুবিদিত। গুণী মহল বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের জন্য তাকে ‘দ্বিতীয় দিল্লী’ নামে অভিহিত করে থাকেন। তা-ই যদি হয় তো বিষ্ণুপুরকেই কেন্দ্র করে গোপেশ্বরের স্মৃতি সংরক্ষণের স্থায়ী বন্দোবস্ত হোক না কেন। সরকার যদি ইচ্ছা করেন বিষ্ণুপুরে স্বচ্ছন্দে একটি সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাতে গোপেশ্বরের নাম অঙ্কিত থাকবে। সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট আয়োজনে বাধা থাকে তো একটি সঙ্গীতশালা অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। মোট কথা, কিছু একটা অবশ্যই করা দরকার। আমরা আমাদের সঙ্গীতগুণীদের ঋণ স্বীকার করতে জানি না বা মৃত্যুর পরে তাঁদের ভুলে যাই এই অপবাদ যেন আমাদের শিরে না ধারণ করতে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

বিখ্যাত গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী পরলোকগমন করেছেন আজ বহু বৎসর হল। বাংলার সাঙ্গীতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে গোস্বামী মহাশয়ের অপরিমেয় দান সহজে ভোলবার নয়। বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না এমন কথা বলা ঠিক হবে না ; সত্যি কথা বলতে, কোন কোন গায়কের কলানৈপুণ্য ও গাইবার ঢঙ গোস্বামী মহাশয়ের কলানৈপুণ্য ও গাইবার ঢঙের চাইতে উচ্চাঙ্গের ছিল। কিন্তু কণ্ঠের ঐশ্বর্যে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন কেউ তাঁর জীবিত-কালে অন্ততঃ বর্তমান ছিলেন না। সঙ্গীতকুশলতার একটি মূল উপাদান হল কণ্ঠ ; কণ্ঠ যাঁর নেই তাঁর পক্ষে গান গেয়ে লোকচিত্ত জয় করার চেষ্টা বৃথা। সঙ্গীতের মূল্যনির্ণয়ে তাই কণ্ঠের গুরুত্ব সমধিক। এই দিক থেকে বিচার করলে গোস্বামীর কৃতিত্ব তাঁর সমসাময়িক বহু গায়কেরই কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে যাবে। কণ্ঠসম্পদকে বাদ দিয়ে সঙ্গীতকুশলতার বিচার হতে পারে না এমন নয়, তবে সে বিচার পূর্ণাঙ্গ হয় না।

'জ্ঞান গোঁসাই' এর সেই অপূর্ব কণ্ঠসম্পদ ছিল। তিনি প্রকৃতিদত্ত সহজাত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উদার গম্ভীর সাবলীল কণ্ঠ তিনি স্বভাবের আশীর্বাদ হিসেবে পেয়েছিলেন, কিন্তু কণ্ঠের 'সাধা' ভাবটুকু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সেই স্বভাবদত্ত কণ্ঠের পিছনে সুগভীর অনুশীলন আর পরিমার্জনার ইতিহাস লুকোনো ছিল। অর্থাৎ, স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠ পেয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তাকে সাধনায় সাধনায় বিশোধিত করে তোলার গৌরবটুকু তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ও অভিনিবেশের জোরেই অর্জন করেছিলেন।

এ কথার বড় প্রমাণ তাঁর তান। অনেকেই বলবেন তাঁর তান আশানুরূপ শিল্পসম্মত ছিল না, আকস্মিক বেগে যত্রতত্র তান প্রয়োগ করে তিনি গানের মূল রস মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করতেন এবং সে সব তানের বাঁধুনিও খুব উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি খুবই অবলীলায়িত, ক্ষিপ্র-বেগে তান প্রয়োগ করতে পারতেন। পিছনে দীর্ঘ সাধনার সযত্ন অনুশীলন বিদ্যমান না থাকলে এমন স্বচ্ছন্দ, অব্যাহত গতিতে তান দেওয়া সম্ভব কিনা সে কথা বিবেচ্য।

গোস্বামীর গানের স্টাইল আলোচনা করবার পূর্বে আমাদের বিচার করা দরকার, তিনি বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ school বা ঘরানার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বরাবর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুশীলন করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গীতনৈপুণ্যকে বিশেষ করে বাংলা গানের পরিপুষ্টিসাধনেই প্রয়োগ করেছিলেন। আসরে বসে যেমন নানা রাগিণীতে হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়াল গান গাইতেন, তেমনি হুবহু তাদেরই ছন্দে ও ঢঙে রচিত বাংলা গান গাইতেও তাঁর অরুচি ছিল না। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের গানগুলি যে এই বিশেষ ধরনের বাংলা গানেরই সমষ্টি সে সম্বন্ধে আশা করি শ্রোতা-মাত্রেরই অভিজ্ঞতা আছে।

আমরা প্রচলিত অর্থে বাংলা গান বলতে বুঝি হয় আধুনিক বাংলা গান, নয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, নয় বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে রচিত অথচ আবেগের মিশাল দেওয়া বাংলা গান (এখনকার সাঙ্গীতিক পরিভাষায় যার নাম হয়েছে 'রাগপ্রধান'), কিংবা কীর্তন, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালি ইত্যাদি। গোস্বামীর বাংলা গান এর কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর বাংলা গান বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত—তার ভাষাটাই যা বাংলা, নইলে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত থেকে তাকে আলাদা করবার যো নেই। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ অথবা খেয়াল ভেঙে ঠিক অক্ষর মেপে মেপে, রাগিণী ও তালের সাযুজ্য রেখে, কবিতার ছন্দের সমতা নষ্ট না করে, ফরমায়েস অনুযায়ী এই বাংলা গানগুলি তৈরি হত, তারপর তাদের যথাযথ হিন্দুস্থানী গানের ঢঙে গেয়ে গেলেই হল। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের কলাকারু আর পদ্ধতি-প্রকরণ যাঁর আয়ত্তের মধ্যে, তাঁর পক্ষে এই ধরনের বাংলা গানের প্রতি সুবিচার করা সহজ। তবু আর কেউ যে জ্ঞানবাবুর মত গাইতে পারতেন না তার কারণ, জ্ঞানবাবুর কণ্ঠসম্পদ আর কারও গলায় ছিল না। কণ্ঠের গুণে এই ধরনেব গানে তিনি অন্য সবাকার কৃতিত্ব সহজেই ম্লান করে দিতে পেরেছিলেন।

বাংলার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য অনুধাবন করলে দেখা যায়, এই ধাঁচের বাংলা গান জ্ঞানবাবুই প্রথম গেয়েছেন তা নয়। বিখ্যাত গায়ক অঘোর চক্রবর্তী, লালচাঁদ বড়াল, জ্ঞানবাবুর জ্যেষ্ঠতাত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি পূর্বাচার্যরা এবং গোস্বামীরা যেখানকার অধিবাসী সেই বিষ্ণুপুরেরই অপর এক সঙ্গীতনিপুণ পরিবার বন্দ্যোপাধ্যায়রা (সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর

প্রভৃতি যে পরিবারের সন্তান) এই ধরনের বিশুদ্ধ রাগাশ্রিত বাংলা গানের বিধিবদ্ধ অনুশীলন করেছেন। হিন্দুস্থানী খেয়াল ভেঙে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলায় একাধিক 'ভাঙা খেয়াল' রচনা করেছিলেন ; সে-সব গানও উল্লিখিত বাংলা গানেরই স্বগোত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ওস্তাদদের আওতায় প্রথম জীবনে ধ্রুপদ ও খেয়ালের ভঙ্গিতে যে-সব ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্যান্য গান রচনা করেছিলেন সেগুলিকেও এই পর্যায়ে ফেলা চলে। আধুনিক সুরকারদের মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম এইভাবে হিন্দুস্থানী গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করবার সজ্ঞান প্রচেষ্টা করেছেন, তবে তিনি সে-সব গানের সুরযোজনায় পুরাপুরি হিন্দুস্থানী চাল বজায় রাখেন নি, ইচ্ছামত বাংলা সুরের আমেজও ঢুকিয়েছিলেন। জ্ঞানবাবুর বাংলা গান বাংলা ভাষা আর বাঙালী গায়কের কণ্ঠস্বরে যতটুকু বাংলা আমেজ আসে ততটুকু বাংলা ছিল, নইলে তাঁর গান মুখ্যতঃ উঁচু চালের হিন্দী গান, খোলসটুকু শুধু বাংলার।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, জ্ঞান গোস্বামী একটি বিশেষ ভঙ্গির বাংলা গানের পুনঃপ্রবর্তনে চেষ্টিত ছিলেন, যে ধারা বাংলা দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। সুতরাং গানে জ্ঞানবাবু ছিলেন revivalist, প্রগতিপন্থী তাঁকে কোনরূপেই বলা চলে না। আমরা বরাবর সঙ্গীতে প্রগতিমুখীনতার সমর্থন জানিয়ে এসেছি ; যে সঙ্গীতের ঝোঁক পুনরুজ্জীবনের দিকে, বিপ্লবের সম্ভাব্যতার দিকে নয়, তার প্রতি আমাদের অন্তরের অনুমোদন নেই। এই দিক থেকে, জ্ঞানবাবুর সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তেমন সমর্থন করা যায় না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর অতীতাশ্রয়ী দৃষ্টি-সীমার মধ্যেই তিনি এমন অনবদ্য সৃষ্টিকুশলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন যা আমাদের মত ভবিষ্যদ্‌বিশ্বাসীদেরও তাঁর গুণমুগ্ধ করে তুলেছিল। জ্ঞানবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে তার পর আর তাঁর গান উপভোগ করবার পথে বাধা ছিল না।

জ্ঞানবাবু কী গাইতেন, তার পরেই আসে তিনি কেমন করে গাইতেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই জ্ঞানবাবুর ব্যক্তিত্বের কথা বলতে হয়। ব্যক্তিত্ব অর্থে এখানে সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে। জ্ঞানবাবুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গি (যার অপর নাম মুদ্রাদোষ), গানের প্রাথমিক সুরসৃষ্টির ধ্যানস্থতা,

মাঝে মাঝে গান থামিয়ে গানের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গতকারী কিংবা তানপুরা-ধারীকে উত্তেজিত তিরস্কার কিংবা শ্রোতাদের সঙ্গে সহাস্য রসালাপ—সবই কেমন তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছিল। সেগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অঙ্গ ছিল বলা চলে।

রাগের আলাপন ও বিস্তারে নিয়মসম্মত প্রথা অনুসরণ করার প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল। একের পর এক পাপড়ি উন্মোচিত হয়ে যেমন ফুল বিকশিত হয়, তেমনি যে রাগে যেমন প্রয়োজন নীচু থেকে উঁচুতে একটির পর একটি পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি আলাপের মধ্য দিয়ে সমগ্র রাগরূপটিকে উদ্বোধিত করে তুলতেন। তানের প্রয়োগে তিনি প্রায়শঃ চাঞ্চল্যজাত অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সুরবিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি সেই চাঞ্চল্যকে অবদমিত করেছিলেন। সেখানে তিনি ছিলেন স্থৈর্যশীল, সংযত, গম্ভীর। আলাপ ও বিস্তারের প্রক্রিয়ার সঙ্গে গতানুগতিক গাম্ভীর্য ও স্থিরতার যে ধারণা যুক্ত আছে, সেই ধারণাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে মেনে নেবার মধ্যেই গোস্বামীর এই স্থিতিশীল গাম্ভীর্যের ব্যাখ্যা মেলে। নইলে জ্ঞানবাবু প্রকৃতিতে ছিলেন চঞ্চল, আবেগময়, স্ফূর্তিপ্রবণ।

জ্ঞানবাবু ধরাবাঁধা ভাবে এককালীন অনেকদিন এক ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেননি, তবে ছাড়া ছাড়া ভাবে তিনি কয়েকজন সঙ্গীতগুরুর সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পিতৃব্য প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে শিক্ষালাভ করেন। উত্তর জীবনে সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় এবং আরও পরে ভারতবিশ্রুত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের লেখা থেকে জানা যায়, গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরেরও সাগরেদি করেছিলেন।*

জ্ঞানবাবু রেডিও এবং গ্রামোফোনের নিয়মিত গায়ক ছিলেন। গ্রামোফোনের রেকর্ডে তিনি জনচিত্তহারী কত বাংলা গানই না গেয়েছেন। সে সব গান বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে আন্দোলিত হয়ে ফিরেছে—অবশ্য জ্ঞানবাবুর গানের কাঠামোটুকু মাত্র জনতার কণ্ঠে উঠে এসেছে, তার কলাকারু বা আঙ্গিক নয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি যে সব গান গেয়েছেন সঙ্গীতপ্রিয়রা সকলেই অল্পবিস্তর তাদের

সঙ্গে পরিচিত আছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র গানের নামোল্লেখ করলুম : "অনিমেষ আঁখি আমার" (বাগেশ্রী), "মুরলীর ধ্বনি কার" (জৌনপুরী), "যা সখি আন্ তারে মোর বুকে ফিরায়ে" (ইমন-কল্যাণ), "আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়" (দরবারী-কানাড়া), "শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়" (ছায়ানট), "একি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাত" (মালকোষ), "মন বলে তুমি আছ ভগবান, চোখ বলে তুমি নাই" (ভৈরবী), "লীলায়িত চঞ্চল অঞ্চল পরশন" (বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল), "ঘন পবন শিহরিত বনানী রে" (বাহার) ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত গানগুলি থেকে দেখা যাবে, জ্ঞানবাবু সাধারণতঃ প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলিকে ভিত্তি করেই তাঁর সঙ্গীতের পরিবেশনা-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন, অর্ধ-প্রচলিত বা অপ্রচলিত রাগের আশ্রয় তিনি পারতপক্ষে গ্রহণ করেন নি। তার মানে এ নয় যে তিনি দুরূহ রাগ গাইতে পারতেন না, তার মানে এই যে, জনমনের উপর উক্ত শ্রুতিমধুর রাগিণীগুলির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং বাঙালীর মন-মেজাজের উপযুক্ত জ্ঞানে তিনি সেগুলিকেই তাঁর গানের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অন্য একটি উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল। ইমন কিংবা বাগেশ্রীর আস্থায়ীও ভাল করে গাইতে পারে না অথচ এদিকে সুরদাসী মল্লার, শিবরঞ্জনী বা সিংহেন্দ্র-মধ্যমা প্রভৃতি স্বল্পপরিচিত বা অপরিচিত রাগ-রাগিণী নিয়ে মাতামাতি করবার স্পর্ধা আছে এমন সব ধৃষ্ট গায়কদের সামনে তিনি বোধ করি একটুখানি বিনয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

জ্ঞান গোঁসাইয়ের কণ্ঠ নীরব হল। বাংলার প্রথিতযশা গায়কেরা একে একে অস্তমিত হচ্ছেন। নূতন যুগের সঙ্গীতসাধকদের মধ্যে আমরা জ্ঞান গোস্বামী, ভীষ্মদেব, তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী প্রমুখের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলাম। গোস্বামী চলে গেলেন ; এখন ভরসা বাকী যাঁরা রইলেন তাঁরা। এই ভরসার মর্যাদা কি তাঁরা রাখবেন ?

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বাংলার দুই প্রথিতযশা রাগসঙ্গীতশিল্পী। ধ্রুপদ গানে বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন একটি ঐতিহ্য বর্তমান, টপ্পা গানেও বাঙালী শিল্পীর খ্যাতি অনেক দিনের। কিন্তু খেয়ালে ও ঠুংরী গানে এখনও তেমন কোন সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে নি এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় না। মনে হয় শেষোক্ত ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকারদের তুলনায় বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীদের সৃষ্টি-ক্ষমতায় যে অপূর্ণতা আছে, উল্লিখিত সঙ্গীতজ্ঞদ্বয়ের সাধনার ফলে তা কতকাংশে পূরণ হয়েছে। এই দুটি নামের সঙ্গে যদি আমরা পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর নাম যোগ করি তা হলে দেখতে পাব, আধুনিক কালের সীমার ভিতর বাংলা দেশে খেয়াল গানের চর্চা নেহাৎ কম হয় নি, এবং শিল্পগত উৎকর্ষের বিচারে সে সাঙ্গীতিক অবদান উত্তর ভারতীয় সাঙ্গীতিক অবদানের সহিত অনায়াস-তুলনীয়। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে উত্তর ভারতীয় মুসলমান ওস্তাদদের অশিক্ষা, অনুদারতা ও কুসংস্কারের কঠোর সমালোচনা করলেও একটা জায়গায় এঁদের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। তা হল ওস্তাদদের স্বাভাবিক সুরসৃষ্টির নৈপুণ্য ও শিল্পী মেজাজ। তদনুপাতে হিন্দু সঙ্গীত-কারদের দৃষ্টিভঙ্গি শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা অতিরিক্ত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত বলা যায়। এবং যে পরিমাণে হিন্দু সঙ্গীতের উপর শাস্ত্রীয় প্রভাব পড়েছে সেই পরিমাণে তা ঋজু-কঠোর হয়ে উঠেছে এবং তার শৈল্পিক উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওস্তাদদের সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান ত্রুটিযুক্ত হলেও তাঁদের কণ্ঠ ও বাদননৈপুণ্য বিতর্কাতীত।*

হিন্দু সঙ্গীত সম্পর্কে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে উত্তর ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেয়াল সঙ্গীতাদর্শের প্রভাবে হিন্দু রাগসঙ্গীতশিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গির এই ঋজুতা ক্রমশঃ নমনীয় হয়ে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। শাস্ত্রীয় শাসনের প্রভাব কিছুকাল আগে পর্যন্তও হিন্দু সঙ্গীত-

---

* ভাতখণ্ডেজীর সহিত শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনায় এই তথ্য প্রকাশিত। দিলীপকুমারের 'গীতশ্রী' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শিল্পীদের প্রকাশভঙ্গির ভিতর স্বতঃই যে কাঠিন্যের সঞ্চার করেছিল একালীন আবহাওয়ার সংস্পর্শে তা বিগলিত হবার লক্ষণ স্পষ্ট। উপরে যে ত্রয়ী বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীর নাম করা হল তাঁদের তিনজনাই হিন্দু। কিন্তু তাঁদের গায়ন-পদ্ধতি ও সুরসৃষ্টির ধারা লক্ষ্য করে এমন কথা কোনমতেই বলা চলবে না যে, উত্তর ভারতীয় ওস্তাদদের শিল্পগত নৈপুণ্যের মান থেকে তাঁরা খুব বেশী দূর পিছনে পড়ে আছেন। বিশেষ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী উভয়েই সুর রূপায়ণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত শিল্পী। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাধ্যবাধকতার দ্বারা তাঁরা বদ্ধ নন, পক্ষান্তরে যুগোচিত শিল্প-চেতনা তাঁদের উভয়েরই সঙ্গীতসৃষ্টিকে যথার্থ প্রাণলক্ষণমণ্ডিত করেছে। ভীষ্মদেব এবং তারাপদকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এ যুগের দুই প্রধান খেয়াল শিল্পী বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।

পরিতাপের বিষয়, বেশ কয়েক বৎসর হল ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ অল্পবিস্তর মূক হয়ে আছে। তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও নেই—গানহারা পাখির মতো তাঁর কণ্ঠের কাকলি সাময়িক ভাবে স্তব্ধ। সেই যে সঙ্গীত-শিল্পী ভীষ্মদেব আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রেরণায় পণ্ডিচেরী আশ্রমস্থ হয়েছিলেন তার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতে তিনি আর পূর্বের ন্যায় সক্রিয় নন—এমন কথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না। ভীষ্মদেব বেশ কিছুকাল হয় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু তিনি আর পূর্বের মত সঙ্গীতামোদী মহলের অধিগম্য নন। বস্তুতঃ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বতন গীতমুখরতার অধ্যায়ের আংশিক অবসান হয়েছে বললেও চলে। বাংলা দেশের সঙ্গীতজীবনের পক্ষে এটি যে কী অপূরণীয় ক্ষতি তা বলে বোঝানো যায় না। হয়ত ভীষ্মদেব আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বহু দূর অগ্রসর হয়েছেন, তবে দৃশ্যতঃ এক গভীর মূল্যের বিনিময়ে তাঁকে এই সাফল্য অর্জন করতে হয়েছে। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে যা আপাতলাভ, তা সঙ্গীত-জীবনের পক্ষে সুস্পষ্ট ক্ষতির কারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়ত সঙ্গীতের প্রতি আমাদের অনুরাগ কিয়ৎপরিমাণে পক্ষপাতদোষদুষ্ট তাই এ কথা বলছি, কিন্তু ও পক্ষেও যে পক্ষপাতজনিত একদেশদর্শিতা থাকতে পারে না এমন নয়। যা হোক, এই লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশের শেষে কী দাঁড়ায় সেইটেই বিচার্য। চূড়ান্ত বিচারে, ভিন্নতর অনুভূতির আকর্ষণে সঙ্গীতজগত থেকে শ্রীভীষ্মদেবের

অবসর গ্রহণ দেশের পক্ষে কতটা লাভজনক হয়েছে তা সুধীজনকেই বিবেচনা করতে বলি।

অতি অল্প বয়সেই ভীষ্মদেবের সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্ফুরণ হয়। এক হিসাবে তাঁকে বালক-প্রতিভা (prodigy) বলা যায়। চৌদ্দ বৎসর বয়স কালে তিনি সর্বপ্রথম যে দুটি টপ্পা গানের রেকর্ড করেন তা থেকেই তাঁর স্বভাবদত্ত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গান দুটির মধ্যে বালক শিল্পীর যে কণ্ঠের স্ফূর্তি ও উৎকর্ষ প্রকাশমান, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর বয়স্ক গায়কের নৈপুণ্যের সহিত তুলনীয়। পরে ভীষ্মদেব একনিবিষ্ট সাধনার দ্বারা তাঁর এই স্বভাবজাত নৈপুণ্যের আরও অনেক বেশী পরিমার্জনা ও উন্নতিবিধান করেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, শিশু বা বালক-প্রতিভা হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের শক্তি ও প্রাণস্ফূর্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কেমন যেন ধীরে ধীরে মিইয়ে আসে। যে কিশোর একদা তার বয়সের পক্ষে অকল্পনীয় নৈপুণ্যের দ্বারা সর্বসাধারণের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সেই কিশোর পরিণত বয়সের সীমায় সমুপনীত হয়ে আর তেমন করে মানুষের মনোহরণ করতে পারছে না —এ-জাতীয় বিমর্ষ দৃষ্টান্ত শিল্পজগতে মোটেই বিরল নয়। বিশেষ, সঙ্গীত-জগতে প্রতিভার এই উত্তরোত্তর ক্ষীয়মাণতার উদাহরণ বহু ও ঘনসন্নিবিষ্ট। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা মাস্টার মদন, মাস্টার মনোহর ভার্বে, মাস্টার বসন্ত, কুমার গন্ধর্ব, চন্দ্রশেখর, শ্যামবিনোদ (ঢাকা) প্রমুখ অশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন বালক শিল্পীর নামোল্লেখ করতে পারি। কিন্তু ভীষ্মদেব এ নিয়মের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের কৃতিত্ব সমধিক প্রকটিত হয়। ভীষ্মদেবের বয়স যখন তেইশ কি চব্বিশ, তার আগেই তিনি তাঁর অসংশয় শিল্পনৈপুণ্যগুণে কলিকাতার রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন দেখতে পাই।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে নগেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। এঁর নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা—সব রকম সঙ্গীতেরই তিনি তালিম পান। পরে তিনি প্রসিদ্ধ সারেঙ্গীবাদক ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং একাদিক্রমে বহু বৎসর এঁর নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। সমসাময়িক কালে নবতিপর বৃদ্ধ ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের নিকট আর যে সকল সঙ্গীতশিল্পী

শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়, ভীষ্মদেবের এককালীন শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, শচীন দাস (মতিলাল), বিভূতি দত্ত প্রভৃতি। বাদল খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা-সমাপনান্তে ভীষ্মদেব কিছুকাল ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের নিকটও সঙ্গীতশিক্ষা করেন।

ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এমন কথা বলা যায় না। তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক চড়া ভাবটি স্বতঃই তাঁর আওয়াজের ভিতর একটা ধাতব তীক্ষ্ণতার আমেজ এনে দিয়েছে। এই তীক্ষ্ণতা মিষ্টত্বের হানিকারক। সচরাচর হারমোনিয়াম যন্ত্রের 'এফ্ শার্প' পর্দায় তিনি সুর বাঁধেন। তাতেই প্রমাণ তাঁর কণ্ঠ তারা সপ্তকে অন্যান্য পুরুষ শিল্পীর তুলনায় দূরগামী। সাধারণ মোটা গলার গাইয়ের যেটি পঞ্চম স্বর, ভীষ্মদেবের সেটি খরজ স্বর; তার অর্থ ঠুংরীর স্কেলে তিনি সচরাচর খেয়াল গেয়ে থাকেন। ভীষ্মদেবের কণ্ঠের এই উচ্চগামিতা স্বতঃই তাঁর গানের সৌন্দর্যকে কিছু পরিমাণে ব্যাহত করেছে। সেই সঙ্গে নারীসুলভ ধাতব তীক্ষ্ণতার আমেজ যুক্ত হয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরকে আরও অনুপযোগী করে তুলেছে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠের উদাত্ত গম্ভীর বোলন্দ্ আওয়াজ ভীষ্মদেবের কণ্ঠে নেই, সেটি সামান্য পরীক্ষাতেই বিচক্ষণ শ্রোতার কানে ধরা পড়বে।

কিন্তু সাধনার বলে কী না হয়! ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ রুক্ষ বটে, তবে অদ্ভুত সুরেলা। দীর্ঘস্থায়ী স্বরসাধন তথা কণ্ঠ পরিমার্জনার দ্বারা তিনি সুরকে অচলপ্রতিষ্ঠ ভাবে তাঁর কণ্ঠে গেঁথে নিয়েছেন। 'অচল-প্রতিষ্ঠ' অর্থাৎ সুর তাঁর গলায় স্থায়িভাবে বসে গেছে, সুরের আর নড়চড় হবার উপায় নাই। এই স্থায়ী সুরভাবের দৌলতে গানের মধ্যে তিনি কী অনবদ্য সুরের জাদুই না সৃষ্টি করেন! সুর যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্ঝর-ধারার মত অবিরাম ঝরে পড়ে। একাধিক আসরে ও অনুষ্ঠানে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান শোনবার আমাদের সুযোগ হয়েছে। তা ছাড়া গ্রামোফোন-রেডিও তো আছেই। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সুর-সৃষ্টির নব নব কৌশল দ্বারা শ্রোতৃসাধারণের চিত্ত বিমুগ্ধ করবার ক্ষমতায় তাঁর সমকক্ষ শিল্পী বাংলায় নেই বললেই চলে। ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণতা বিধানে প্রকৃতির যে কার্পণ্য, সেই কার্পণ্যের পূরাপূরি শোধন হয়েছে

ভীষ্মদেবের সুরসৃষ্টির মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্যের দ্বারা। সুরের তিনি একজন ঐন্দ্রজালিক স্রষ্টা।

এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। সঙ্গীত-অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমরা সহজ মিষ্টত্বের আদর্শ থেকে সুরজ্ঞান তথা সুরসৃষ্টির ক্ষমতাকে সমধিক মূল্য দিই। কণ্ঠের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব খুবই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নেই, তবে মাত্র এই মিষ্টত্বের উপর নির্ভর করে ভারতীয় সঙ্গীতরাজ্যে খুব বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। মিষ্টত্বের চাইতেও যা বেশী পরিমাণে চাই তা হল কণ্ঠের সুরেলা ভাব ও সুরসৃষ্টির ক্ষমতা। এটি না হলে কিছুই কিছু নয়। এই মানদণ্ডে ভীষ্মদেব যে একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর গুণী সঙ্গীতজ্ঞ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না।

ভীষ্মদেবের গানের একটি প্রধান আকর্ষণ তার সর্‌গম্। সর্‌গম্ কর্ণাটী সঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ; দক্ষিণীদের দেখাদেখি আজকাল উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতেও এর বহুল প্রচলন দেখা গেছে। সর্‌গম্-এর কাজে ভীষ্মদেবের শিল্পবোধ ও মৌলিকত্বের তুলনা হয় না। যাঁরাই ভীষ্মদেবের গান শুনেছেন তাঁরাই এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন। সর্‌গম্-এ রাগাশ্রিত স্বরগুলিকে নিয়ে নানারকম 'ফেরতা'র অবতারণা করা হয়। কীর্তনের আখরযোজনার মত এই ফেরতাগুলি যিনি যত অবলীলাক্রমে উদ্ভাবন করতে পারেন এবং তাতে স্বরবিন্যাসের যত বেশী মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারেন, তত তাঁর সর্‌গম্-এর আবেদন। এই দিক দিয়ে ভীষ্মদেবের সর্‌গম্-এর আবেদন অপ্রতিরোধ্য ও গভীর। ভীষ্মদেবের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান—"ফুলবনকি গেঁদন মৈকা" (দেশী টোড়ী), "অব হুঁ লালন মৈকা" (বেহাগ), "পিয়ু পিয়ু রটত পাপৈয়ারা বোলে" (ললিত), "ঢোলন মাঁড়ে ঘরে আমিবে" (ভীমপলশ্রী), "তাঁড়ে সেলাম মৈনে জানাবে" (তিলঙ্), "রুত বসন্ত আপনে" (রাগেশ্রী-বাহার), "কাঁসে কাহু মেরে সজনী দুখুয়ামে" (তিলক-কামোদ), "বরষে মেহারবা বড়ি বড়ি" (গৌড়-মল্লার), "ফুলবালী কান্তা" (বাহার), "পিয়া পরদেশ" (পটদীপ), "মেরে ভামনিয়া" (ধানী), "মুখ মোর মোর মুসকাত যাত" (মালকোষ), "আয়ি বাহার" (বাহার) ইত্যাদি। এ গান সমূহের অধিকাংশতেই তিনি সর্‌গম্-এর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিশেষ, তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডে

গাওয়া গৌড়মল্লার, বেহাগ, ললিত প্রভৃতি রাগের সর্‌গম্‌গুলির তুলনা হয় না।

উপরের প্রায় সব কটি গানই মধ্য লয়ের গান, কতিপয় দ্রুত লয়ের। দ্রুত ও মধ্য লয়ের গানে ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বরের অনায়াসপ্রবহমাণতা তথা তানের স্বচ্ছন্দতা তাক লাগিয়ে দেবার মত জিনিস। হয়ত এ সকল ক্ষিপ্রলয় গানে স্থিরভাবের কিঞ্চিৎ অসদ্ভাব চোখে পড়ে, তবে সুরের গতিবেগের মাদকতার দ্বারা শ্রোতার সে অভাববোধ সাময়িকভাবে আবিষ্ট রাখবার কৌশল তিনি জানেন। তানক্রিয়ায় ভীষ্মদেব অতি দ্রুতসঞ্চরণক্ষম, বিশেষ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের পর 'সাপট্‌' তানে তাঁর অনায়াসদক্ষতা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা গেছে।

সুরবিস্তারেও ভীষ্মদেবের সৃষ্টিপ্রতিভা সবিশেষ মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে। বিশেষতঃ তাঁর ঢিমা চালের গানগুলিতে (যথা, দেবগিরি-বিলাবল্‌, চর্যুকি মল্লার, বারোয়াঁ, সুদ্‌ সারং, মালকোষ প্রভৃতি রাগাশ্রিত গান) এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বারে বারেই আমরা পেয়েছি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের ফলে অতীব সুরযুক্ত। সুরের দিকে যিনি পাকা, তাঁর সুরবিস্তার বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হবে, তা না বললেও চলে।

তবে সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে যে, ভীষ্মদেবের কণ্ঠে ঢিমা লয়ের গান অপেক্ষা দ্রুত ও মধ্য লয়ের গানই বেশী খোলে। এর একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাঁর ধাতব ক্রেঙ্কারযুক্ত কণ্ঠস্বর ঢিমা লয়ের গানের পক্ষে অপ্রশস্ত, পক্ষান্তরে মধ্য বা দ্রুতলয়ের গানের বিশেষ উপযোগী। কণ্ঠে বোলন্দ্‌ আওয়াজের অভাব স্বভাবতঃ গভীর-গম্ভীর ঢিমা গানের সহায়ক নয়, তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, ভীষ্মদেবের তানবিস্তারের পক্ষে ঢিমা লয়ের গান অনুকূল নয়। তাঁর তান খুবই ছোট-ছোট দানাযুক্ত। যেন চুল্লীর উপর গরম কড়ায় মটরদানা ফুটছে। কিছুটা-অস্পষ্ট এই ছোট-ছোট দানাদার তান বিস্তারের পক্ষে দ্রুতলয়ের গানের যেমন উপযোগিতা, ঢিমা লয়ের গানের তেমন নয়; তাই বোধ করি ভীষ্মদেব কতকটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই দ্রুত ও মধ্যলয়ের গানের দিকে বেশী ঝোঁকেন। গানের লয় না বাড়ালে তাঁর তান যেন খুলতে চায় না।

ভীষ্মদেবের আর-এক কৃতিত্ব হল বাংলা গানে অভিনব রঙ-রসের সংযোজন। যাকে বলা হয় রাগপ্রধান বাংলা গান, সেই উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের আমেজযুক্ত বাংলা গানে ভীষ্মদেব একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। বলা যেতে পারে, এই ক্ষেত্রে তিনি একজন নূতন ধারার প্রবর্তকও বটেন। কেন না ইতঃপূর্বে ঠিক এই ধাঁচ ও ধরনের বাংলা গান আর কেউ গেয়েছেন বলে আমরা জানি না। ভীষ্মদেবের কণ্ঠের সব কয়টি বৈশিষ্ট্য তাঁর এই বাংলা গানগুলিতে পরিস্ফুট। নাম করলেই গানগুলি সকলেব চেনা মনে হবে—"ফুলের দিন হল যে অবসান" (জয়জয়ন্তী), "নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো" (ভৈরবী), "তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি" (দেশী-টৌড়ী), "আলোক-লগনে" (রামকেলী), "শেষের গানটি" (ঠুংরী চালের গান) ইত্যাদি।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যের মোটামুটি আলোচনা করা হল। এমন একজন প্রতিভাবান প্রকৃত শক্তিধর গায়কের কণ্ঠ অংশতঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এর চাইতে পরিতাপের বিষয় কিছু হতে পারে না। তবে আমবা আশাবাদী, আশা করতে ছাড়ব না। ইতোমধ্যেই তিনি পুনরায় আসরে আত্মপ্রকাশ কবতে শুরু করেছেন। তবে পূর্বের সজীবতা এখনও ফিরে পাননি। ভীষ্মদেবের এ ম্রিয়মাণতাকে চিরন্তন মনে করবার কোনই কারণ নেই। আবার তাঁর কণ্ঠে জোরালো ভঙ্গিতে গান ফুটবে, তিনি পূর্বেব ন্যায় সুরমুখর হয়ে উঠবেন—এই একান্ত প্রত্যাশা নিয়ে ভীষ্মদেব প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি।

শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী অদ্যকার বাংলা দেশেব একজন প্রথম শ্রেণীর রাগসঙ্গীত শিল্পী। আসরে-অনুষ্ঠানে তাঁব গান শোনেন নি কলকাতা শহরে সঙ্গীতামোদী মহলে এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। শ্রীচক্রবর্তীর দেশ ফরিদ-পুব, তবে যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকে তিনি কলকাতায়ই স্থায়িভাবে বসবাস কবছেন। সঙ্গীতসাধনার গোড়ার দিকে তিনি মুখ্যতঃ তবলাবাদকরূপে পরিচিত ছিলেন। তখন তাঁর নাকুবাবু ডাকনামটিই সবিশেষ চালু ছিল। তিনি প্রথমে সঙ্গীত শিক্ষা করেন অন্ধগায়ক সাতকড়িবাবুর কাছে, তারপর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মধ্যে কিছুকাল তিনি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়েরও সঙ্গ অনুশীলন করেছিলেন বলে জানা যায়।

তারাপদবাবু খেয়াল ও ঠুংরী দুই শ্রেণীর গানই সচরাচর গেয়ে থাকেন, তবে খেয়াল গানেই তাঁর পারদর্শিতা সমধিক। তারাপদবাবুর কণ্ঠস্বর খেয়ালের বিশেষ উপযোগী, সে স্বর খুব সুমিষ্ট না হলেও ভারী ও গোল আওয়াজযুক্ত। স্বরবিস্তার এবং তানক্রিয়া খেয়াল গানের এই দুই অঙ্গেই তারাপদবাবুর কণ্ঠের কৃতিত্ব অবিসম্বাদী। তিনি যেমন স্বাভাবিক স্বরবোধের অধিকারী—সেই কারণে স্বরসৃষ্টির সকল প্রকার কৌশল অবগত,—তেমনি তানকর্তবের বেলায়ও তাঁর কণ্ঠের উপযোগিতা প্রকট। জ্ঞান গোঁসাইয়ের মতই তারাপদবাবুর তান দ্রুত অথচ মোটা দানাদার, ভীষ্মদেবের তানের মত অস্পষ্ট-উচ্চারিত নয়। তবে খতিয়ে দেখলে, স্বরবিস্তারেই শিল্পীর স্ফূর্তি সমধিক মনে হয়।

তারাপদবাবুর গ্রহিষ্ণুতার ক্ষমতা অপরিসীম। তাঁর গানে বিশেষ কোন ঘরানার প্রভাব আবিষ্কার করতে গেলে বিফল হতে হবে; একাধিক বিশিষ্ট ঘরানার গায়কীর ছাপ তিনি আপনার গানের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। বিশেষ, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ—এই দুই প্রধান শিল্পীর স্টাইলেরই কিছু কিছু ছাপ তারাপদবাবুর গানের উপর পড়েছে। চেষ্টা করলে আমীর খাঁ সাহেবের গানের প্রভাবও আবিষ্কার করা যেতে পারে। তবে এ সব বিভিন্ন প্রভাব আত্মসাৎকরণের প্রক্রিয়া পল্লবগ্রাহিতার নিদর্শন নয়, এর মধ্যে শিল্পীর স্বীয়করণের ক্ষমতাটিও সবিশেষ পরিস্ফুট। শিল্পীর স্বরসৃষ্টির শক্তি স্বভাবসিদ্ধ, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে উপকরণ আহরণ করে তিনি তাঁর এই স্বাভাবিক শক্তিকে আরও বহুগুণ সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করেছেন এই মাত্র বলা যায়।

তারাপদবাবু রাগপ্রধান বাংলা গানও কিছু কিছু গেয়েছেন। এগুলি অনেকটা জ্ঞান গোঁসাইয়ের গাওয়া হিন্দীভাঙা বাংলা খেয়ালের স্বগোত্র। যথা, "তব চরণতলে দিব জীবন ডালি" (মালকোষ), "চামেলি মেল আঁখি" (ভূপালী-টোড়ী), "খোল খোল মন্দির দ্বার" (মিশ্র তিলঙ্), "ঝরো না ঝরো না ঝরো না আঁখি" (ভৈরবী), "ফাগুনের সমীরণ সনে" (দুর্গা) ইত্যাদি।

ভীষ্মদেবের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মীরা চট্টোপাধ্যায়ের (বন্দ্যোপাধ্যায়) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্যাতিমান গায়ক শচীন দেববর্মণও ভীষ্মদেবের ছাত্র, তবে তিনি রাগপ্রধান বাংলা গানে যেমন কুশলতা প্রদর্শন

করেছেন খেয়াল অঙ্গের গানে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। খেয়ালের সূক্ষ্মবিস্তার বা তালক্রিয়ার পক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বর তাদৃশ উপযোগী নয়। তবে বাংলা গানে তিনি একজন উঁচুদরের শিল্পী। অন্যপক্ষে তারাপদবাবুর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইতোমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গায়কদের মধ্যে উষারঞ্জনের একটি বিশেষ স্থান আছে। এঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, সুরেলা, উপরন্তু বোলন্দ্ আওয়াজযুক্ত। স্বরসৃষ্টির কৃতিত্বে ইনি গুরুরই উপযুক্ত পথানুবর্তী। সাধনা অব্যাহত থাকলে ইনি কালে-দিনে একজন প্রথম শ্রেণীর গায়ক হবেন, এমনতরো ভবিষ্যদ্বাণী স্বচ্ছন্দেই করা চলে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

১

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয়া নাইডুর সে কথাটি এখানে বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যদি জীবনে তাঁর গানগুলি ছাড়া আর কিছু না-ও লিখতেন, তা হলেও শুধুমাত্র ওই গানগুলির জন্যই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা যুগে যুগে কালে কালে কীর্তিত হত। কবি রবীন্দ্রনাথকে জানবার ও বোঝবার পক্ষে তাঁর গানগুলিই যথেষ্ট ; তাঁকে বুঝতে আর কিছুর দরকার করে না।

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। রবীন্দ্রপ্রতিভায় যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তার সবই বিধৃত হয়েছে তাঁর গানে। তাঁর গান পদলালিত্য, ভাবসৌকুমার্য ও সুরমাধুর্যের এক অপূর্ব সমন্বয়। শিল্পসৃষ্টিতে বিভিন্ন উপাদানের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় বড় একটা চোখে পড়ে না।

কবি সঙ্গীতরচনায় এই কুশলতা সহসা অর্জন করেন নি। তাঁকে এজন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। বহু সংস্কার-আরোপিত বাধা নিষেধ, বহু সংশয়ের কুয়াসা কাটিয়ে তবে তিনি স্বধর্মসিদ্ধ সুরের আলোর তীরে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সুর রচনা ও শেষ জীবনের সুর রচনার মধ্যে যোজনব্যাপী পার্থক্য। পার্থক্য শুধু সুরের ভঙ্গিতে নয়, পদবিন্যাস ও ভাবের ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য প্রকট। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনায় এই পার্থক্যের বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

কবির প্রথম জীবনের সঙ্গীত পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তৎকালে ধ্রুপদ গানের সংস্কার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গানে এ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা হত। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখতে পাই,

কবির বাল্য বয়সে তদানীন্তন বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক যদু ভট্ট ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য যাওয়া আসা করতেন। আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞের সেখানে নিয়মিত আনাগোনা ছিল। স্বভাবতঃই এঁদের প্রভাব বালক রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। তিনি এঁদের কারও কারও কাছ থেকে ধ্রুপদাঙ্গ গানের শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের সুরযোজনায় স্পষ্টগ্রাহ্য ভাবে ধ্রুপদের সংস্কার দ্বারা নিজেকে চালিত করেন। কবির তদানীন্তন কালের রচিত গান যেন হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানেরই বারোআনা তর্জমা করা বাংলা রূপ। শুধু ভাষায় যা পার্থক্য; নইলে পংক্তিবিন্যাস, তালপ্রকরণ মোটামুটি এক।

কবির ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি এ কথার প্রমাণ। এই গানগুলিতে ঈশ্বরোপাসনা থেকে শুরু করে সুরভঙ্গি, 'কলি' বা স্তবকবিন্যাস, তালপ্রকরণ সব কিছুই ধ্রুপদের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধ্রুপদ গানের বাণীতে প্রকৃতিবর্ণনা এবং ঈশ্বর-আরাধনা—এ দুটি ভাবের সমধিক প্রাবল্য। তানসেন প্রভৃতি বিখ্যাত মধ্যযুগীয় ধ্রুপদ সঙ্গীতকারদের রচিত অধিকাংশ ধ্রুপদ গান ঈশ্বর-স্তোত্র ছাড়া কিছু নয়। সম্ভবতঃ এইটিও একটি কারণ যার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মোপাসনামূলক গানগুলিতে ধ্রুপদ গানের পদ্ধতি-প্রকরণ ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুসরণ করেছেন। ধ্রুপদ গানে সাধারণতঃ চারটি 'কলি' বা 'তুক' থাকে। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলিও এই চার কলির আশ্রয়ে রচিত। তালেও তেওট, চৌতাল, ঝাঁপতাল, ধামার প্রভৃতি ধ্রুপদাঙ্গ তালেরই প্রাধান্য দেখতে পাই। পদযোজনায় কাব্য-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই কিছু আছে; কবির সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ মানসভঙ্গির ছাপ অতি গোড়াকার রচনার মধ্যেও আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু কবির পরবর্তী অধ্যায়ের রচিত সঙ্গীতগুলিতে যে উচ্চাঙ্গের ভাবব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয় এ গানগুলিতে তার কিছু অভাব চোখে পড়ে। এখানে ধ্রুপদের গতানুগতিক ঈশ্বরভজনার ভাবটিকেই যেন সজ্ঞানে গ্রহণ করা হয়েছে; যদিও এ ঈশ্বর সাকার নন, নিরাকার। এসবের সম্মিলিত ফল হয়েছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গানগুলিতে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় খণ্ডিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে সব যেন কতকটা ফরমুলা-মাফিক গান; তাদের যেন বাঁধাধরা ছকে ফেলে রচনা

করা হয়েছে। অন্তরের যে স্বতঃস্ফূর্ত দুর্নিবার প্রেরণা সৃজনধর্মী প্রতিভার প্রধান লক্ষণ, যে লক্ষণ দিয়ে কাব্যের ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করতে হয়, এই গানগুলিতে তার যেন কিছুটা অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে রাগবিশুদ্ধির দিক দিয়ে এই গানগুলির বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা আছে, সে কথা মোটেই বিস্মৃত হওয়া চলে না।

২

(রবীন্দ্রনাথ সুরযোজনায় ক্রমাগত পরীক্ষা চালাতে চালাতে এই সত্যের সম্মুখীন হলেন যে, বাংলা গানের প্রকৃতি ঠিক মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্যের অনুকূল নয়। তার ঠাট, ঠমক, ঢঙ আলাদা। মার্গসঙ্গীতে, বিশেষ ধ্রুপদে, সুরের যে দৃঢ়সম্বন্ধ, অপরিবর্তনীয়, কঠিন রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা বাংলা গানের স্ব-ভাবের সঙ্গে কেমন যেন খাপ খায় না। বরং বাংলা গানের স্বতঃস্ফূর্ত সুরের বিকাশকে তা প্রতিহত করে। কবি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলা গানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে বাংলা দেশের নিজস্ব সুরের ভাণ্ডার থেকেই তার উপাদান আহরণ করা দরকার। বাংলা দেশের সর্বত্র লোক-সঙ্গীতের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, দেহতত্ত্ব, মালসী, জারি, সারি প্রভৃতি লোকপ্রিয় সুরগুলির সহিত পল্লীঅঞ্চলের প্রাণের নিবিড় যোগ। যাকে আমরা sophisticated বা বিদগ্ধ সঙ্গীত বলি, বাংলা দেশে তা কোন কালেই শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি; বাঙালী মনের সহজ ঝোঁক লোকসঙ্গীতের প্রতি। ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তনের সুর বাঙালীর প্রাণের তারে যত সহজে সাড়া জাগায় এমন আর কিছুতে নয়।) নগরজনবিমোহন উচ্চাঙ্গের কলাকারুসম্মত শাস্ত্রানুমোদিত বিদগ্ধ সঙ্গীত বাঙালীর শ্রুতি ও অনুভূতিকে শুধু ভাসা ভাসা ভাবে ছুঁয়ে যেতে পারে, বাঙালীর প্রাণের গভীরে প্রবেশ করবার কৌশল তার জানা নেই। অর্থাৎ মার্গসঙ্গীতের সংস্কার বাংলা দেশে খুব গভীর নয়; দেশী বা লোকসঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই সুরামোদী বাঙালীর সহজ প্রাণের-স্ফূর্তি অভিব্যক্ত। এ সহজ তত্ত্বটি আমরা অনেক সময় বুঝতে চাই না বলেই তথাকথিত ওস্তাদি গান নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি করি। মাতামাতিটাকে সুরচর্চা না বলে আসুরিক চর্চা বলাই সঙ্গত।

সুরকার রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মনের সহজ সাঙ্গীতিক প্রবণতার চাবিকাঠির যেদিন সন্ধান পেলেন সেদিন থেকে তাঁর গানেরও রূপান্তর ঘটল। রূপান্তরটা বৈপ্লবিক। শুধু যে সুর-রূপেরই আমূল পরিবর্তন ঘটল এমন নয়; নূতন সুর-রূপের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে তাঁর গানের বাণী ও বাণীর অন্তর্নিহিত ভাব-ব্যঞ্জনারও পরিবর্তন ঘটল। সুরযোজনার ক্ষেত্রে তিনি ধ্রুপদাঙ্গ সুরগুলিকে পরিহার করলেন না; কিন্তু অনবদ্য মিশ্রণের প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাদের মধ্যে আনলেন সহজ প্রাণের লীলা, অপূর্ব ছন্দোভঙ্গি। এবং আরও যেটা উল্লেখযোগ্য, প্রচলিত রাগ-রাগিণীগুলির মধ্যে তিনি দরাজ হাতে বাংলার অন্যতম প্রিয় লৌকিক সুর—বাউলের খোঁচ মিশিয়ে দিলেন। বাউল সুরের ঐশ্বর্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ কথা আশা করি সুরনিষ্ঠ কারও অবিদিত নেই।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে বিশেষ করে বাউল সুরটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্য দুটি প্রধান রূপ—ভাটিয়ালি ও কীর্তন*—এদের প্রতি তিনি তেমন আকৃষ্ট হন নি। এর অবশ্য কারণ আছে। ভাটিয়ালি সুর নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে সমধিক প্রচলিত; পশ্চিমবঙ্গে এর প্রচলন সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের ধূসর উষর পল্লীপ্রান্তরের সহিত বাউল সুরের উদাস শূন্যতার ভাবটিই যেন অধিক মেলে। কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই বীরভূম জিলার রুক্ষ-শুষ্ক পল্লীপ্রকৃতির উদাস ভাবের সঙ্গে বাউল সুরের অচ্ছেদ্য যোগ। সুতরাং স্বভাবতঃই কবি বাউল সুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, কবির পক্ষে বাউলকে সুরবিকাশের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার আরও একটি কারণ আছে। ভাটিয়ালি সুর বেদনাকরুণ, কীর্তনের সুর ভক্তি-ভাবাত্মক, আর বাউলের সুর উদাস-গম্ভীর। শেষোক্ত সুরটিই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির সব চাইতে অনুকূল। গীতাঞ্জলির গানে জীবনদেবতার পায়ে কবির আত্মসমর্পণের যে বিনম্র আকূতি, সেই ভাবটিকে পরিস্ফুট করবার পক্ষে

---

* কীর্তন লোকসঙ্গীত কিনা এই নিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে এটি নাগরিক সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। সে যাই হোক, আলোচনার খাতিরে আমরা এখানে কীর্তনকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি, কেন না বিতর্কটি বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর।

বাউলের সুরই সমধিক প্রশস্ত। রবীন্দ্রনাথের গানের যে অতীন্দ্রিয় আবেদন, বাউলের সুরে তারও সঙ্কেত আছে। কীর্তনের গদগদ আবেগাকুলতা কিংবা ভাটিয়ালির অতিমাত্রিক পল্লীগন্ধিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার ঠিক উপযোগী নয়। এই কারণে কবি সুর-প্রয়োগে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালির মধ্যে মধ্যবর্তী-টিকেই সজ্ঞানে নির্বাচন ও গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, তাঁর কোন গানই নির্বিশেষ বাউল গান নয়। সুরের মূল কাঠামোটি তিনি প্রচলিত রাগ-রাগিণীর ভাণ্ডার থেকেই নিয়েছেন —কেবল মাঝে মাঝে তাদের ফাঁকে ফাঁকে বাউলের সুর মিশিয়ে দিয়েছেন। যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর উপর কবির সমধিক পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়ে সেগুলি হল ভৈরবী, বেহাগ, কাফি, ভীমপলশ্রী, মল্লার, ইমন-কল্যাণ, ছায়ানট, কেদারা, বিভাস, সাহানা এবং এই-জাতীয় আরও কয়েকটি বহুলপ্রচলিত রাগ। অর্থাৎ কবি সুরযোজনায় সুপরিচিত রাগ-রাগিণীগুলিকেই তাঁর গানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন; লুপ্ত কিংবা অর্ধলুপ্ত রাগিণীগুলির প্রতি ক্বচিৎ আকৃষ্ট হয়েছেন। যে সমস্ত রাগিণীর নাম উপরে করা হয়েছে তাদের প্রায় সব কটিতেই সুর-রূপের মধ্যে আবেগের উপাদান প্রধান। পক্ষান্তরে, লুপ্ত অর্ধলুপ্ত ও স্বল্পপরিচিত রাগিণীগুলির বাঁধুনিতে আবেগের চাইতে কলাকারু বা আঙ্গিকের প্রভাবটাই বলবৎ। এখানেও সেই একই বাঙালীসুলভ বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার কথা এসে পড়ে। উল্লিখিত রাগিণীগুলির সুর বাঙালীর কানে শুনতে বিশেষ ভাল শোনায় বলেই কবি এই সুরগুলির প্রতি আজীবন মমত্ব প্রদর্শন করেছেন।

যেমন সুরে, তেমনি বাণীতেও এল পেলবতা, লালিত্য, ধ্বনিমাধুর্য। কথা ও কথার ভাবের পুরাতন কঠোরতা গেল অপসৃত হয়ে, এল পদবিন্যাসে লীলায়িত শ্লথ ভঙ্গি, ছন্দে অপরূপ ধ্বনিসুষমা। ভাবের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম মধুর ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ কি সুরে, কি বাণীতে, কি কাব্যভাবের ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিস্ময়কর রূপান্তর সাধিত হল।

কেবল একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পুরাতন সংস্কার আঁকড়ে রইলেন। সেটি ধ্রুপদাঙ্গ স্তবক বিভাগের সংস্কার। ধ্রুপদ গান চারটি 'কলি' বা 'তুক'এ বিভক্ত, এ কথা আগেই বলেছি। কবির নূতন অধ্যায়ের গানগুলিতে আমরা এই কলিচতুষ্টয়ের বিন্যাস অক্ষুণ্ণ দেখতে পাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত সচরাচর

আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারটি কলিতে বিভক্ত; খেয়াল গানের মত মাত্র আস্থায়ী অন্তরায় তার কলেবর সম্পূর্ণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের গানে সঞ্চারী এক অভিনব সৃষ্টি। সঞ্চারীতে তিনি যেন তাঁর প্রাণের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়েছেন। সুরবৈচিত্র্যের জন্যও রবীন্দ্র-গীতির সঞ্চারীগুলি বিখ্যাত এবং গায়কমহলে বিশেষ আদৃত। আস্থায়ীতে গানের শুরু। তাতে কিছুটা বৈচিত্র্য থাকবেই। অন্তরার সুরে বৈচিত্র্য কম। সাধারণতঃ তারার পর্দায় তার বিহার। আর, আভোগ অন্তরারই প্রতিলিপি মাত্র। কিন্তু সঞ্চারীর ঠাট, ঠমক, গতিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে তাঁর গানে সঞ্চারীর সুরকে লীলায়িত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সঞ্চারীর সুর সাধারণতঃ উদারায় অর্থাৎ খাদে বিন্যস্ত। খাদের সুরে কবি অভিনব বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করেছেন। সঙ্গীত-রসিকমাত্রেই রবীন্দ্রগীতির সঞ্চারীর বৈশিষ্ট্যে বিমোহিত হবেন।

৩

কবি গোটা জীবনে অজস্র গান রচনা করেছেন। সর্বসাকুল্যে তাঁর গানের সংখ্যা দুই হাজারের উপর হবে। পরিমাণের প্রাচুর্য তো আছেই, আরও যেটা বিস্ময়কর, এর সবগুলিতে তিনি নিজেই সুরযোজনা করেছেন, সুর-যোজনায় আর কারও সহায়তা গ্রহণ করেন নি। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুর অভিন্ন—একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করার যো নেই। কথা ও সুরের এমন অঙ্গাঙ্গী সমন্বয় বাংলায় আর কারও গানে, কোন গানে, চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনাপ্রসঙ্গে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র কবি হিসাবে বিচার করেন, সুরকার (Composer) হিসাবে দেখেন না, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে সঙ্কুচিত করে দেখেন।

এত অধিক সংখ্যক গানের মধ্য থেকে গান নির্বাচন করা বড় শক্ত। আর নির্বাচন করলেও তা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে কিনা সন্দেহের বিষয়। তবু ইতস্ততঃ এখানে গুটিকয়েক গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে সকল সুর কবির খুব প্রিয় ছিল তার মধ্যে ভৈরবী একটি, সে কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের ভৈরবী গান, যথা, "আলোকের এই ঝর্ণা-ধারায় ধুইয়ে দাও", "আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে", "হে ক্ষণিকের

অতিথি", "বঁধু, কোন্ মায়া লাগলো চোখে", "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী", "সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নেয়ে" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও বিস্তর ভৈরবী গান কিংবা বিস্তর গানের ভিতর ভৈরবী সুরের আমেজ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে।

বাউলভঙ্গিম গানের দৃষ্টান্ত, যথা, "আজি সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে", "আজি কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী", "কবে তুমি আসবে বলে আমি রইবো না বসে", "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে," "কোন আলোতে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো," "সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে", "পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঋতুরঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেগের একটি প্রধান উৎস। ঋতুরূপ, ঋতুর লীলায়ন ও ঋতুর রূপান্তরের ছবি তিনি তাঁর কত গানে ফুটিয়ে তুলেছেন তার আর লেখাজোখা নেই। বিশেষ করে বর্ষা প্রকৃতির রূপায়ণে কবির বাণী ও সুরের আবেগ যেন বাধামুক্ত ঝর্ণাধারার ন্যায় অবারিত হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশের প্রকৃতির দামাল মেয়ে বর্ষাকন্যকার সঙ্গে যেন কবির নিগূঢ় প্রাণের যোগ; কবির মগ্ন চৈতন্যে প্রতিনিয়ত তার অন্তঃসঞ্চারী ক্রীড়া। বর্ষার গানে মল্লার সুরের জুড়ি নেই, কবি যেন মল্লার রাগিণীটিকে দু'হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। আর শুধু মল্লার কেন, করুণ ও বিরহ ভাবাত্মক যত রাগিণী আছে তার অনেকগুলিই তিনি বর্ষার গানে প্রয়োগ করেছেন। যথা, সাহানা, বিভাষ, হাম্বীর, কেদারা, কাফি, কানাড়া, বৃন্দাবনী সারঙ, জয়জয়ন্তী, দেশ প্রভৃতি। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে" (সাহানা), "এপারে মুখর হল কেকা ওই" (কাফি), "এমন দিনে তারে বলা যায়" (দেশ) প্রভৃতি গানের বাণী এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে আসছে। ঋতুরঙ্গ বিষয়ক গান, যথা—

"এসো হে **বৈশাখ**"

"তপের তাপের বাঁধন কাটুক" (গ্রীষ্ম)

"**আষাঢ়** কোথা হতে তুই পেলি সাড়া ?"

"আজ **শ্রাবণের** গগনের গায়"

"আজি **শ্রাবণ** ঘন গহন মোহে"

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে" (শরৎ)
"এসো **শরতের** অমল মহিমা"
"**শরৎ** তোমার উজল আলোর অঞ্জলি"
"এই **শরৎ** আলোর কমল বনে"
"হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে" (হেমন্ত)
"হায় **হেমন্ত** লক্ষ্মী"
"**শীতের** হাওয়ায় লাগলো নাচন"
"এলো যে **শীতের** বেলা"
"ওহে সুন্দর মরি মরি" (বসন্ত)
"এসো এসো **বসন্ত** ধরাতলে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরে যে গানগুলির উল্লেখ করা হল তাদেব স্বতঃই ববীন্দ্রগীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করলে ভুল করা হবে। নিতান্ত ইতস্তত: ভাবে তাদের এখানে নির্বাচন করা হয়েছে। 'ইতস্তত:' কথাটা ব্যবহার করছি আরও এই জন্য যে, নির্বাচনে কোন রীতি অনুসরণ কবা হয় নি; মনের মধ্যে আপনা থেকে যে সব গান ভেসে উঠেছে সেগুলিকেই পর পর বসিয়ে গেছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিন পর্ব

রবীন্দ্রসঙ্গীত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময় বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারের এক অতিশয় বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ দিক। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর কবির সৃষ্টির আবেগ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের প্রারম্ভ কাল হতে জীবন থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা। কবির সৃষ্টিশীলতার এরূপ অশ্রান্ত অবিচ্ছেদ অভিব্যক্তি কাব্য ছাড়া আর কোন শিল্প-শাখাকে আশ্রয় করে ঘটেনি। বস্তুতঃ কবির জীবনে কাব্যসৃষ্টি আর সঙ্গীতসৃষ্টি একই সৃজনী আকুলতার এপিঠ-ওপিঠ ছিল মাত্র। কাব্য আর সঙ্গীত দুয়ে মিলে কবির কাব্য-কল্পনার বৃত্ত সুসম্পূর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্রসৃষ্টিধারায় রবীন্দ্রসঙ্গীত একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে তাব প্রমাণ পাই এ সত্য থেকে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাদ দিলে রবীন্দ্রসৃষ্টির মহিমার অনেকখানি যেন বাদ পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচিত্র সমারোহ বাদ দিয়ে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের কথা ভাবতেই পারি না। রবীন্দ্রসঙ্গীত একাই একটি বিরাট জগৎ—সুরসৃষ্টির জগৎ। এই জগতের সুবিস্তৃত আঙিনায় অযুত রত্নখণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়েই রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ দেওয়া যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কবির লোকোত্তর সৃষ্টিপ্রতিভার এক অমূল্য স্মারক।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচিত্র সৃষ্টিকে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে ভাগ করা যায়। বিশ বছরের কাছাকাছি সময়ে তাঁর সঙ্গীতজীবনের শুরু হয়েছে ধরে নিলে বিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কবির সঙ্গীতজীবন একটি বিশেষ ধরনের আবেশের মধ্যে কেটেছে দেখতে পাই। তার পরের বিশ বছরে কবির সাঙ্গীতিক কল্পনা পূর্বতন প্রবাহের খাত পরিত্যাগ করে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। তার পরের বিশ বছর অর্থাৎ ষাট থেকে আশি বছর কালের মধ্যে যে সমস্ত সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন তার ভিতর কবির সৃষ্টিলীলার এক নূতন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এখানে কবিকে দেখতে পাই সম্পূর্ণ নূতন এক স্রষ্টার ভূমিকায়। কবির সঙ্গীতজীবনের এই তিন সুস্পষ্ট পর্ব

বিভাগের কথা স্মরণ রাখলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্ব আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি হবে বলে মনে করি। প্রথম জীবনের সঙ্গীত রচনায় অর্থাৎ বিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে কবি যে সকল সঙ্গীত রচনা করেছেন তার ভিতর আমরা প্রচলিত সংস্কারেরই আধিপত্য দেখতে পাই। এখানে তিনি চিরাভ্যস্ত শাস্ত্রসঙ্গীতের রীতি নীতি পদ্ধতি-প্রকরণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের কাঠামো ও ঢঙ অনুযায়ী তিনি এই সময়ে বহু ধ্রুপদ গান রচনা করেছেন এবং সে-সব গান তদানীন্তন সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক আদর্শ ধ্রুপদ সঙ্গীতরূপে পরিগৃহীত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ীতে সে সময়ে ধ্রুপদ গানের খুবই চর্চা ছিল। কবির আত্মকথা থেকে জানতে পাই, যদু ভট্ট, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ ধ্রুপদ গায়কেরা সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন এবং তাঁদের প্রভাবে ঠাকুর বাড়ীতে একটি বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। কবি এই সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন। আবেগময় তাঁদের প্রভাব বালকমনের উপর গভীর দাগ কেটেছিল। কবি যে তদানীন্তন প্রথা ও সংস্কার অনুযায়ীই মুখ্যতঃ তখনকার সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তা তাঁর ধ্রুপদ সঙ্গীতগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে। এসব গানে নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্রুপদ গানের প্রচলিত পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন, কোথাও সে সব গানের উপর নিজের মৌলিকতা আরোপ করতে যান নি। মৌলিকতা যদি কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা প্রকাশ পেয়েছে গানের বাণীতে, সুর-ভঙ্গিমায় কদাচ নয়। সুরের ক্ষেত্রে কবি ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য রক্ষা করেছেন। প্রথম জীবনের এই সকল গানের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত গানগুলির উল্লেখ করতে পারি।

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, মরি লো মরি আমায় বাঁশীতে কে ডেকেছে, মনে রয়ে গেল মনের কথা, নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে, আমার পরাণ লয়ে কি খেলা, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্যসুন্দর, আজি বহিছে বসন্ত পবন, অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ, অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি, তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো, ইত্যাদি।

এ সকল গানের অধিকাংশই হল ভক্তিভাবমূলক ধর্মসঙ্গীত। এই গানগুলির বাণীর বিন্যাসের মধ্যে অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতা রয়েছে। সেই দিক থেকে গানগুলিকে অনবদ্য বলা যায় ; সব জড়িয়ে গানের আবেদন শ্রোতার মনকে ভরপূর করে তোলে। কিন্তু যদি নিছক সুরের আবেদন বিচার করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, কবি এখানে প্রবল ও ব্যাপক ভাবেই শাস্ত্রানুগত্য করেছেন। ধ্রুপদ গানের মত এখানে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—এই চার কলি বা 'তুকে'র সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং সুরভঙ্গীর মধ্যেও ধ্রুপদেরই সম্পূর্ণ ছাঁচ গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচিত অগণিত ব্রহ্মসঙ্গীত যে মূলতঃ ধর্মসঙ্গীত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কবিজীবনের এই এক বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি প্রথম জীবনে শাস্ত্রের হাতে-ধরা হয়ে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই তাঁর মধ্যে আমরা শাস্ত্রানুশাসনের শৈথিল্য লক্ষ্য করি। তিনি তাঁর মনোজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রশাসনকে একপাশে সরিয়ে রেখে নিজেই নিজের পথ গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি নূতন সাঙ্গীতিক সংস্কারের জন্মদান করেছেন। এবং তাকে অনুসরণ করে অজস্র নূতন ভঙ্গিমার সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছেন। কবির দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে আমরা এই বাঁধভাঙা শাস্ত্র-না-মানা সৃষ্টির আকৃতির সূচনা লক্ষ্য করি। তাঁর এই গানগুলির ধাঁচ-ধরন বিচার করলে মনে হয়, তিনি যেন পুরাতন প্রচলিত সুররূপে আর তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর সৃষ্টিশীল মন নূতন পথ খুঁজতে বেরিয়েছে। শাস্ত্রসঙ্গীতের অভ্যস্ত কাঠামোর উপর দেশী বা লৌকিক সঙ্গীতের সুরভঙ্গী যোজনা করে নূতন রসসৃষ্টি করা যায় কিনা সে পরীক্ষায় তিনি নিয়োজিত। কবি লিখেছেন, "আমাদের দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রগত ব্যাকরণগত ও অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল কতগুলি সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগ-রাগিণীর ছাঁচ এবং কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে হৃদয় নাই প্রাণ নাই।" এই হৃদয় ও প্রাণের সন্ধানে তিনি সঙ্গীতে নূতন ভঙ্গী ও নূতন রস যোজনার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করলেন এবং কবির এই নবসৃষ্টির আকুলতা থেকে জন্ম নিল দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলি। এই সকল গানের

মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান হল, মোরে ডাকি লয়ে যাও, মন্দিরে মম কে, নিবিড় ঘন আঁধারে, দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, বাংলার মাটি বাংলার জল, কত অজানারে জানাইলে তুমি, তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে, আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান, আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে, বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সৃষ্টি-প্রাচুর্যের দিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই পর্বটি হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে কত যে গান তিনি রচনা করেছেন এবং কত বিভিন্ন ভঙ্গীর গান তার সীমা-সংখ্যা নেই। এই পর্বের গানগুলিতে আমরা দেখতে পাই তিনি প্রচলিত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের কাঠামোটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেও তার মধ্যে বাউল ভাটিয়ালী সুরের আমেজ সৃষ্টি করেছেন। যেমন তাঁর স্বদেশী গান। এই গানগুলিতে বাউল সুরেরই প্রাধান্য। আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন কাটবে, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান, ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা, আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা, প্রভৃতি গানের কাঠামো ধ্রুপদাঙ্গ কিন্তু তাদের সুরের ধাঁচটি বাউলের। বাউল সুরের মধ্যে একটা উদাস-করা শূন্যতার ভাব মিশে আছে। পশ্চিম বাংলার মাঠ ঘাট প্রান্তরের বিশালতা ও ব্যাপ্তির সঙ্গে বাউল সুরের ধাঁচটি বড় সুন্দর খাপ খায়। কবি তাই এই বাউল সুরের ভাবটিকে তাঁর একাধিক গানের ভিতর সঞ্চারিত করেছেন এবং তার ফলে এই পর্বের গানগুলি নূতন সুরৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কবির জাতীয় ভাবোদ্দীপক স্বদেশী গানগুলির বাণীর প্রাণময় আবেদন তো আছেই, সেই সঙ্গে তাদের সুরের আবেদনের গভীরতাও বড় কম নয়। বাংলাদেশের খাঁটী লৌকিক সুর বাউলকে এ সকল গানের ভিতর গ্রহণ করে তিনি স্বদেশী সঙ্গীতকে বাস্তবিকই স্বদেশী সঙ্গীতে পরিণত করেছিলেন। স্বদেশী সঙ্গীত সুরের দিক থেকেও যথার্থ সার্থকনামা।

শুধু যে বাউল সুরভঙ্গিমার দিক দিয়েই কবি এই পর্বের গানগুলিতে অভিনবত্বের অবতারণা করেছিলেন তা নয়, অন্য আরও কয়েক দিক থেকেও

তিনি অভিনবত্বের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদের পাশে পাশে এই সময় হিন্দি খেয়াল ভেঙ্গে কিছু খেয়াল গানও রচনা করেন। যেমন, মন্দিরে মম কে, বিমল আনন্দে জাগ রে, সুখহীন নিশিদিন, আঁখিজল মুছাইলে জননী, আজি কমল মুকুল দল খুলিল ইত্যাদি। এই সময় কবি কিছু নূতন তালের গানও রচনা করেন। যেমন নয় মাত্রা বিশিষ্ট নবতালের গান নিবিড় ঘন আঁধারে, অথবা এগার মাত্রা তালের গান, দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া, অথবা ঝম্পক তালে আমারে যদি জাগালে আজি, ছয় মাত্রা বিশিষ্ট ষষ্ঠীতালে হৃদয় আমার প্রকাশ হল। কীর্তনের ঢঙের গানও তিনি এই সময় রচনা করেন, যথা, কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস, ঐ আসনতলে মাটির 'পরে লুটিয়ে রব, ইত্যাদি। কিছু কিছু ভাটিয়ালী সুরের গানও তিনি এই পর্বে রচনা করেন। যেমন বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা। তোমার খোলা হাওয়ায়। এই সময় তিনি একাধিক উদ্দীপনামূলক গানও রচনা করেন। এমন সুরের গান, যা মনকে চাঙ্গা করে তোলে, মনের ভিতর উল্লাসবোধের সঞ্চার করে। যেমন, আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান, আমরা চাষ করি আনন্দে, সব কাজে হাত লাগাই মোরা, হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে, ঐ বুঝি কালবৈশাখী, আমরা সবাই রাজা আমাদেরি রাজার রাজত্বে, ইত্যাদি।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কোরাস গান বা যৌথ সঙ্গীতের সূত্রপাত হয় এই সময়ে। তাঁর দুইটি বিখ্যাত কোরাস গানের জন্ম এই পর্বে। যথা, জনগণমন অধিনায়ক জয় হে (যা পরে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়েছে), দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী। এ ছাড়া বিচিত্র ধরনের ঋতুসঙ্গীতেরও সৃষ্টি এই পর্বে। যেমন, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, আমার নয়ন ভুলানো এলে, মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, শরতে আজ কোন অতিথি এল আমার প্রাণে, আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, আজি বারি ঝরে ঝর ঝর, শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, আজি দখিন দুয়ার খোলা, আষাঢ় কোথা হতে তুই পেলি ছাড়া, বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর, মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, হিমের রাতের ঐ গগনের দীপ-

গুলি রে, এলো যে শীতের বেলা, প্রখর তপন তাপে, দারুণ অগ্নিবাণে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা একটু সবিস্তারে রবীন্দ্রনাথের গানের উদাহরণের উল্লেখ করেছি তার সৃষ্টির প্রাচুর্য ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য বোঝাবার জন্য। বেশ বুঝতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বন্ধন অতিক্রম করে মুক্তির উল্লাসে মেতে উঠবার পথ খুঁজছেন কিন্তু মুক্তি এখনও তাঁকে পুরোপুরি ধরা দেয় নি। মুক্তি দ্বিবিধ—প্রচলিত সুরের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাল ও ছন্দের বাঁধাবাধির শাসন থেকে মুক্তি। সুরের মিশ্রণের তত্ত্বটিও এই পর্বেই তিনি সার্থকভাবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ একরাগভিত্তিক সঙ্গীতের আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন। বাল্যের প্রভাব বশে তিনি ধ্রুপদ ও খেয়ালের একরাগাশ্রয়ী সাঙ্গীতিক সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়েছেন বরাবর। ধ্রুপদ ও খেয়ালের ঢঙে তাঁর অধিকাংশ গানই একটি মূল রাগ বা রাগিণীকে আশ্রয় করে রচিত। ঠুংরিভঙ্গিম মিশ্রণের তিনি খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বয়সের গানে তো নয়ই, এমন কি মধ্য ও শেষ পর্বের গানের বাঁধুনিতেও তিনি ঠুংরিভঙ্গিম মিশ্রণের পোষকতা করেন নি। কিন্তু এক প্রকার মিশ্রণের প্রয়োগের সূত্রপাত হয় এই মধ্যবর্তী-স্তরের গানের পর্বে। যে মিশ্রণ সূক্ষ্ম, অগোচর, ফল্গুধারার মত মূল সুরের অন্তরালে যার প্রচ্ছন্নলীলা, তেমন মিশ্রণের সার্থক ব্যবহার এই পর্বের গান-গুলিকে একটা বিশেষ স্বাদগন্ধে মণ্ডিত করেছে।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। যেমন, আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে কিংবা সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে। এর ভিতর প্রথম গানটিতে ভীমপলশ্রীর আমেজ অতি সুস্পষ্ট এবং শেষের গানটিতে পরজ বসন্তের আমেজ প্রকট। কিন্তু তা হলেও এই সকল গানের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব অপেক্ষা লৌকিক সুরের ধাঁচটাই প্রবল। মনে হয় যেন দেশী সুরের রীতি অনুযায়ী গান দুটি বাঁধা হয়েছে এবং গানের বাঁধুনিতে মিশ্রণের আশ্রয় লওয়া হয়েছে। যদিও মিশ্রণ যে ঠিক কোথায় ঘটেছে তা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করবার উপায় নেই। এইখানেই হচ্ছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য। কিংবা, আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও গানটির বিচার করা যাক। এই গানটি ভৈরবী সুরের আশ্রয়ে রচিত

অথচ এর ভিতরে লৌকিক সুরের মিশ্রলীলাও অলক্ষ্য নয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের গানগুলিতে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সুরের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরের সূক্ষ্ম মিশ্রণ সম্পন্ন হয়ে গানগুলিকে একটা নূতন রসের জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। এই পর্বে বন্ধনমুক্তি-প্রয়াসের শুরু এবং ওই প্রয়াসের বহুদূর অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু পুরোপুরি বন্ধনমুক্তি তখনও ঘটেছে এ কথা বলা যায় না।

সেই আকাঙ্ক্ষিত বন্ধনমুক্তি ঘটল রবীন্দ্রসঙ্গীতের তৃতীয় পর্বে। এই পর্বের গানে রবীন্দ্রনাথ সকল বন্ধন অতিক্রম করে, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে স্বকীয় সঙ্গীতের উদ্ভাবন করেছিলেন, যা একান্তভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীত নামাঙ্কিত হবার যোগ্য। অর্থাৎ এই পর্বের গানেই সর্বসংস্কারমুক্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জন্ম হল। রবীন্দ্রজীবনের এই এক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যে, সাহিত্যশিল্পের সর্ব বিভাগে তিনি সংস্কার থেকে সংস্কারাতীতে উত্তীর্ণ হবার সাধনা করেছেন। গোড়ায় প্রচলিত সংস্কারের হাতে-ধরা হয়ে জীবন আরম্ভ করেছেন, পরিণামে প্রচলিত সংস্কারের মোহ জীর্ণ বস্ত্রের মত অবহেলায় ত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির জগতে প্রবেশ করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতায় স্থবিরতা আসে, জরাধর্ম প্রকাশ পায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। .বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় তাঁব এই সংস্কারমুক্তি যেরকম সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে এরকম বোধ হয় আর কোন শিল্পেব বিভাগে প্রকাশ পায় নি। শেষ পর্বের রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্ববন্ধনমুক্তিপ্রয়াসের সাফল্যের এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

এই পর্বের গানগুলির ভিতর কিছু বিশিষ্ট গানের নাম করা যেতে পারে। যথা :—শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন, অগ্নিশিখায় এসো এসো, আমি কান পেতে রই (বাউলভঙ্গিম), ফিরে চল মাটির টানে (বাউল), পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে (ঋতুসঙ্গীত), দুই হাতে কালের মন্দিরা রে সদাই বাজে (কীর্তনভঙ্গিম শিশুসঙ্গীত), হে ক্ষণিকের অতিথি (বাউল-মিশ্র ভৈরবী), আমার রাত পোহাল বাদলব্যাকুল সাঁঝে (ঋতুসঙ্গীত), এসো নীপবনে ছায়া বীথি-তলে (প্রেমসঙ্গীত), গগনে গগনে আপনার মনে (ঋতুসঙ্গীত), তপের তাপের বাঁধন কাটুক (ঋতুসঙ্গীত), নৃত্যের তালে তালে (তালফেরেতা যুক্ত অপূর্ব

ছন্দোভঙ্গিমার গান), মধ্য দিনে যবে গান (ঋতুসঙ্গীত), চাঁদের হাসিরবাঁধ ভেঙেছে (বাউলমিশ্রিত কাব্যসঙ্গীত), প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ (উদ্দীপনামূলক গান), তোমার আসন শূন্য আজি (উদ্দীপনামূলক গান), ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল (ঋতুসঙ্গীত), তুমি কি কেবলি ছবি (কবিতা থেকে রূপান্তরিত গান), যখন মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি (ঋতুসঙ্গীত), সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে (প্রেমসঙ্গীত), নীলাঞ্জন ছায়া এবং বেদনা কি ভাষায় রে (মাদ্রাজী সুর), আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা (কবিতা থেকে রূপান্তরিত গান), খরবায়ু বয় বেগে (সারিজাতীয় লোকসঙ্গীত), বাঁধ ভেঙে দাও (উদ্দীপনার গান), মায়াবনবিহারিণী হরিণী (প্রেমসঙ্গীত), ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা (উদ্দীপনার গান), বঁধু কোন্ মায়া লাগল চোখে (মুক্তছন্দের ভৈরবী), বেদন ভরা এ বসন্ত (প্রেমসঙ্গীত), হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে (কবিতা থেকে রূপান্তরিত ঋতুসঙ্গীত), পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে (হাস্যরসাত্মক), নীলনবঘন আঁধার গগনে (কবিতা থেকে রূপান্তরিত ঋতুসঙ্গীত), এসো শ্যামল সুন্দর (গৎভাঙা গান), যে ছিল আমার স্বপনচারিণী (প্রেমসঙ্গীত), আজি কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে (বাউল), ওগো তুমি পঞ্চদশী (অপূর্ব ছন্দের গান), হে নূতন দেখা দিক আর বার (জন্মদিনের গান), সম্মুখে শান্তি পারাবার (ধর্মসঙ্গীত), ইত্যাদি ইত্যাদি।

কতকটা সবিস্তারে উল্লিখিত এই সকল গানের বাঁধুনি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ এ সকল গানে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আনুগত্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। একদিকে যেমন তিনি সুরযোজনায় সম্পূর্ণ স্বকীয়তার অবতারণা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তাল-ছন্দ ও লয় নিয়েও অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নৃত্যের তালে তালে, ওগো তুমি পঞ্চদশী প্রভৃতি গানে তাঁর এই নূতন ছন্দোপ্রয়াসের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করবার চেষ্টাও এই পর্বে শুরু হয়। হাস্যরসাত্মক গানের সূত্রপাতও এই পর্বে। যদিও হাসির গানের সংখ্যা অন্যান্য গানের তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ। নানা উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানাবিধ আনুষ্ঠানিক গানের সূত্রপাতও হয়েছিল এই শেষের পর্বে। যথা, হলকর্ষণের গান, নলকূপ খননের গান ইত্যাদি। এই পর্বের গানগুলিতে ধ্রুপদের বহিরঙ্গ কাঠামোটি শুধু বেঁচে আছে কিন্তু গানের বাণী, সুরভঙ্গী

এবং ছন্দ ও লয় একান্তভাবেই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্টতা মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সুরের মুক্তি খুঁজেছিলেন। সেই প্রার্থিত সুরের মুক্তি তাঁকে ধরা দিয়েছে বিশেষ করে এই অধ্যায়ের গানগুলিতে। পরিণত বয়সের গান-গুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন।" কবিকথিত এই রূপ বলতে কী বোঝায় সেটা একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী স্তরের গানে রূপের চেয়ে ভাবের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এ সকল গানে ভাব খাটো হয়ে রূপ প্রধান ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ কথার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী গানগুলিতে, তা সে ধর্মসঙ্গীতই হোক আর ঋতুসঙ্গীতই হোক, তত্তৎ গানে ধর্ম বা ঋতুর ভাবটাই প্রধান ছিল। উদ্দীপনার গানে উদ্দীপনার উল্লেখটাই বড হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু শেষ অধ্যায়ের গানগুলিতে—ধর্মসঙ্গীতে কিংবা ঋতুসঙ্গীতে কিংবা উদ্দীপনার গানে—ধর্মের ভাবকে ঋতুর ভাবকে এবং উদ্দীপনার উল্লাসকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে গানগুলির সুরভঙ্গিমা, ছন্দোবৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এখানে বাণীর ভূমিকা অপ্রধান হয়ে গেছে। সুর আর ছন্দের ভূমিকাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে ভাবকে ছাড়িয়ে রূপ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া, এই পর্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই পর্বের গানেই বিশেষ করে তিনি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে একাধিক গীতিনাট্য রচনা করেছেন, তবে নৃত্যনাট্যের জন্ম বিশেষ করে এই পর্বে। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বাংলা গানের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বহুকাল পূর্বে বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলা গান ক্রমশ নাট্যসঙ্গীতের দিকে মোড় নেবে। রবীন্দ্রনাথ রচিত নৃত্যনাট্যগুলির দিকে তাকালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। কোরাসসঙ্গীতে নাট্যসঙ্গীতের প্রাথমিক পদক্ষেপ, আর নৃত্যনাট্যে তার পরিণত পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক কল্পনার বেগ ও গতি যে নাট্য-সঙ্গীতের অভিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিল, চলন্তিকা, শ্যামা, শাপমোচন প্রভৃতি

নৃত্যনাট্যের গানগুলির বিচার করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। পূর্ববর্তী স্তরের গানে লিরিক্যাল. সুরের লীলার শ্রেষ্ঠ স্ফূর্তি ঘটেছিল। এর পরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুরলীলার বিকাশের আর কোন অবকাশ ছিল না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ অবধারিতভাবে শেষ পর্যায়ের গানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লিরিক্যাল সুরের আদর্শ একপাশে সরিয়ে রেখে সামূহিক, গোষ্ঠীগত, যৌথ এবং নাটকীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সৃষ্টিশীল মনের পক্ষপাত ন্যস্ত করেছিলেন। যুগের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাল রেখে কবিমন অগ্রসর হয়ে চলেছিল। এ যুগের প্রবহমাণ সুরই হল সামূহিকতার সুর, সমষ্টিবাদের সুর। এক কথায়, গণতান্ত্রিকতার সুর। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবিকল্পনায় বর্তমান যুগের স্পন্দন ধরা দিয়েছিল আর তারই শিল্পরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অজস্র ধারায় উৎসারিত তাঁর শেষ পর্বের গানগুলিতে। বন্ধন থেকে বন্ধনমুক্তিতে উত্তরণের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে তাঁর শিল্পমনের প্রবণতাকেই অনুসরণ করেছেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকেও অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুররচয়িতার ভূমিকা বড় অথবা গায়কের ভূমিকা বড়—এটি একটি বিশেষ বিচারের বিষয়। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুররচয়িতার ভূমিকাটাই প্রধান। কণ্ঠশিল্পীর স্থান সেখানে গৌণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্রষ্টার সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যকে মনে রেখেই তা বুঝতে হবে। গায়কের কৃতিত্ব-অকৃতিত্বের প্রশ্ন তথায় অপ্রধান বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ সুরযোজনার আদর্শ ভারতীয় সঙ্গীত থেকে গ্রহণ করেন নি, ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় সঙ্গীতে সুরকারের (composer) ভূমিকা বড়, সুরপ্রকাশকের (executant) ভূমিকা গৌণ। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সঙ্গীতের এই সংস্কারটিকে বাংলা গানে প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কথা ছিল এই যে, শিল্পী সুরকারের আজ্ঞাবাহী অনুগত জন মাত্র। সুরকার যে ভঙ্গীতে যে ছাঁদে সুর বেঁধে দেবেন, শিল্পী তাকেই অক্ষুণ্নভাবে কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলবেন মাত্র। সুরকারের বাঁধা ছক থেকে কণ্ঠশিল্পীর একতিল এপাশ-ওপাশ হওয়া চলবে না।

কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠশিল্পীর সুরবিকাশের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত। গায়কের খেয়াল-খুশী মাফিক সুর ফোটাবার অধিকার আছে বলেই ভারতীয়

সঙ্গীত স্বরৈশ্বর্যে এত মহীয়ান্। গায়কের স্বরের স্ফূর্তিতে স্বররচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ভারতীয় সঙ্গীতে। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যটিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মান্য করা হয় নি। ফলে সেখানে কণ্ঠশিল্পীর ভূমিকা নিতান্ত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। এবং তদনুপাতে স্বরকারের ভূমিকা অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরকার কৃতিত্বের বারো-আনা স্থান দখল করে আছেন। বাকী চার আনা একক গায়কের মধ্যে নয়, বিভিন্ন গায়কের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত। গায়কের স্বরবিকাশের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই এক অসুবিধা দেখা দিয়েছে যে, তা শিল্পীর কণ্ঠে আবেগ-মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় না, তা প্রায়শ ছকে বাঁধা স্বরের প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়। এতে স্বর আবেগবর্জিত তথা বুদ্ধিপ্রধান হয়ে পড়ে। আত্যন্তিক বাঁধাবাঁধির ফলে স্বরের বিস্তার, স্বরের যদৃচ্ছা বিকাশ ব্যাহত হয় বলে অভিজ্ঞ স্বরসন্ধানীকে তা তৃপ্তি দিতে পারে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অধিকাংশ শ্রোতাই হল বাণীর শ্রোতা ও সহজবোধ্য স্বরের শ্রোতা। তাঁদের প্রত্যাশা ও স্বরগ্রহণক্ষমতা যে মাপের, কণ্ঠশিল্পীদের কৃতিত্বও সেই মাপের। রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরকারের ব্যক্তিত্বের তলায় গায়কের ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে গেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই দিকটি সম্পর্কে সঙ্গীতামোদীদের ভাববার অবকাশ আছে এবং কি করে এই অপূর্ণতার শোধন করা যায় সে বিষয়ে সকলেরই চিন্তা করা কর্তব্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

এই নিবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ কাঠামোটির বিষয়ে কিছু বলতে হয়।

প্রথমে বাণীর অংশ ধরা যাক। (রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রধান সম্পদ তার বাণী। সে বাণীর মাধুর্য, ধ্বনিলালিত্য ও উচ্চ ভাবসমৃদ্ধি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অতুলনীয় করেছে। কিন্তু বাণীসমৃদ্ধিই যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হত তবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সে গানের দাবি এমন অবিসম্বাদী হত কিনা সন্দেহ। গানের বাণী গানের একটি প্রধান অঙ্গ নিশ্চয়, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীত মূলতঃ কাব্যগীতি, এই পর্যায়ের গানে বাণীর মূল্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু গান তো আর স্বরের আবৃত্তি নয় যে শুধুমাত্র কথার দাবি মেটালেই গান হয়ে গেল। তা যদি হত তা হলে স্বরাশ্রিত যে কোন উচ্চ ভাবময় কবিতাই গান হত। সুরের ছিটেফোঁটা মিশিয়ে যে কোন কবিতাকেই ইচ্ছা করলে গানের রাজ্যে চালান করে দেওয়া যেতে পারত। গান যখন স্পষ্টতঃই তা নয় তখন গানের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র সন্ধান করাই যুক্তিযুক্ত।)

তবে কি নিছক সুরের মধ্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণ? (অবশ্যই সুরসমৃদ্ধি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শুদ্ধমাত্র সুরের পরিচয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয় নিঃশেষিত এরূপ ধরে নেওয়া সঙ্গত হবে না। রাগপ্রধান (classico-modern) বর্গীয় এমন অনেক বাংলা গান আছে যাদের সুরসমৃদ্ধি রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুলনায় কোন অংশে খাটো নয়, বরং কোন কোন দিক থেকে সমধিক প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় ধ্রুপদী (classical) সঙ্গীতের মূল বুনিয়াদ হল স্বরমাধুর্য, এবং সে মাধুর্যের অনেকখানিই সুরের বিস্তারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের বিস্তার অনুপস্থিত, পক্ষান্তরে রাগপ্রধান বাংলা গানে সুরের বিস্তার স্বীকৃত ও অনুশীলিত। রাগপ্রধান বাংলা গানের শিল্পীরা জ্ঞানতঃ খেয়াল ঠুংরীর দৃষ্টান্ত থেকে সুরবিস্তারের আদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং তার ফলে তাঁদের গান যথার্থ সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে এ কথা

বলা যায় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বর ধরাবাঁধা, নির্দিষ্ট, আঁটোসাঁটো। গায়কের স্বাধীনতা সেখানে পদে পদে খণ্ডিত, বলা যেতে পারে অস্বীকৃত। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের চোখে সুরের এই অতি-নির্দিষ্টতা ত্রুটিস্বরূপ মনে না হয়ে পারে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরসমৃদ্ধির স্বরূপ তা হলে কী। এখানেই সুরবিশ্লেষণের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শ্রোতার নিকট গান ভাল লাগাটাই যথেষ্ট কিন্তু সমালোচককে আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হতে হয়। তাঁকে সুর বিচার করতে হয়। সুরবিচারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অবধারিত। এই প্রক্রিয়া অনেকের মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক, তবে সমালোচক এ ক্ষেত্রে নিরুপায়। সমালোচকের সাফাই এই যে, তাঁর কাজের ধাঁচ ও ধরন এবং তৎসম্পর্কিত দায়িত্বই তাঁকে বিশ্লেষণধর্মী করেছে; বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সমালোচনা হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, তা প্রায় সব গানে স্পষ্টচিহ্নিত চারটি 'তুক' বা কলিতে বিভক্ত। এই পর্ববিভাগ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের সংস্কার থেকে এসেছে এবং সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এই রীতি শেষ বয়স পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তফাৎ এই যে, ধ্রুপদে সুরের মিশ্রণ অসিদ্ধ, অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুরমিশ্রণ ঘটতে দিয়েছেন; অন্ততঃ কবির যে সকল গান উত্তরজীবনে রচিত তাদের ভিতর সুরের মিশ্রণ ঘটেছে। প্রথম জীবনের গানে সুবমিশ্রণ ঘটাবার অবকাশ ছিল না, কারণ কবি তখন সচেতনভাবে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ ও খেয়ালের—বিশেষ করে ধ্রুপদের —সুরভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অযুত ব্রহ্মসঙ্গীত মুলতঃ ধ্রুপদভঙ্গিম বাংলা গান, এবং ধ্রুপদেরই মত সেগুলি একরাগভিত্তিক, মিশ্রণ-অসহ, দৃঢ়-সংবদ্ধ। সুরের মিশ্রণ তো দূরস্থান, গানের বাঁধুনিতে এতটুকু শৈথিল্যও সেখানে অসিদ্ধ।

এ সকল গানে সজ্ঞানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের বাঁধুনির (structure) রীতি ও সুরভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। সুররূপের ভিতর কোথাও শিথিলতা নেই, সবটাই আগাগোড়া ঋজু-কঠিন, সুসংবদ্ধ, স্পষ্ট-চিহ্নিত। আর এই ঋজু-কাঠিন্য শুধু যে সুররূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে তাই নয়, অজ্ঞাতসারে তা গানের

বাণীকেও প্রভাবিত করেছে। প্রচলিত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করতে গিয়ে বাণীকে অল্পবিস্তর সে গানের স্বরানুসারী করতে হয়েছে, ফলে বাণীর স্বচ্ছন্দতা খণ্ডিত হয়েছে। 'ভাঙা' গান, অর্থাৎ যে গান অন্য গান ভেঙে করা হয়—যেমন রবীন্দ্রনাথের একাধিক ব্রহ্মসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ বাংলা খেয়াল, কাজী নজরুলের লুপ্ত অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর বাংলা রূপান্তরমূলক গান—এ জাতীয় গানে বাণীসমৃদ্ধি অবধারিত নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত। 'ভাঙা' গানের পদ প্রায়শঃ অললিত, ছন্দ অসংস্কৃত, ভাব এলোমেলো। এ রকম হওয়ার কারণ এই যে, এখানে বাণী সুরের একান্তভাবে অনুগত, কাজেই সুরের দ্বারা আচ্ছন্ন। কথা ও সুরের সুসমঞ্জস মিলনে গানের যে পরিপূর্ণতা, তা এই জাতীয় গানে কদাচ লভ্য। এখানে সুর আগে কথা পরে। সুরের প্রয়োজনে এখানে কথা, আর সে সুরও পূর্বজ্ঞাত, পূর্বনির্দিষ্ট, সুতরাং রচনাকর্মের দিক থেকে অল্পবিস্তর মৌলিকত্ববর্জিত।

(রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গান সম্পর্কে মন্তব্যটি কম-বেশী প্রযোজ্য। তবে সে সবের উৎকর্ষের দিকও অনেক আছে এবং সে উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ। প্রথমতঃ, কবির ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলির ভাবগাম্ভীর্য অনস্বীকার্য। বিষয়ের গুরুত্বের জন্যই যে এই গাম্ভীর্য তা নয়, এ ব্যাপারে সুর এবং ছন্দের পোষকতাও কম নয়। এক একটি রাগকে 'বিশুদ্ধ' ভাবে আশ্রয় ও অনুসরণ এবং সে সুরের সঙ্গে উপযুক্ত তান-লয় সহযোগ করে যে গান, সে গানের আর যে ত্রুটিই থাক, গাম্ভীর্যহীনতার ত্রুটি তার উপর কেউ আরোপ করতে পারবে না। কবির প্রথম বয়সের গান সম্পর্কেও সেই কথা। গানগুলির রূপ সংযত, সংহত, গম্ভীর এবং সেই কারণে মনোগ্রাহী। বিশেষতঃ রাগ-সঙ্গীত যাঁরা ভালবাসেন, যাঁদের কান ওইভাবেই তৈরি, তাঁদের নিকট এই মনোগ্রাহিতা প্রকটতর।)

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মসঙ্গীতকে কণ্ঠে যথাযথভাবে রূপ দিতে গেলে কিছু পরিমাণে সাধনা ও পূর্ব-অভ্যাসের প্রয়োজন। রাগসঙ্গীতের মূলসূত্র ও প্রকরণ সম্বন্ধে যে গায়কের ধারণা নেই তাঁর পক্ষে ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা দুরাশা।

এইখানেই কবির উত্তরজীবনের গানের উপর কবির প্রথম জীবনের

গানের জিত। গীতাঞ্জলি, গীতালি, প্রবাহিণীর অন্তর্ভুক্ত গান কণ্ঠে রূপায়িত করবার পক্ষে মোটামুটি মিষ্ট গলাই যথেষ্ট, তার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন অবিসম্বাদী নয়। অবশ্য এ কথার মানে এ নয় যে, কবির উত্তরজীবনের রচিত গানের বেলায় অনুশীলন ও স্বরজ্ঞানের কোন আবশ্যকতা নেই। আবশ্যকতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু গায়কদের মধ্যে সে সম্বন্ধে চেতনার প্রমাণ দেখি না। আজকাল 'সচরাচর যে সকল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাই সেগুলির অধিকাংশ কবির উত্তরজীবনের গান। গায়কমহলে এই সব গানের প্রচার বেশী তার কারণ কণ্ঠসাধনার অভ্যাস এবং স্বরজ্ঞান না থাকলেও এই সকল গান মোটামুটি গাওয়া চলে। মিষ্টি সুরেলা গলাই এই গানগুলির প্রধান নির্ভর। রবীন্দ্রসঙ্গীতকার হিসাবে অধুনা খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন অনেক গায়ককে বাজিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তাঁদের একমাত্র সম্পদ তাঁদের কণ্ঠ, রাগ-রাগিণী বা স্বর সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা সীমাবদ্ধ। যিনি যত বেশী সংখ্যক রবীন্দ্রসঙ্গীত জানেন তিনি তত বড় রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ! ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গান এঁরা সযত্নে পরিহার করে থাকেন, কেন না সেখানে শুধুমাত্র মিষ্ট গলার উপর নির্ভর করলেই হল না, মিষ্ট গলার উপরে আরও কিছু চাই। সেই বাড়তি জিনিস হল—রাগিণীর জ্ঞান, কণ্ঠপরিমার্জনার জ্ঞান। এ জ্ঞান একদিনে হয় না, তার জন্যে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, কবির প্রথম বয়সের গানগুলির ভাব সরল ও সুবোধ্য, শেষ বয়সের গানের মত মিশ্র ভাবের দ্যোতক নয়। তাদের সুর গম্ভীর কিন্তু ভাব অজটিল। এই কারণে সে সব গান সাধারণের পক্ষে সমধিক গ্রহণীয়। এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে লিখেছেন : "তবুও জনসাধারণের কাছে এই অল্প বয়সের গানগুলি ভালো লাগে কেন? বিশেষ করে বলতে পারি যে, আমাদের জীবনে এই সব গানের ভাব ও ভাষা, সুরে মিশে আমাদের মনে যত সহজে ধাক্কা দেয়, তেমন সহজে পরবর্তী জীবনের গানগুলি মনে জায়গা পায় না। তার জন্যে নিজেকে তৈরি করার প্রয়োজন হয়, সেগুলি সংস্কৃতিমান মনের খোরাক।…প্রথম বয়সের গানগুলি মানুষের জীবনের সাধারণ পরিবেষ্টন ও চিন্তার সঙ্গে এত সহজে খাপ খেয়ে যায় যে তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে কোন কষ্টই হয় না। কিন্তু পরবর্তী জীবনের রচনা সে রকমের নয়। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের মধ্যেই সে পূর্ণতা

খোঁজে নি, এ সময়ের গান ব্যক্তিকে ছাপিয়ে আজ আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে জায়গা নিয়েছে।" (পৃ ৫৯-৬০)। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কথা ও সুরের বিতর্ক অনেক দিনের পুরনো বিতর্ক। এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক দলের মত এই যে, গানের অতিরিক্ত বাণীসমৃদ্ধি সুরের প্রতিবন্ধক স্বরূপ, কাজেই গানের কথা যত সাদামাঠা হয় ততই ভাল। এই মানদণ্ডের বিচারে, উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের স্বপক্ষে অনেক কিছু বলবার আছে তা না বললেও চলে।

কিন্তু এটি হল গানের ভাবের বিচার। আপাতত সুরবিচার আমাদের লক্ষ্য, সুতরাং পুনরায় সেই দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

(কবির প্রথম বয়সের গানগুলির সুরযোজনা যদিও মূলতঃ ঐতিহ্যানুসারী ও অনুকরণাত্মক, সেখানেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যেতে পারে। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কবির উত্তর জীবনের গান বাংলা গানের ক্ষেত্রে সত্যিকার বিপ্লবের সূচনাকারী হয়েছে তার বীজ ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতেও ছিল, যদিও কিঞ্চিৎ পরোক্ষভাবে। এ বৈশিষ্ট্য সুরের বৈশিষ্ট্য নয়, ছন্দের বৈশিষ্ট্য নয়, এমন কি কথার বৈশিষ্ট্যও নয়; এ বৈশিষ্ট্য এই ত্রিবিধ উপকরণের সমন্বয়ে রচিত এক অখণ্ড অথচ পৃথক্ রূপবৈশিষ্ট্য। তাতে আলাদা আলাদা উপকরণের গুণ মিশে আছে কিন্তু সব জড়িয়ে যেটা হয়ে উঠেছে তা বিচ্ছিন্ন গুণগুলির বহির্বর্তী এক নূতন রূপ। কী বা কেমন সে রূপ তা দু-চার কথায় বুঝিয়ে বলা শক্ত, আদৌ বোঝানো যায় কি না তাতেও সন্দেহ আছে, তবে দু-একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সেই অনির্বচনীয়তার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেও দেওয়া যেতে পারে।

(যেমন কবির "মন্দিরে মম কে আসিলে হে" বা "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" গান দুটি। এই দুইটি প্রথম বয়সের গান এবং দুটিই হিন্দী গান ভেঙে করা। শুধু যে হিন্দী গানের সুরভঙ্গিই এ গান দুটিতে গ্রহণ করা হয়েছে তাই নয়, কথার ভাব এবং ধ্বনিও হিন্দী গান থেকে সচেতন ভাবে নেওয়া হয়েছে। তাই বলে গান দুটিকে নিছক অনুকরণ মনে করলে ভুল করা হবে। অনুকরণ হয়েও তারা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রপ্রতিভার অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছাপ তাদের উপর গিয়ে পড়েছে, তার ফলে তারা সৃষ্টিশীলতার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। "বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" বললেই যেন মনের

ভিতরটা কেমন করে ওঠে ; তার উপর যখন তাতে সুরসংযোগ করে গাওয়া হয় তখন সুর আর কথার সম্মিলিত জাদুপ্রভাবে অতি বড় অনাধ্যাত্মিক মানুষের পক্ষেও রসাবিষ্ট হওয়া এমন কিছু আশ্চর্য নয়। এই যে রসাবেশ, এটা শুদ্ধমাত্র কথার জন্য ঘটে না, শুদ্ধমাত্র সুরের জন্যও ঘটে না ; সুর ও কথার মিলিত অথচ দুয়ের অতিরিক্ত এক অব্যক্ত তৃতীয় গুণের জন্য ঘটে। সেই তৃতীয় গুণ হল রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের দ্বারা যখন যা কিছু স্পৃষ্ট হয়েছে তাই অনবদ্য মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতের ভিতর এই মহিমার ছাপ সুগভীর হয়ত নয়, তা বলে অস্পষ্টও নয়। এই মহিমাই ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উত্তর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের গভীরচিহ্নাঙ্কিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিণত করেছে।)

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যজীবনের প্রথম পাদ থেকে শুরু করে শেষ পাদ অবধি সুদীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর জীবন সঙ্গীত-রচনাপ্রয়াসের এক অখণ্ড ইতিবৃত্ত। কিন্তু এই অখণ্ডতার মধ্যেও খণ্ডতা আছে। কবির সঙ্গীত-জীবন দুটি স্পষ্টচিহ্নিত অধ্যায়ে বিভক্ত—একরাগ-ভিত্তিক বা অমিশ্র সুর রচনার অধ্যায় ; মিশ্র সুর রচনার অধ্যায়। মিশ্র সুর রচনার অধ্যায় শুরু হয়েছে কবির মধ্য বয়স থেকে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এইটেই কবির জীবনে সত্যিকার সঙ্গীত রচনার অধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে কবিকৃত যে বিশেষ স্বাদগন্ধযুক্ত গানগুলিকে বোঝায় সে-সব এ অধ্যায়েরই রচনা। এই অধ্যায় বিপ্লবী প্রয়াস দ্বারা চিহ্নিত—গতানুগতিকতার বন্ধনমুক্ত নূতন সৃষ্টির তাড়না সেই বিপ্লবের মূলে। নূতন সৃষ্টি রূপ পেল সুরের মিশ্রণে, বাণীর অনবদ্য ভাবসমৃদ্ধি ও ধ্বনিলালিত্যে এবং ছন্দের মুক্তিতে।

কবি এই পর্যায়ের গানে সচেতনভাবে সুরের মিশ্রণ ঘটালেন। যেখানে গানের কাঠামো আগে ছিল একরাগভিত্তিক, সেখানে এক্ষণে একাধিক রাগের সুরের মিশ্রণ চলতে লাগল। কিংবা একাধিক রাগের মিশ্রণও নয়, একই রাগের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি করে দেশী সুরের খোঁচ প্রায়-অলক্ষ্য ভাবে মিশতে লাগল। আবার শুদ্ধমাত্র দেশী সুরের আশ্রয়ে গান রচনার দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব ঘটল না। যেমন কবির বাউল গান, ভাটিয়ালি গান, কীর্তন। এদের মধ্যে বাউল গানের সংখ্যাই বেশী। তাল-প্রকরণের ক্ষেত্রে

কবি ছন্দোবন্ধন মেনেও ছন্দের ধরাবাঁধা পর্ববিভাগ স্বীকার করলেন না। ত্রিতাল ও কার্ফার ৪ মাত্রা এবং একতালা ও দাদরার ৩ মাত্রাকে তিনি নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ লয়ের ভিতর মিশিয়ে দিলেন, তাদের ভিতর সম্-ফাঁকের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করলেন না। অর্থাৎ লয় মানলেন, তালবিভাগ মানলেন না। তালের এক একটি গোটা 'আওর্দা' রক্ষিত হল, কিন্তু তার বিভাজন নয়। এ ছাড়া কবি স্বয়ং কয়েকটি নূতন অসমমাত্রিক তালেরও প্রবর্তন করলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরমিশ্রণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কবি কেবল মাত্র সেই সকল স্বরের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন যে সকল স্বর নিতান্ত সমঠাটভুক্ত না হলেও সমশ্রেণীভুক্ত। অসম প্রকৃতির রাগিণীর মধ্যে মিশ্রণ তিনি কদাচ অনুমোদন করতেন। কাফি, খাম্বাজ, সিন্ধু, ভীমপলশ্রী, বারোয়াঁ—এগুলি সম প্রকৃতির রাগ। অন্যপক্ষে ভৈরোঁ, ভৈরবী, জৌনপুরী, আশাবরী, টোড়ী ইত্যাদি সম প্রকৃতির রাগ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে স্বরমিশ্রণ পরিলক্ষণীয়, তা এই সমপ্রকৃতির রাগের ভিত্তিতে মিশ্রণ; অসম রাগের মিশ্রণ, মিশ্রণের জন্যই মিশ্রণ, আত্যন্তিক মিশ্রণ—এসব কবি কখনও বরদাস্ত করেন নি। কথাটা বিশেষ ভাবে বলছি এজন্য যে, আজকালকার বাংলা গানে যে ধরনের স্বরমিশ্রণ ঘটানো হয় তা এই শেষোক্ত ধরনের মিশ্রণ। এ-জাতীয় মিশ্রণপ্রক্রিয়ায় গান না দিতে পারে গায়ককে স্ফূর্তি, না দিতে পারে শ্রোতাকে আনন্দ। স্বরের একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, প্রায়ই সে ঝোঁক সমপ্রকৃতির এক বা একাধিক রাগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সেই স্বীকৃত গণ্ডিবিভাগ না মেনে কেবলই যদি স্বরকে বিভিন্ন রাগের উপর দিয়ে দৌড় করানো হয় তবে স্বরের অচিরেই হুমড়ি খেয়ে পড়া কেউ রোধ করতে পারে না। আধুনিক বাংলা গানেরও হয়েছে সেই দশা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত বাংলা গানের এই দশমদশা নিরোধে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর বিচ্যুতির দিকও কিছু কিছু আছে। প্রবন্ধের গোড়ায় তার খানিকটা আভাস দেওয়া হয়েছে। এই বিচ্যুতিগুলির খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার। নির্জলা প্রশংসা কিংবা প্রশংসার উচ্ছ্বাস ভক্তিপরায়ণতার নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু, বলাই বাহুল্য, তা

যুক্তিবুদ্ধির দ্যোতক নয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই শ্রদ্ধাপরায়ণতার মূল্য আছে কিন্তু তা ভাবালুতামুক্ত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী আন্দোলন—হাঁ, একে বিপ্লবী আন্দোলনই বলা উচিত এবং সেই ভাবে বিচার করলেই এর যথার্থ বিচার হয়—কিন্তু এই আন্দোলনের প্রায় সবটুকু কৃতিত্ব যিনি এই আন্দোলন প্রবর্তন করে গেছেন তাঁর; আন্দোলনকে যাঁরা ধারণ করে আছেন তাঁদের জন্য কৃতিত্বের ছিটেফোঁটাও পড়ে রইল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কের হাত-পা বাঁধা; তাঁর স্বাধীনতা প্রতি পদে খণ্ডিত। সুরকার রবীন্দ্রনাথ সুরযোজনায় মুখ্যতঃ ইউরোপীয় সংস্কার অনুসরণ করেছেন: ইউরোপীয় ধাঁচে তিনি গানকে পূর্ব থেকেই অপরিবর্তনীয় ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; সেখানে গায়কের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নি। পাছে তাঁর গানের উপর দিয়ে শিল্পীরা স্বেচ্ছাচারের 'স্টীমরোলার' চালায় সেই আশঙ্কায় কবি তাঁর গানের সবটুকু দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করতে চেয়েছেন; গায়কের জন্য এক আনুগত্য পালনের দায়িত্ব ছাড়া বিশেষ কোন দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে নি। এই যেখানে অবস্থা সেখানে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত হতে বাধ্য, কার্যতঃ তা হয়েওছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীরা আনুগত্য পালনের এক-একটি সুপটু যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের দোষ দেওয়া বৃথা, কারণ তাঁদের কাছে শক্তির অনুশীলন দাবি করা হয় নি, দাবি করা হয়েছে নীরন্ধ্র আনুগত্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ন্যাসরক্ষকেরা শিল্পীর স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কায় মূর্ছা যাবার দাখিল, কিন্তু তাঁরা বোধ করি ভুলে গেছেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা একটা মস্ত বড় জিনিস; সেই স্বাধীনতাকে আঘাত করা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণকে আঘাত করারই সমতুল। ভারতীয় সঙ্গীতে গায়ককে বরাবর অগ্রপ্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; গায়ক এবং সুরকারের মর্যাদা কোন সময়েই এদেশে তুল্যমূল্য ছিল না। এ রকম হওয়ার কারণ, ভারতীয় সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য। সুররচনা এখানে একটা উপলক্ষ্যমাত্র, সুরকে কণ্ঠে বা যন্ত্রে লীলায়িত ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলাটাই হল আসল। ভারতীয় সঙ্গীতে সুরকার সুর বেঁধে দিয়েই খালাস; তারপর সেই সুরকে নিয়ে গায়ক কী করবেন না করবেন সেটা একান্তভাবে গায়কের ইচ্ছাশ্রিত। গায়ককে এই বহুলবাঞ্ছিত সুরবিকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বলেই না ভারতীয় সঙ্গীত

সুরৈশ্বর্যে এত সমৃদ্ধ। স্বাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতার অপব্যবহারের আশঙ্কা আছে মানি, তবে সেই নজীরে স্বাধীনতার পাখা কেটে সঙ্গীতবিহঙ্গকে ধূলিশায়ী করার নীতিটাই বা কেমন!

রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয় নি, ফলে শিল্পীর ব্যক্তিত্বকেও স্বীকার করা হয় নি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার কী এক দুর্নিরীক্ষ্য কারণে আজও সমাজের উচ্চ মহলে আবদ্ধ। কবির ইচ্ছা ছিল তাঁর গান একদিন সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ সার্থকতার দিন সেইদিনই সমাগত হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। লক্ষণ দেখে মনে হয় সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনের উদয় হতে এখনও অনেক বিলম্ব। উচ্চমধ্য ও মধ্যবিত্ত মহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিঞ্চিৎ প্রচার হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানেই তা আবদ্ধ হয়ে আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ন্যায় এমন একটি সৌন্দর্যের ও আনন্দের বস্তুকে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের উপভোগের সামগ্রী করে তোলবার আন্তরিক প্রচেষ্টার একান্ত অভাব। এর হেতু কী।

আপাতদৃষ্টিতে হেতুটি দুর্জ্ঞেয় হলেও তা একেবারে অনধিগম্য নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ককে ব্যক্তিত্বশূন্য যন্ত্রমাত্র কণ্ঠে পর্যবসিত করার পিছনে যে মনোভাব ক্রিয়াশীল, একই মনোভাব এই ব্যাপারে অল্পবিস্তর সক্রিয় মনে হয়। কবির তিরোধানের পর রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ঘিরে একটি কায়েমী স্বার্থের চক্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এ রকম অনুমান করবার সঙ্গত কারণ আছে। সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থই তাঁদের স্বার্থের বস্তুকে নিজেদের গণ্ডির মধ্যে সংরক্ষণের প্রয়াসী। পাছে জনসাধারণের 'অশুচি' স্পর্শে সংরক্ষিত বস্তুর কৌলীন্যের অপহ্নব ঘটে এই আশঙ্কায় কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভোগদখলের ব্যাপারে সর্বদাই মৌরসীপাট্টার নীতিতে বিশ্বাসী। বর্তমান ক্ষেত্রেও যে এই অনুচিত নীতি অনুসৃত হচ্ছে না তা কে বলবে?

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক সাহিত্য

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতির সাঙ্গীতিক রুচির পরিশীলন ও বিকাশের দিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ক্রমপ্রসার সুলক্ষণ বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই সুলক্ষণ খাদবিহীন নয়। দেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা যে পরিমাণ বেড়েছে সেই অনুপাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার বহুলতা ঘটছে না। কোন বিষয়ে মানসিক কৌতূহল, আগ্রহ ও উৎসাহ যখন ব্যাপকতা লাভ করে তখন সে বিষয়ের অনুশীলনই শুধু হয় না, গবেষণাও হয়। মানুষ তখন কৌতূহলের বিষয়টিকে মাত্র ব্যবহারিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, তাকে মননের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় এই বাঞ্ছিত জিনিসটি ঘটছে না। অন্ততঃ যে পরিমাণ আশা করা যাচ্ছে সে পরিমাণে ঘটছে না। এখন পর্যন্ত মাত্র গুটি তিনেক বই এই ক্ষেত্রে আমাদের সম্বল। বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুত্ব বিবেচনা করলে এই গ্রন্থসংখ্যাকে কোন-ক্রমেই আশানুরূপ বলা চলে না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, রবীন্দ্র-নাথের সুমহান্ প্রতিভার যথাযথ বিচার অদ্যাবধি আমাদের দেশে হল না। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি ও মনীষী, তদ্‌বিষয়ক সমালোচনা সাহিত্য সেই অনুপাতে দুর্বল; এত বড় একজন কবির বিষয়ে এত নগণ্য আলোচনার নজীর বোধ করি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতে শুধু এই কথাটিরই প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টিশীল প্রতিভার সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত আলোচক-প্রতিভা নেই আমাদের দেশে। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাকারে এবং পত্র-পত্রিকায় যে জাতীয় আলোচনা হয়ে থাকে এবং হচ্ছে, দুচারটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাকে ছেলেখেলা ছাড়া কিছু বলা যায় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অভাব বিশেষ ভাবেই প্রকট বলে মনে হয়। অনুমানের কারণ বলি। আমরা তিনটি গ্রন্থের কথা বলেছি। এই গ্রন্থত্রয় হল: 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' (শান্তিদেব ঘোষ), 'রবীন্দ্রসংগীতের ধারা' (শুভ গুহ-ঠাকুরতা) এবং 'রবীন্দ্রনাথের গান' (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। এর মধ্যে

প্রথম বইটি বাইশ বছর আগে প্রকাশিত হয় এবং পনেরো বছর আগে তার একটি সংস্করণও হয়। এই বইটি এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে প্রাথমিক প্রামাণ্য বই এবং গ্রন্থের উক্ত মর্যাদা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ। বাকী দুটি বই কিছুদিন হল প্রকাশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয়া ৺ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে বিশ্বভারতী পত্রিকায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। কিছুকাল হল বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের উদ্যোগে তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী-সংগম' এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। নামেই পুস্তকের পরিচয়। গ্রন্থকর্ত্রীর মূল বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মার্গ, আধুনিক ও লোক-সঙ্গীত এই ত্রিধারার সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর জ্ঞান গভীর, তিনি একজন বিদুষী লেখিকাও বটে। এঁর সঙ্গীতবিষয়ক সকল লেখাতেই বিশেষজ্ঞোচিত অভিজ্ঞতা ও উদার শিক্ষালব্ধ সংস্কারমুক্ত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এ বইটিও তাঁর ব্যতিক্রম নয়।

বাকী রইলেন শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার রায়। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের 'সুর ও সঙ্গতি' এবং 'কথা ও সুর' সঙ্গীতবিষয়ক দুটি গ্রন্থ। এদের ভিতর প্রথম বইটি সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে বিনিময়ীকৃত পত্রাবলীর সমষ্টি। তাতে সাধারণভাবে সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা আছে, প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা আছে; কিন্তু কোনক্রমেই তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সন্দীপনী বলা যায় না। 'কথা ও সুর' সঙ্গীতবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সেগুলির ভিতর ধারাবাহিক ভাব-সংলগ্নতা নেই। গ্রন্থের ইতস্ততঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং একটি নিবন্ধে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা আছে, কিন্তু তার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমগ্রতার ধারণা করা যায় না। এই দিক দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ এখন পর্যন্ত আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখেছেন, যদিও জানি আমাদের সাহিত্যে তাঁর হাতেই বিষয়টির সব চাইতে বুদ্ধিদীপ্ত বিচার হতে পারত। ধূর্জটিপ্রসাদের কৌতূহল বহুপথসঞ্চারী ও বিচিত্র, তাঁর মননশীলতা সুপরিজ্ঞাত, কিন্তু বাঙালী পাঠকের দুর্ভাগ্য, এই বিচক্ষণ প্রবীণ লেখক আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোন বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে কিছু রচনা করলেন না। বাংলাভাষায় কলম

ধরলেই কেন জানি না অবধারিত ভাবে তাঁর ভিতর বৈঠকী প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, অথচ তাঁর ইংরেজী রচনায় এই লঘুমনস্কতা দেখতে পাই না।

কিংবা, আমি ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতি অবিচার করছি। এমনও হতে পারে, ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সামর্থ্য থাকলেও সেদিকে তাঁর কোন ইচ্ছাই নেই। কথা ও সুর-এর উপক্রমণিকায় তিনি নিজেই কবুল করেছেন, থীসিস লিখবার মত অধ্যাপকসুলভ অবকাশ, ধৈর্য ও অধ্যবসায় তাঁর নেই। এটা বিনয়-ভাষণ সন্দেহ নেই, তবে এতে পেশাদার অধ্যাপক লিখিয়েদের প্রতি পরোক্ষ খোঁচা আছে। যেন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য আর অধ্যবসায় অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার। তা-ই কি? আমাদের তো বরং উল্টো মনে হয়। বক্তব্যের কী মূল্য যদি না তার পিছনে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের সমর্থন থাকে? মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ (Generalization) দূষ্য যদি সেটা অতিমাত্রায় স্বচ্ছন্দ আর দ্রুতনিষ্পন্ন হয়। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় এই অপূর্ণতা প্রকট। আর শুধু সঙ্গীতের কথাই বা বলি কেন, সকল রকম আলোচনাতেই এই তীক্ষ্ণধী লেখক বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা অল্পবিস্তর রসাস্বাদ সৃষ্টির প্রয়াসী। ধূর্জটিপ্রসাদের বীরবলভঙ্গিম লেখা যে অনুপাতে উপভোগ্য সে অনুপাতে অফলপ্রসূ। শ্রমকাতরতার ত্রুটি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা ঢাকা যায় না এ কথাটা চিন্তাপ্রকাশক আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ধূর্জটিপ্রসাদ এক-বিষয়-নিবেশক্ষমতার আংশিক অভাববশতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে কেবল ছাড়াছাড়া কথাই বললেন, গোটা জিনিস তাঁর হাত থেকে বেরোল না।

শ্রীদিলীপকুমার রায় ধূর্জটিপ্রসাদেরই স্বগোত্র। লিখনপদ্ধতির দিক থেকে দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদের ভিতর পার্থক্য সুদুস্তর—একজন আবেগে ফেনোচ্ছল, অপরজন মননপ্রধান; কিন্তু এক জায়গায় দুজনার প্রবল মিল। দুজনই সমান অধীর। আদ্যন্ত-মধ্য-পর্বযুক্ত সুগ্রথিত প্রবন্ধ-সাহিত্য-রচনা তাঁদের কারও কপালে লেখে নি। 'সাঙ্গীতিকী' বইতে এবং অন্যান্য আলোচনায় দিলীপকুমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু আলোচনা-গুলির ভিতর ধারাবাহিক কোন ক্রম নেই বলে তাতে আমাদের মন ভরে না। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে দিলীপকুমারের দৃষ্টি বিচার-সন্ধিৎসু। কোন

কোন ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনা বোধ হয় সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত নয়। ওই সমালোচনার মধ্যে অজ্ঞাতসারে এককালীন দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র বাদবিসম্বাদের ছায়াপাত ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কে অতিরিক্ত ভাবালুতার বশে তিনি প্রায়শঃ অপক্ষপাত মনোভাবকে আচ্ছন্ন হতে দিয়েছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত কি পারিবারিক বিবাদের জের টেনে চলবার ক্ষেত্র? দিলীপকুমারের স্বভাবের বদ্ধমূল অভিমান কোন সময়েই দিলীপকুমারকে সত্যিকার মননশীল লেখকের পর্যায়ে উন্নীত হতে দিল না।

তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মানতে হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচনা করতে গিয়ে দিলীপকুমার অন্যান্য কতিপয় যুক্তির মধ্যে এমন দু' একটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন যাদের ভিতর যথার্থ সারবস্তু আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের স্বাধীনতার আপেক্ষিক অভাবের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য সত্যই অনেকটা সংকুচিত। এ বিষয়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমরা একমত যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের দৃঢ়সংবদ্ধ অপরিবর্তনীয় বাঁধুনি গায়ককে আনুগত্য পালনের অবকাশ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন অবকাশ দেয় না। কবি তাঁর গানগুলির সুর যে ভাবে বেঁধে দিয়ে গেছেন কণ্ঠে ঠিক সেই ভাবে তাদের অনুকরণ করা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীর অন্য বিশেষ কোন করণীয় নেই। এই যেখানে অবস্থা সেখানে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ক্ষুণ্ণ না হয়েই পারে না। হয়েছেও তাই—রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীরা শুদ্ধমাত্র কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন—স্বর-সাধনা, সুরবিস্তার, রাগ-রাগিণীর বোধ এ সবের প্রতি তাঁরা ঝোঁক দেন না। সঙ্গীত বিষয়ে যাঁরা কিছুমাত্র চর্চা করেছেন তাঁদের নিকট, বলাই বাহুল্য, শুদ্ধমাত্র কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের উপর নির্ভর করে গান পরিবেশন করতে যাওয়া কাজের কথা নয়।

দিলীপকুমার রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের যদৃচ্ছা সুরবিস্তারের স্বাধীনতা দিতে চান। সেটা একটু বাড়াবাড়ি। কবির রচিত সুর গায়কের যথেচ্ছ খেয়াল মেটাতে গিয়ে যেমন-তেমন সুরে রূপান্তরিত হবে এটা কোন অবস্থায়ই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এখানে বিষয়টির আলোচনার অবকাশ কম, সে-কারণ প্রসঙ্গ বাড়াব না। তবে একটি কথা বলা দরকার। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের

গানকে রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট স্বরের সীমার মধ্যে অব্যভিচারী ভাবে ধরে রাখতে চান, প্রকারান্তরে তাঁরা ছুৎমার্গী শাস্ত্র-মানা মনের বশ্যতা স্বীকার করে চলেছেন। কবি নিজে চিরটা কাল এই শাস্ত্রমুখী মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন। আজ তাঁর অস্ত্র তাঁর উপরেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। জানি এই জায়গায় এসে সবাই কবির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা পাড়বেন। কবির ইচ্ছা ছিল না তাঁর গান স্বাধীন ভাবে গাওয়া হোক। কিন্তু তারও উত্তর আছে। গায়কের কণ্ঠে রবীন্দ্র-স্বরের সামান্যতম ব্যতিক্রমও গ্রাহ্য নয়—এই যদি কবি নিজেই ঘোষণা করে গিয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে আমরা বলব কবি আত্মখণ্ডন করেছেন। শাস্ত্র-ভাঙার দুর্নিবার তাগিদ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্ম; কবি বারবার বাংলা গানের স্বরসৃষ্টির বেলায় শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। (ধূর্জটিপ্রসাদের নিকট লিখিত পত্রগুচ্ছ 'সুর ও সঙ্গতি' দ্রষ্টব্য।) আর তাঁর নিজের গানের বেলায়ই কিনা গায়কের এক-চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই! সেখানে পান থেকে চুন খসলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! এটা যদি শাস্ত্র-মানা মনোভাবের অত্যাচার না হয় তবে তা যে কী ভাল বোঝা যায় না।

পক্ষান্তরে, দিলীপকুমারের প্রচারিত স্বাধীনতার আতিশয্যেরও আমরা পক্ষপাতী নই। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে স্বাধীনতার মহোল্লাসে মাত্‌লে তার ফল কী ভয়ঙ্কর হতে পারে দিলীপকুমার নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর আখর-সমেত-গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকার মাত্র। বলা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের উপরি-উক্ত পদ্ধতির অনুমোদন করেন নি। করবার কথাও নয়।

মনে হয় অতিরিক্ত বন্ধন আর অতিরিক্ত স্বাধীনতা এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী কোন একটা জায়গায় এসে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর নূতন করে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরস্ফূর্তির জন্য, শ্রোতার সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তিবিধানের জন্য, অপিচ গায়কের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য, এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতর এত বড় একটা সমস্যা নিয়ে প্রথমোক্ত তিনটি বইয়ের লেখক তাঁদের বইতে সামান্যতম আলোচনাও করেন নি। এটাকে আমি গ্রন্থত্রয়ের একটি প্রধান ত্রুটি বলে মনে করি। বিশেষ

করে শান্তিদেব ঘোষ ও শুভ গুহ-ঠাকুরতা উভয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস করেছেন—তাঁদের গ্রন্থে বিষয়টির অবশ্যই স্থান হওয়া উচিত ছিল। তথ্য সমাবেশের দিক থেকে শান্তিদেব ঘোষের বই অদ্যাপি তুলনাহীন, কিন্তু এই তথ্যসমৃদ্ধি যে পরিমাণ কবিসান্নিধ্যজাত সে পরিমাণে সমালোচক-মনোভাব-প্রসূত নয়। শান্তিদেববাবু নিজে সুগায়ক, ছোট বেলা থেকে কবির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এটা তাঁর সুবিধা-অসুবিধা দুইয়েরই কারক হয়েছে। সুবিধা এই জন্যে যে, এর ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। অসুবিধা, তাঁর সমালোচক-ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় নি। সুমহান্ ও প্রবল কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাব-পরিধির মধ্যে বাস করলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনে যা সচরাচর ঘটে থাকে এই ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নি। শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দেখেছেন মূলতঃ অনুরাগী শ্রোতা ও গায়কের দৃষ্টিতে, সঙ্গীতবিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে নয়। যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে চান শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁদের বিশেষ কাজে লাগবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কেউ যদি বইটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ধারণার আভাস পেতে চান তবে তিনি নিরাশ হবেন। কেন না এই বই মূলতঃ তথ্য পরিবেশনের মনোভাব থেকে লেখা, বিশ্লেষণী-বিচারের মনোভাব থেকে নয়। তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে একাধারে আশ্রমিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতকার শান্তিদেব ঘোষের যোগ্যতা অবিসম্বাদী। এই যোগ্যতার সঙ্গে লেখনীর কৃতিত্ব মিলিত হলে কী চমৎকারই না হত! শেষোক্ত কৃতিত্বের জন্য অন্য রকম সাধনার দরকার; সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের জীবনে সেই সাধনার অবকাশ পরিমিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং সেই দিক থেকে শান্তিদেব ঘোষের সম্পর্কে অভিযোগ করার বিশেষ কিছু নেই।

তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সম্পর্কিত গ্রন্থসাহিত্যের অপূর্ণতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের কারণ আছে বই কি। সমালোচনা সাহিত্যে তথ্যভার-অসহ অভিমত-সর্বস্ব (opinionated) লেখা যেমন দূষ্য, তেমনি তথ্যবহুল বক্তব্যবিবর্জিত লেখাও গুরুত্বহীন। শেষোক্ত লেখার মাত্র ততটুকু মূল্য যতটুকু তথ্যের মূল্য, তার

বাইরে প্রত্যাশা করতে গেলেই বিপত্তি। আমরা প্রথম রীতির লেখকের নমুনা হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদের উল্লেখ করেছি; শেষোক্ত রীতির রচনার দৃষ্টান্তস্থল রূপে শান্তিদেব ঘোষের নাম সহজেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। দুই জন রচনারীতির দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। দুইয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিতর সমন্বয় সাধিত হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সাহিত্যের অপূর্ণতা দূর হত।

শ্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতার 'রবীন্দ্র সংগীতের ধারা' গ্রন্থটির ভিতর সমালোচক মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, তবে সে পরিচয় নিতান্তই ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় অবলীলায়িত সঞ্চরণের ফলে, বিচিত্র বিষয়ে অধ্যয়নের ফলে, বিধিবদ্ধ চিন্তা ও কল্পনার অভ্যাসের ফলে, মানুষের মনে যুগপৎ যে রসরসিকতার ও মননশীলতার জন্ম হয় এই গ্রন্থের ভঙ্গি সে জাতের নয়—তবে গ্রন্থটি সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলবার যে, এতে অন্ততঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা সকলের অনুমোদন লাভ করত যদি দেখা যেত লেখক রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাইরেও কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন—শিল্পমনস্ক ব্যক্তিমাত্রের মনে শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে যে ভাবাদর্শ বিদ্যমান থাকে সেই মানদণ্ড তিনি বক্ষ্যমাণ আলোচনার বেলায় প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আলোচনায় তেমন কোন পরিচয়ের ছাপ দেখতে পেলাম না। বরং মনে হল, রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রতিষ্ঠান-বিশেষের সংগঠনকারী ও শিক্ষক হিসাবে গ্রন্থকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন সেইটিই তাঁর বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি। এত স্বল্প পুঁজি নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখতে যাওয়া দুঃসাহস বই কি! লেখকের মনের গড়নটি বিশ্লেষণমুখী, কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা থাকলে বিশ্লেষণ সার্থক করে তোলা যায় স্পষ্টতঃই লেখকের ভিতর তার অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ বলেও মনে হল। লেখকের বিচারে সাঙ্গীতিক জগতে রবীন্দ্রসঙ্গীতই একমাত্র সৎ বস্তু, বাদ বাকী সব অকিঞ্চিৎকর। লেখক হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকে একাধিক বার 'বিজাতীয়' আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। এতে লেখকের ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞানের অভাবই শুধু প্রমাণ হয়, আর কিছুর প্রমাণ হয় না। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকে বিজাতীয় আখ্যা দান করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ায় যথেষ্ট বুকের পাটা

দরকার। কেন না রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের নিকট তাঁর অপরিসীম ঋণের কথা বারবার ঘোষণা করেছেন এবং এই ঋণের প্রভাব বাদ দিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা বড় অংশ মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতর এই রকম জাতীয়-বিজাতীয়ের সীমারেখা অঙ্কনপ্রয়াস সঠিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। সঙ্গীত এক অখণ্ড ঐতিহ্য। তার নানা আঞ্চলিক ভেদ আছে, আছে বিদগ্ধ ও লোকসঙ্গীতের নানা রূপবৈচিত্র্য, কিন্তু সব জড়িয়ে সে এক মহতী ঐকতান লীলা। ভারতীয় সঙ্গীতের এই আবশ্যিক স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতিরেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারণা ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য।

গ্রন্থকার সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে তিনটি সুচিহ্নিত অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। ১৮৮১ সন থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়কাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগ; ১৯০০—১৯২০ সনের অন্তর্বর্তী কুড়ি বৎসর রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যযুগ; এবং ১৯২১ থেকে কবির তিরোধান কাল পর্যন্ত পরবর্তী একুশ বছর রবীন্দ্রসঙ্গীতের শেষ যুগ। এটি হল কালগত বিভাগ। অন্যপক্ষে প্রবণতার দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—সুরধর্মী এবং কাব্যধর্মী। সুরবিন্যাসের আদর্শে যেখানে কাব্যাংশের ব্যবহার, সে সব গান হল মূলতঃ সুরধর্মী; আর যেখানে কাব্যাংশের প্রয়োজনে সুরবিন্যাসের আশ্রয় লওয়া হয়েছে সেগুলি মূলতঃ কাব্যধর্মী সঙ্গীত। এই মানদণ্ডে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গানকে মূলতঃ সুরধর্মী এবং মধ্য ও শেষ বয়সের গানকে মূলতঃ কাব্যধর্মী গান বলেছেন।

গ্রন্থকারের এই শ্রেণীবিভাগ সুসঙ্গত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রন্থকারের রবীন্দ্রসঙ্গীতের জ্ঞান প্রকটিত হয়েছে। তবে গ্রন্থের সর্বত্র তিনি এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারেন নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তৎ-কৃত পর্যায়ভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ১৭টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা, ভানুসিংহের পদাবলী, নূতন তালের গান, লোকসঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত, টপ্পা, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, হাস্যরসাত্মক গান, হিন্দি-ভাঙা ও গৎ-ভাঙা গান, রাগসঙ্গীত, ঋতুসঙ্গীত, শিশুসঙ্গীত, কাব্যসঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীত, উদ্দীপনার গান, বিদেশী সুরের গান, এবং ধ্রুপদ ও ধামার।

কোন্ ভিত্তিতে গ্রন্থকার এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন সেটি ঠিক বোঝা যায় না। শ্রেণীবিভাগ জিনিসটা ভাল, তাতে বোঝাবার সুবিধা হয়, কিন্তু

তার মুশকিল এই যে, তাতে সব কিছুকেই ছকে ফেলবার একটা প্রবণতা দেখা দেয় এবং বিচার্য বিষয়কে অনেক সময় অনাবশ্যক সরল করে তোলা হয়। বর্তমান গ্রন্থটিও এই ক্রটিবিমুক্ত নয়। আর-একটি বিচ্যুতি যা চোখে পড়ল তা হচ্ছে, পর্যায়তালিকাটিকে যত দূর সম্ভব নিঃশেষকর (exhaustive) করতে গিয়ে গ্রন্থকার এমন ভাবে তালিকা সম্প্রসারণ করেছেন যার ফলে জায়গায় জায়গায় এক তালিকা আর অন্য তালিকার মধ্যবর্তী সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাগসঙ্গীত এবং ধ্রুপদ ও ধামার এই দুটি পর্যায় বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। ধ্রুপদ ও ধামার রাগসঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত দুটি শাখা, সুতরাং রাগসঙ্গীত থেকে আলাদা করে তাদের স্বতন্ত্র একটি পর্যায়ের মর্যাদা দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? যদি ধ্রুপদ ও ধামারের স্বতন্ত্র বিচার একান্তই অপরিহার্য ছিল তবে রাগসঙ্গীতের অধীনে একটি উপবিভাগ সৃষ্টির দ্বারাই সে কাজ নিষ্পন্ন হতে পারত, দুটি পরস্পর-নিরপেক্ষ পর্যায় নির্দেশ করে তালগোল পাকানোর প্রয়োজন ছিল না। শিশুসঙ্গীত পর্যায়ে লেখক এমন কয়েকটি গানের নামোল্লেখ করেছেন যেগুলি আদৌ শিশুসঙ্গীত নয়। 'দুই হাতে কালের মন্দিরা রে' শিশুসঙ্গীত এ আমাদের পক্ষে একটা সংবাদ বটে!

তথ্য সমাবেশের দিক থেকে শুভ গুহ-ঠাকুরতা শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে দুই হাতে উপকরণ আহরণ করেছেন। এটা দোষাবহ হত না যদি লেখক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নূতন কোন বক্তব্য উপস্থাপন করতে চেষ্টিত হতেন। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণী ও পর্যায় বিভাগ ছাড়া তিনি আমাদের নূতন কী বক্তব্য শুনিয়েছেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে এক কথাই যদি আমাদের বার বার শুনতে হয় তবে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটবে কী করে?

অতঃপর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রবীন্দ্রনাথের গান'। এটি একটি চটি বই—বৈতানিক-এর রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তিনটি ভাষণ-প্রবন্ধের সংকলন। লিখনভঙ্গির বিচারে, পুস্তিকাটি অন্য দুটি গ্রন্থের তুলনায় নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। তিনটি রচনাই তথ্যপূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে রাগসঙ্গীতের আলোচনার সঙ্গে অন্বিত করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরূপ বোঝাবার প্রয়াস আমাদের বিশেষ ভাল লাগল।

কবির কোন্ গানে কোন্ রাগলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, কোন্ গানে কী রসভাব ফুটে উঠেছে সে সম্বন্ধে এমন প্রত্যয়পূর্ণ রচনা এর আগে চোখে পড়ে নি।

তবে আলোচনায় রাগ-রাগিণীর কাঠামোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা রাগ-রাগিণীর কল্পিত রসরূপের উপরেই বেশী জোর পড়েছে বলে মনে হল।

লেখকের ভাষার ঢৌলটি মধুর, তবে বড় বেশী রবীন্দ্রানুসারী। আলোচনার ভাষা সমালোচকসুলভ বিশ্লেষণীগুণমণ্ডিত হবে এইটেই প্রত্যাশিত, বিশেষ করে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় বামপন্থী রাজনীতি-অর্থনীতি-পড়া সুপণ্ডিত ব্যক্তির কলম থেকে যুক্তিপ্রধান শানিত গদ্যের ভাষাই আমরা আশা করি। আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রত্যাশা সর্বাংশে পূরণ হয়েছে এমন মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার দুই দিক্—তিনি কাব্যরচয়িতা ও সুররচয়িতা। কাব্য আর সঙ্গীত পরস্পরের নিকট-আত্মীয় হলেও একই ব্যক্তির মধ্যে যুগপৎ কাব্যসৃষ্টি ও সুরসৃষ্টির গুণ বিধৃত থাকা খুবই বিরল ঘটনা। কবিতার মধ্যে সুর আছে এ কথা সকলেই জানেন এবং সকল কবিই সেই নজীরে অল্প-বিস্তর সুরবোধযুক্ত এ কথাও অনেকে স্বীকার করবেন ; কিন্তু তাই বলে কবি মাত্রই সুরসৃষ্টির যোগ্যতা সম্পন্ন এ কথা স্বীকার্য নয়। তা যদি হত তো প্রতি কবিই একজন প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন সঙ্গীতকার রূপে পরিচিত হবার গৌরব দাবি করতে পারতেন। কিন্তু দেখা যায় বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের কবিদের মধ্যে সঙ্গীতকার বা সঙ্গীতজ্ঞের সংখ্যা অতিশয় বিরল। সঙ্গীতকার বলতে এখানে সক্রিয় সঙ্গীতকার অথবা সম্ভাব্য সঙ্গীতকার দুইকেই বোঝাচ্ছে। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কয়েকটি গৌরব-জনক ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন—রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম ও দিলীপকুমার রায়।

বাংলার একালীন সমৃদ্ধ কাব্য-সংসারের সমগ্র পরিধির ভিতর মাত্র পাঁচটি কি ছটি নাম! খুব গর্ব করে প্রচার করবার মত তালিকা নয়। এঁদের মধ্যে আবার কান্তকবি, অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমার মূলতঃ সঙ্গীতকার, তারপর কবি। কিংবা বলা চলে, তাঁদের কাব্য তাঁদের সঙ্গীতের সূত্র ধরেই প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। বাকী রইলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও কাজী নজরুল। এঁরাই খাঁটী অর্থে একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ—গীতিকার ও সুরকার। যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের, তেমনি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পসৃষ্টিতেও কাব্য থেকে সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই। এই তিনের ব্যক্তিত্ব সঙ্গীত এবং কাব্য এই দুইকে আশ্রয় করেই যুগপৎ লীলায়িত হয়ে উঠেছে। তাঁদের সঙ্গীতজীবন এবং কাব্যজীবন অচ্ছেদ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল একজন উচ্চস্তরের প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর কাব্যপ্রতিভার যথোচিত সমাদর হয় নি। তার একটা

কারণ এই হতে পারে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি, সুতরাং স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ প্রতিভার দ্বারা কিছু-পরিমাণে আচ্ছাদিত হয়েছেন। কিন্তু সেইটাই বোধ করি একমাত্র কারণ নয়। এর মূলে তৎকালপ্রচলিত কাব্য-সংস্কারেরও কিছু হাত থাকতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ছিল ইহমুখী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার বাস্তব সীমার দ্বারা আবদ্ধ, বস্তুতান্ত্রিক ও সুবোধ্য। ছন্দে তিনি ঘরোয়া ভঙ্গীর পক্ষপাতী। সব কটি বৈশিষ্ট্যই রাবীন্দ্রিক কাব্য-সংস্কারের বিপরীত। বিহারীলাল ও তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে যে কালে রোমান্টিক ভাবপ্রাচুর্যের অস্পষ্টতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নির্বস্তুকতার বিশেষ ভাবেই চাষ চলেছে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে, সেই কালে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্ফটিক-স্বচ্ছ, স্পর্শগ্রাহ্য কবিতা-ফসলের ডালি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে একটু অসুবিধায়ই পড়ে গিয়েছিলেন। অ্যাবস্ট্রাকশান-মুগ্ধ বাংলার তৎকালীন কাব্যরসিকের রুচি দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের আত্যন্তিকী স্পষ্টতা আর ইহমুখিনতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে রবীন্দ্র-কাব্যের কুয়াশাকেই আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরেছিল বলে মনে হয়। দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের আপেক্ষিক অবহেলার জন্য তাঁর কাব্যসৃষ্টি যত-না দায়ী তার চেয়ে অধিক দায়ী তাঁর কালের পরিবেশ। রবীন্দ্রভাবের প্রবল বন্যার মুখে সেই কালে ভিন্ন ভাবের কোন কবির টিকে থাকা বাস্তবিক কঠিন ছিল।

দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের সমাদরও ইদানীংকালে খুবই কমে এসেছে। তার মূলেও রবীন্দ্রনাথ। গত কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা স্বতঃই ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এ রকম হওয়ার কোন কারণ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের গান তার স্বমহিমাতেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পাশে টিকে থাকার যোগ্য। কিন্তু সত্য পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, টিকে নেই। কালেভদ্রে কখনও কোন গায়কের বা গায়িকার মুখে বিস্মৃত দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের কলি শুনতে পাওয়া যায়। আজ অবশ্য হাওয়া একটু বদলেছে। চৈনিক আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লোকের মনে স্বদেশপ্রেমকে চাগিয়ে তোলবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা কবর খুঁড়ে বার করেছি এবং তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিকে পুনর্জীবন দানের একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু এ চেষ্টার পরমায়ু

খুব বেশীদিন বা তার সুফল স্থায়ী হবে বলে আমাদের মনে হয় না। ইমার্জেন্সির তাগিদ জুড়িয়ে যেতেই আবার আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের অনবদ্য স্বদেশী সঙ্গীতগুলিকে বাক্সবন্দী করবার আয়োজন করব এমন ভবিষ্যদ্বাণী করাই বুঝি যুক্তিযুক্ত। তারপর আবার যথারীতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটানা, অন্যনিরপেক্ষ অনুশীলন চলতে থাকবে আমাদের সঙ্গীতামোদী মহলে। ফ্যাশনের অত্যাচার বড়ই সাংঘাতিক অত্যাচার, তার উপর ওই সঙ্গে যদি আভিজাত্য আর সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের অভিমান যুক্ত করতে পারা যায় তবে তো আর কথাই নেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটা ধারণা স্বতঃই যুক্ত হয়ে আছে, তাইতে হয়েছে আরও মুশকিল। এর ফলে অন্যান্য উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের যথাযথ চর্চা হতে পারছে না। যে কতিপয় প্রসিদ্ধ সুরকারের সঙ্গীত এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যতম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সবিশেষ জনপ্রিয়তার তলায় দ্বিজেন্দ্রলালের গান একেবারেই চাপা পড়ে গেছে।

অথচ, যে কথা আগেই বলেছি, এ রকম হওয়ার কোন হেতু ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি আছে, যা অনেকের গানেই নেই। সেই ভিত্তি হল রাগসঙ্গীতের সুস্পষ্ট সংস্কার। দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের গোটা কাঠামোটাই ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মূলতঃ কাব্য-সঙ্গীতগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে তার মধ্যে ক্লাসিকাল ধ্রুপদ-খেয়ালের সংস্কারটাই বলবৎ। ধ্রুপদ বা খেয়ালের মূল কথা হল একরাগভিত্তিকতা, অর্থাৎ একটি মাত্র রাগ বা রাগিণীকে আশ্রয় করে ধ্রুপদ বা খেয়ালের সুরের অবয়ব গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সুর-মিশ্রণের অবকাশ আদৌ নেই। ঠুংরি গানের ভিতর বা আধুনিক বর্গীয় নানা গানের মধ্যে যে ধরনের সুর মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় এবং যার রেওয়াজ আজকাল খুবই চালু হয়েছে যে-কোন প্রকার জনপ্রিয় সঙ্গীত-রচনার মধ্যে, তার প্রভাব দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতে অনুপস্থিত। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সঙ্গীত-জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে একরাগভিত্তিকতার সংস্কার অনুসরণ করে গেছেন। যদি কোথাও কখনও কালেভদ্রে বৈচিত্র্যের রসের প্রয়োজনে একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তা ঘটিয়েছেন সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যে, আজকালকার ধরনে বিষমপ্রকৃতির রাগ-রাগিণীর মধ্যে উদ্বাহ-বন্ধন ঘটিয়ে সেগুলির

প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট রসানুভূতিকে পীড়ন করেন নি। জয়জয়ন্তীর সঙ্গে দেশের অথবা কেদারার সঙ্গে হাম্বিরের মিলন অনুমোদন করেছেন, তাই বলে রাগ-রাগিণীর স্বীকৃত জাত-পাতগুলিকে সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে অশাস্ত্রীয় কোন কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ভিতর ধ্রুপদ-খেয়ালবর্গীয় ক্লাসিকাল গানের সংস্কার ওতপ্রোত হয়ে আছে বললেও চলে।

বলা হবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও ত ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের প্রভাব খুবই বলবৎ। তবে কেন এই নজীরে বিশেষ ভাবে দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতকেই চিহ্নিত করবার চেষ্টা এবং তার উপর উৎকর্ষের শিরোপা আঁটা? এর উত্তরে বলি, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপর ক্লাসিকাল সংস্কারের প্রভাব যেমন প্রবল তেমনি দেশজ সঙ্গীতের প্রভাবও খুবই বলবৎ। আমাদের রবীন্দ্রামোদী গায়ক-গায়িকারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে অংশটিকে গ্রহণ করেছেন তার ভিতর দেশজ সঙ্গীতের ঐতিহ্যটাই মুখ্য। অর্থাৎ আমরা রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের রচিত বাউল-ভাটিয়ালি কীর্তনের সুরের খোঁচযুক্ত মিশ্র সঙ্গীতগুলিকেই গ্রহণ করেছি, ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের স্মারক প্রথম জীবনের অগণিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিকে গ্রহণ করি নি। রবীন্দ্রনাথের বাউলভঙ্গিম মিশ্র সুরের গানগুলিকে আয়ত্ত করা ও গাওয়া সহজ, তার মধ্যে তালের বাঁধাবাঁধি নেই, রাগ-রাগিণীর বাধ্যবাধকতাও অনুপস্থিত। যা সহজ, অনায়াস-অধিগম্য, তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ সহজাত; বিশেষতঃ পরিশ্রম-ভীরু সস্তায় নাম কেনবার লোভে লুব্ধ আধুনিক রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়কদের সম্বন্ধে ত এ কথা বিশেষ ভাবেই খাটে। এঁরা 'সহজিয়া' রসের রসিক, তায় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মূল্য সম্পর্কে অচেতন; কাজেই তাঁদের রুচি ও পছন্দের সবটুকু পক্ষপাত গিয়ে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের সহজ ভঙ্গির সুর-রচনাগুলির উপর; ক্লাসিকাল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একরাগাশ্রয়ী অনবদ্য ব্রহ্মসঙ্গীত-গুলিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই এখনকার রেওয়াজ হয়েছে। গোপেশ্বর-পুত্র বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কত চেষ্টা করছেন রবীন্দ্র-নাথের ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। আমরা যে লীলাবাদী ও সহজিয়াপন্থী, ব্রহ্মসঙ্গীত শিখতে গেলে স্বরসাধন প্রণালী অভ্যাস ও বিধিবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা রাগ-রাগিণীর জ্ঞান আয়ত্ত

করতে হয়, স্বরবিস্তারের কৌশল শিখতে হয়—এত পরিশ্রম কি আমাদের ধাতে সয়! তাই বাউলভঙ্গিম দেশজ গানের জগৎই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদে চলবার জায়গা।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান যে অশেষগুণসম্পন্ন হয়েও আমাদের দেশে তাদৃশ সমাদৃত হল না তার অন্যতর কারণ উপরের বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলালের গান যেহেতু ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই কারণে তা অনুশীলনসাপেক্ষ অর্থাৎ আয়াসসাধ্য। রাগ-রাগিণীর ভালো জ্ঞান ও স্বরবিস্তারের কৌশল জানা না থাকলে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে তেমন জুত করা যায় না। বিশেষতঃ তাঁর সেইসব গানে, যেখানে ধ্রুপদ বা খেয়ালের প্রভাব একান্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য। "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা"—এই গানটি জয়জয়ন্তী রাগে রচিত ধ্রুপদাঙ্গ একটি উৎকৃষ্ট গান। ধ্রুপদ গাওয়ার অভ্যাস না থাকলে এ গানের প্রতি সুবিচার করা কঠিন। পাখোয়াজের সঙ্গে গাওয়ার অভ্যাস ব্যতিরেকে এ গানের তালমানও রপ্ত হবার নয়। অথবা, "সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, হই না কো সুখের ভাগী।" এটি বাগেশ্রীর আশ্রয়ে রচিত ধ্রুপদভঙ্গিম গান। এসব গান যথাযথভাবে গাইতে হলে, বলাই বাহুল্য, রাগ-রাগিণী প্রকরণ যথাযথভাবে আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। এমনকি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত গাইতেও রাগ-রাগিণীর জ্ঞান তথা কণ্ঠের সুমার্জনা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এত হাঙ্গামা এই 'সহজিয়া' সাধনার যুগে কে আর পোয়াতে চায়? যে দুই চারজন নিষ্ঠাবান শিল্পী অনুশীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কঠিনের রাস্তা ধরেন তাঁরা গুণী মহলের স্বীকৃতি পান সত্য কিন্তু ব্যাপক শ্রোতৃমহলে কোনরূপ কলকে পান না। শৈল্পিক আভিজাত্যের অভিমান আঁকড়ে ধরে তাঁদের নিঃসঙ্গতার অবহেলায় ধীরে ধীরে ক্ষয় হওয়াই এ সমাজের বিধি।

মোদ্দা কথা তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত (কবির মধ্য ও পরিণত জীবনের রচিত সঙ্গীতগুলির কথা বলা হচ্ছে) সহজায়ত্তগম্য; দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীত তেমন নয়। শেষোক্ত গান বিশেষভাবেই অনুশীলননির্ভর, সাধনা-সাপেক্ষ আর সেইটেই বোধ করি প্রধান কারণ যার জন্য দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা ক্রমশঃ দেশ থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি একজন

প্রবন্ধকার পত্রান্তরে কিছু আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে ধরছি।—"সাধারণের কাছে তাঁর (দ্বিজেন্দ্রলালের) রচিত গান রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়েও জনপ্রিয় ছিল। তারপর কেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি সঙ্গীতের আসর থেকে হারিয়ে গেল তার কারণ দুর্জ্ঞেয়।" তারপর ফুটনোটে বলছেন, "যদিও দুর্জ্ঞেয় বলছি তবু এর কারণ আছে যা বিশ্লেষণ করে দেখলে খানিক ধরা যায় বলে আমার অনুমান। প্রথমতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বিলাতি ঢংয়ের গানগুলি গাইবার উপযোগী গলা কারও ছিল না।······দ্বিতীয়তঃ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত গাইবার মত কুশলী শিল্পীর অভাব। রবীন্দ্রনাথের বহু গান আছে যা মোটামুটি সাধারণ গায়কেরা গাইতে পারেন, classical সঙ্গীতের কোন চর্চা না করেই। তাল সম্বন্ধে বিশেষ কান না থাকলেও চলে কারণ রবীন্দ্রনাথের গান বেশীর ভাগই ছন্দপ্রধান, (কিছুদিন আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান তালে গাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, এবং আগে তাঁর অনেক গান রেকর্ড পর্যন্ত করা হয়েছে যা তালে গাওয়া হয় নি) ও সুরও সহজ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। তাঁর গান ভাল ভাবে গাইতে হলে প্রয়োজন classical সঙ্গীতে পারদর্শিতা ও তার সঙ্গে সূক্ষ্মরসবোধ, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের গানে রবীন্দ্রনাথের গানের মতই ভাবের সঙ্গে সুরের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে এবং প্রতিটি গান তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।" ("ছন্দ-বিপ্লবী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল," সুকুমার দত্ত, 'বসুধারা' শ্রাবণ ১৩৪০)।

লেখকের এই বিশ্লেষণ যথার্থ বলে আমি মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুইজনেই তাঁদের প্রথম জীবনে তৎকালীন বড় বড় ওস্তাদদের সান্নিধ্যপ্রভাবাৎ ক্লাসিকাল সঙ্গীতের রস আকণ্ঠ পান করেছেন (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যেমন রাগসঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা হত তেমনি কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃদেব দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের গৃহেও ওস্তাদ-পোষণের রীতি ছিল)। তবে দুইয়ের সাঙ্গীতিক রচনার মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে শাস্ত্রসঙ্গীতের আনুগত্য করে পরে সে আনুগত্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সে বন্ধন ছিন্ন করেন নি। তাঁর গানে ক্লাসিকাল সুরের প্রভাব অনুসৃত হয়ে আছে। কি ধ্রুপদভঙ্গিম গান কি কাব্যসঙ্গীত কি দেশাত্মবোধক

কোরাস গান—সর্বত্র তাঁর স্বররচনায় ক্লাসিকাল প্রভাব প্রত্যক্ষ। এইখানে কোরাস গানের কথা বিশেষভাবে বলা যাক।

দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গান আপাতদৃষ্টিতে বিদেশী ভঙ্গিতে রচিত হলেও সেগুলির সুরের কাঠামোয় কিন্তু ভারতীয় রাগ-রাগিণীর প্রভাব সুপ্রকট। তাঁর এই সব গানে স্বরক্ষেপের ভঙ্গীটি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু সুরের ছাঁচ ভারতীয় রাগসঙ্গীত থেকে আহৃত। ইমন-কল্যাণ-কেদারা-হাম্বির-দেশ-ঝিঁঝিট প্রভৃতি সুপরিচিত এবং বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ভারতীয় রাগ-রাগিণীগুলিকেই তিনি এই সব স্বদেশী গানের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন, "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানটি কেদারায় রচিত; "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা" গানটি হল কল্যাণ ঠাটের গান; "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ!" গানে আছে ভূপকল্যাণের আমেজ; "সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির" কোরাসটিতে পাওয়া যায় ইমনের সুস্পষ্ট ছায়া। এই প্রসিদ্ধ যৌথ গানগুলির বহিরঙ্গ রূপটাই যা বিলাতি, এদের অন্তরে আছে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের লীলা।

আরও যেটা লক্ষ্য করবার তা হচ্ছে এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সুরের মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবে বিষয়টিকে এখানে আরও একটু বিস্তার করা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সুরমিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না তার কারণ, দ্বিজেন্দ্রলাল আবাল্য যে সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যে লালিত হয়েছেন তা হল ধ্রুপদ-খেয়ালের ঐতিহ্য আর সঙ্গীতোৎসাহী মাত্রেই জানেন যে, ধ্রুপদ বা খেয়াল গানে সুর-মিশ্রণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। একটি মাত্র রাগ বা রাগিণীকে আশ্রয় করে ধ্রুপদ বা খেয়ালের কাঠামো গড়ে ওঠে, তবে ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়ালের মৌলিক পার্থক্য এই যে, ধ্রুপদে গান আরম্ভ করার আগে রাগালাপের একটি পর্ব আছে খেয়ালে তা নেই, আর গান শুরু হওয়ার পর ধ্রুপদে সুরবিস্তার নিষিদ্ধ কিন্তু খেয়াল গানের ওইটেই প্রাণ আর 'খেয়াল' নামের সার্থকতাও ওই সুরবিস্তারে। কিন্তু এ দুই শ্রেণীরূপের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক, এক বিষয়ে এদের সাদৃশ্য সুপ্রকট। ধ্রুপদ এবং খেয়াল দুই-ই একরাগভিত্তিক অর্থাৎ একটি মাত্র রাগ বা রাগিণীর অবলম্বনে তাদের অবয়ব গঠিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল বরাবর ধ্রুপদ-খেয়ালের এই একরাগভিত্তিকতার সংস্কার অনুসরণ করেছেন তাঁর গানে। ঠুংরির আদর্শের দিকে তিনি ঘেঁষেন নি। (পরবর্তীকালে অতুলপ্রসাদ তাঁর গানগুলিতে ঠুংরির সুরমিশ্রণের আদর্শকেই তাঁর মূল উপজীব্য করেছিলেন।) দ্বিজেন্দ্রলাল লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করেন নি। বাউল-ভাটিয়ালির সংস্কারের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল তাঁর সুররচনায় অন্ততঃ তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দান বিশেষ সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে মিশ্র সুরের লীলায় সাধারণ শ্রোতার শ্রবণমন তৃপ্ত তার একটা বড় ভাগই দেশজ বাউলের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। দ্বিজেন্দ্রলাল বাউল-ভাটিয়ালির প্রতি তেমন অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি। কীর্তনের সুর তিনি নিয়েছেন অবশ্য, তবে কীর্তন তো ক্লাসিকাল সঙ্গীতেরই বঙ্গদেশীয় একটি বিশিষ্ট শ্রেণী-রূপ, তাকে লোক-সঙ্গীতের কোঠায় ফেলা চলে না।

তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৌলীন্যবাদী, বিশুদ্ধবাদী। উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংস্কার মেনে চলায় বিশ্বাসী। মিশ্রণের নামে অসম প্রকৃতির রাগ-রাগিণীর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে অথবা শাস্ত্রীয় সুরের সঙ্গে দেশজ সুরের বিবাহ সম্পাদন করিয়ে তিনি রাগ-রাগিণীর জাত-পাত ঘোচাবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন নি। কাব্যসঙ্গীতে মিশ্রণের অবকাশ অবারিত, বস্তুতঃ বাংলা দেশের প্রচলিত কাব্যসঙ্গীতগুলির অন্যতর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সুরের মিশ্রণ। কিন্তু লক্ষণীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অতি ভাবাবেগসমৃদ্ধ কাব্যসঙ্গীতেও সুরমিশ্রণের দ্বারস্থ হন নি। "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো" দ্বিজেন্দ্রলালের একটি প্রসিদ্ধ কাব্যসঙ্গীত। এটি দেশ ঠাটের গান এবং একান্তভাবেই ওই ঠাটের আশ্রয়ে রচিত। তেমনি, "ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী" গানটি আছে ভূপালী রাগিণীতে। বাংলা দেশের শ্রোতৃসাধারণের কাছে যে সব রাগ-রাগিণী সবিশেষ প্রিয়, যথা ইমন-কল্যাণ, ভূপালী, দেশ, কেদারা, জয়জয়ন্তী, মল্লার, খাম্বাজ ইত্যাদি—এইগুলির প্রতিই দ্বিজেন্দ্রলালের সমধিক পক্ষপাত দেখা যায়। অঞ্চলভেদে যেমন ভাস্কর্য বা স্থাপত্যরীতির ভেদ লক্ষিত হয় তেমনি সঙ্গীতশৈলীরও পার্থক্য ঘটে। সঙ্গীতশৈলীর এই তারতম্যের ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীরও একটা ভূমিকা আছে। এক এক

অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে কতকগুলি রাগ-রাগিণী বিশেষভাবেই খাপ খেয়ে যায় আবার কতক রাগ-রাগিণী ·তেমন মেলে না। উপরে যে সব রাগ-রাগিণীর নাম করা হয়েছে তা এক দুর্জ্ঞেয় কারণবশতঃ বাংলা দেশের প্রকৃতির বিশেষ অনুকূল। আর আশ্চর্যের কথা, আমাদের সব প্রথম শ্রেণীর সুরকারই এই তত্ত্বটি বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাই দেখতে পাই দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ সকলের সুররচনার মধ্যেই উল্লিখিত রাগ-রাগিণীগুলির আধিক্য সবচেয়ে প্রকট, অন্যান্য বর্ণের রাগ-রাগিণীর ব্যবহার তুলনায় অনেক কম। বিভিন্ন সুরকারের মধ্যে রাগ-রাগিণী নির্বাচনে এই সাদৃশ্য নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নয়। বাংলার জলহাওয়ার বিশেষ দাবি পূরণের সূত্রেই এই সৌসাদৃশ্যের উদ্ভব হয়েছে।

আজকাল অবশ্য নতুন যুগের চাহিদা অনুযায়ী মারু-বেহাগ, শঙ্করাভরণ, সিংহেন্দ্রমধ্যমা, শিবরঞ্জনী, আভোগী কানাড়া, চর্যুকি মল্লার প্রভৃতি প্রায়-অপ্রচলিত রাগ-রাগিণীর চলন হয়েছে গায়ক ও যন্ত্রীদের মধ্যে। রাগ-রাগিণীর বেলাতেও দেখা যাচ্ছে নতুন বা অপরিচিতেরই সমধিক কদর। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নতুনের দ্বারা শ্রোতার অন্তরে চমকের সৃষ্টি করা—অস্বাদিতপূর্বের দ্বারা নূতন স্বাদের অবতারণা। কিন্তু বাংলার সাঙ্গীতিক মেজাজের সঙ্গে এ সব রাগ-রাগিণীর সাযুজ্য বোধ হয় গভীর নয়। একখানি ইমন-কল্যাণ বা বাগেশ্রীর গানে যে রসের সৃষ্টি হয়, তার সিকির সিকি রসও কি সৃষ্টি হয়, ধরা যাক, শিবরঞ্জনী কি সিংহেন্দ্রমধ্যমার গানে? আমাদের প্রসিদ্ধ সুরকারেরা রাগ-রাগিণীর রসের তারতম্যের এই তত্ত্বটি জানতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লাসিকাল সঙ্গীতের জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি বাছাই করা রাগ-রাগিণীরই সবিশেষ পোষকতা করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিশেষ প্রয়োজন মনে রেখেই তা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতে বিশুদ্ধবাদী ছিলেন, তা বলে এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে যে, তিনি গানে নিজস্ব সৃজনীপ্রতিভার তাগিদ অনুযায়ী রঙ রস যোজনায় বিমুখ ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বা খেয়াল ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছেন বটে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রসঙ্গীতের উপর দাগা বুলাবার জন্য তা করেন নি। হিন্দী গানের কপিবুক-মার্কা নকল তৈরি

করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয় নি। আমাদের ভুললে চলবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলাল একজন উচ্চস্তরের শক্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন। কবিতায় তিনি নব নব বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সে বৈচিত্র্য স্থষ্টির জন্য সচেষ্টও ছিলেন। ছন্দে ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তাঁর অভিনবত্ব-প্রয়াসের অন্ত ছিল না। তাঁর এই অভিনবত্বপ্রয়াস ইদানীং কারও কারও চোখে রীতিমত বৈপ্লবিক বলে প্রতিভাত হচ্ছে। বাংলায় কোরাস গানের তিনি স্রষ্টা, হাসির গানেরও একজন প্রধান প্রবর্তক। এমন যে নব স্থজনের গভীর আবেগযুক্ত কবি, তিনি কি কখনও কাব্যেই হোক আর স্থরেই হোক নিছক যান্ত্রিক স্থষ্টিতে তৃপ্ত থাকতে পারেন? না, তাঁর স্থষ্টি যান্ত্রিক স্থষ্টি হয়ে ওঠা সম্ভব? দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট শিল্পী-প্রকৃতি অনুযায়ী, তাঁর হিন্দুস্থানী খেয়াল-ভাঙা বাংলা খেয়াল গানই হোক আর রাগাশ্রয়ী কাব্যসঙ্গীতই হোক তাদের মধ্যে তাঁর স্থষ্টি-প্রতিভার স্বাক্ষর অতি-স্পষ্ট। তাঁর গানে মেলডির অর্থাৎ স্থরের সম্পদ্ খুব বেশী। এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়েও বুঝি তাঁর গানের স্থরৈশ্বর্য বেশী।

এর একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লাসিকাল সঙ্গীতের জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গভীরতর ছিল, নিজে তিনি রাগসঙ্গীতের একজন উৎকৃষ্ট গাইয়ে ছিলেন বলে শুনেছি; আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, শেষ বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত গানের স্থরকে dilute করে করে প্রায়-আবৃত্তির কাছাকাছি এনে ফেলেন নি গানকে দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর মজ্জাগত ক্লাসিকাল সংস্কার তাঁকে তাঁর গানকে সেই পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়ার অপঘাত থেকে রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিকাল সঙ্গীতের জ্ঞান সম্পর্কে যে কিংবদন্তী দেশের ভিতরে প্রচলিত আছে তা বোধ করি পুরাপুরি সত্য নয়। তিনি ক্লাসিকাল সঙ্গীতের আবহাওয়ায় আবাল্য লালিত হয়েছেন সত্য কথা, কিন্তু নিজে ভাল ক্লাসিকাল গান জানতেন বা তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন এমন অনুমানের পক্ষে কোন স্থদৃঢ় প্রমাণ নেই। প্রথম বয়সের ব্রহ্মসঙ্গীতের অধ্যায়ে তাঁর গানে রাগ-চেতনার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই চেতনার সংস্কার থেকে পরে তিনি স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছিলেন। এতে সাধারণ শ্রোতার লাভ হলেও বিচক্ষণ শ্রোতাদের তেমন লাভ হয় নি। রাগের স্বাদ থেকে

তিনি তাঁদের বঞ্চিত করেছেন। যাঁরা তাঁর রাগসঙ্গীতের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন কবিগুরু অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধে খুবই রোষ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু তা হলেও তাঁর অধিকাংশ গানের অতিরিক্ত সাদামাঠা সুরভঙ্গি থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারা যায় না যে, রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ খুব দৃঢ়মূল ছিল না। তা যদি থাকত তো সুরকে সরল করবার নামে গানকে প্রায়-সুররিক্ত করবার কিনারায় এনে ফেলতেন না। গানকে সর্বসাধারণের গ্রাহ্য করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সুরকে বা তালের স্বীকৃত প্রকরণকে বিদায় দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কবির মধ্য বা শেষ বয়সের গানগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবেব এক-একটা ভঙ্গি আছে কিন্তু সুর নেই। সুরের কোন সুস্থির আমেজ সেগুলিতে পাওয়া যায় না। যাকে তিনি সুরের মুক্তি বলেছেন আসলে তা সুরের পাখির গানের খাঁচা ছেড়ে পালানো। তার উপর, রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীরা সুরবিস্তার সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ বা তার প্রয়োজন সম্বন্ধে অচেতন। সুরকারের এ বিষয়ে আপেক্ষিক ঔদাসীন্যের জন্যই এ রকমটা হতে পেরেছে বলে সন্দেহ হয়। ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধরনে গানের সুররূপের অতিবিক্ত বাঁধাবাঁধি ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের স্বাধীন সুরসৃষ্টির পাখা দুটি একেবারেই কেটে ফেলেছেন। শিল্পীদের নড়বার-চডবার ক্ষমতাই মোটে নেই তো সুরসৃষ্টি হবে কেমন করে, মেলডি আসবে কোত্থেকে? রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য কিন্তু গায়কের স্বাধীনতার সেই পরিমাণেই হানি হয়েছে।

এই দিক্ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুস্পষ্ট জিত। দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় সঙ্গীতের মেলডির সংস্কারের উপর অতিরিক্ত পশ্চিমী এক্সপেবিমেন্টের ভর সওয়াতে যান নি। তিনি গানে সুরের গুরুত্ব সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। গানকে বাণীপ্রধান করে সুরকে তার অনুগামী করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি তাঁর বিদেশী ঢঙের কোরাস গানগুলিতেও তিনি সুরের আদর্শকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। সেগুলিতে স্বীকৃত ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সুরারোপ করেছেন। এ তিনি না করলেও পারতেন, বিদেশী ছাঁচটির মত শাঁসটিও বিদেশী রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর রাগসঙ্গীতনিষ্ঠা তথা সুরজ্ঞানই তাঁকে রক্ষা করেছে।

"ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র" কিংবা "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা" প্রভৃতি কোরাস গানের গাইবার ঢঙটাই শুধু বিদেশী, কিন্তু তাদের বাণী কি উদাত্ত! সুরভঙ্গি কি বলিষ্ঠ! বিদেশী ভঙ্গিমার গান হয়েও সেগুলি বিদেশী গান আদৌ নয়, পুরাপুরি স্বদেশী গান—আক্ষরিক অর্থে তো বটেই, সুরের দিক্ থেকেও। এগুলির সঙ্গে তথাকথিত ইতালীয়ান ঝিঁঝিট বা আইরিশ ঢঙের গান বা "প্রাণ চায় চক্ষু না চায়"—জাতীয় পিয়ানোর টুংটাংয়ের সহযোগে গীত ইউরোপীয় ছাঁচের নিতান্ত হালকা সুরের গানের তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে পার্থক্যটা কত গভীর এবং কোথায় পার্থক্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাবের বশে কিনা জানি না ইদানীং দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমারেরও কিঞ্চিৎ ইউরোপীয় বাতিকে পেয়েছে। তাতে লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে, তিনি গানে বিদেশী স্বরক্ষেপের ভঙ্গীটি বিধিমতেই আয়ত্ত করেছেন কিন্তু কণ্ঠের সুরসম্পদটি হারিয়েছেন। গলার মিষ্টত্ব তথা সুরেলা আমেজ অপগতপ্রায়। মেলডির বিনিময়ে তিনি আবৃত্তির ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাও সানুনাসিক আবৃত্তি, স্বাভাবিক ভঙ্গির আবৃত্তি নয়। এক কথায়, কাঞ্চন ফেলে তিনি আঁচলে কাচ বাঁধতে উদ্যোগী হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পুণ্য স্মৃতির প্রভাব ছাড়া তাঁকে এ পরধর্মচর্চা থেকে নিবৃত্তি করে সাধ্য কার? দ্বিজেন্দ্রলালের গানে একবার যাঁর মন মজেছে—আর দিলীপকুমার তো এ মুগ্ধতা উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত প্রচারে তাঁর ক্ষান্তি বা ক্লান্তি নেই—তিনি কেমন করে যে ভারতীয় মেলডির সুসমৃদ্ধ সংস্কারকে বরবাদ বরে ইউরোপীয় নর্তনকুর্দনসার চটুল নাটকীয় সঙ্গীত নিয়ে মাতামাতি (সেই সঙ্গে হারমোনিয়ম নিয়ে দাপাদাপি) করতে পারেন ভালো বোঝা যায় না। দিলীপকুমারের এখন সুস্থির হবার বয়স হয়েছে, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সুরের গভীরতায় একবার ডুবে যেতে পারলেই তিনি এই সুস্থিরতার সন্ধান পাবেন বলে মনে করি। এ বিষয়ে বিশ্রুতকীর্তি পিতৃদেবের প্রভাব গুণী পুত্রকে বহুল পরিমাণে সহায়তা দান করতে পারে।

যাক, দিলীপকুমারের প্রসঙ্গ থাকুক। দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় আসি। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের খুব প্রসিদ্ধি। কিন্তু সে প্রসিদ্ধি তাদের

কথার সমৃদ্ধির জন্য, সুরের ভূমিকা তাদের খুবই গৌণ। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে কবির সময়কার বাংলাদেশের সমাজ ও রীতি-নীতির সুতীক্ষ্ণ তির্যক্ সমালোচনা আছে, কিন্তু সেই সমালোচনার উপভোগ্যতার বিচার তার স্বক্ষেত্রে করতে হবে অর্থাৎ ব্যঙ্গকাব্যের ক্ষেত্রে করতে হবে, এর মধ্যে সুরের বিচারকে টেনে আনার কোন সার্থকতা নেই। হাসির গানের সুররূপ নিতান্তই সরল, সাদাসিধে, জায়গায় জায়গায় একেবারেই আটপৌরে মামুলী। গানগুলির কথায় আমরা মুগ্ধ হই, সুরে মুগ্ধ হই না। সুর এখানে কথার অবলম্বন মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। কথার ঘুড়ি ওড়াবার সুতো মাত্র, কাজেই সুতোর মতই সে সুরের বহর ক্ষীণ। বোধ করি গানগুলির যিনি রচয়িতা তাঁর অভিপ্রায়ও তাই ছিল।

কাজী নজরুল ইসলাম—গীতিকার ও সুরকার

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যসাধনার দিক নিয়ে বাংলা দেশে এযাবৎ কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্যের দিক—তাঁর সাঙ্গীতিক কৃতিত্বের দিক নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজী নজরুলকে আমরা নূতন ভাবাদর্শের অগ্রদূত, নূতন সৃষ্টিপ্রেরণার বাহক 'বিদ্রোহী কবি' বলে জানি, কিন্তু এইটেই তাঁর সবটুকু পরিচয় নয়। তাঁর অপূর্ব সৃজনকুশল প্রতিভা শুধুমাত্র কাব্যরচনাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি; বাংলা গানের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তিনি যা দিয়েছেন তার মূল্য তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব থেকে কিছুমাত্র ন্যূন নয়।

আমরা যখন কারও কাব্যের কৃতিত্বে বিমুগ্ধ হই আমাদের চোখে সেইটেই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে; শিল্পসৃষ্টির অন্য বিভাগেও যে তাঁর অনুরূপ কৃতিত্ব থাকতে পারে তা আর মনে হয় না। কাজী নজরুল একজন শক্তি-শালী কবি এ কথায় যেমন সন্দেহের অবকাশ নেই, তেমনি তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতকার এ কথায়ও সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। তিনি বিশিষ্ট একজন সঙ্গীতস্রষ্টা বলায় তাঁর কাব্যসৃষ্টির অনন্যতা খারিজ হয়ে যায় না; তাঁর প্রতিভা যে বহুমুখী সেইটিরই শুধু প্রমাণ হয়। আর্টের ক্ষেত্রে এক বিহারভূমি থেকে অন্য বিহারভূমিতে অবলীলাক্রমে বিচরণ করার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। কাজী নজরুলের প্রতিভা এই বিরল দৃষ্টান্তের একটি। নজরুলের প্রতিভাকে সঙ্কুচিত করে দেখলে তাঁর মূল্যনির্ণয়ে অনেকখানি ফাঁক থেকে যায় বলে আমাদের বিশ্বাস।

বোধ করি কাজী নজরুলই রবীন্দ্রোত্তর যুগের একমাত্র স্রষ্টা যাঁর সৃজন-ক্ষমতা কাব্য ও সঙ্গীত এই উভয় ক্ষেত্রেই সমান লীলায়িত হয়েছে। এবং এ থেকে এই কথাটারই আবার নতুন করে প্রমাণ হয়, কাব্য ও সঙ্গীতের মূল প্রেরণা এক ও অভিন্ন। বাংলা সাহিত্যে এই মণিকাঞ্চন যোগাযোগের দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই: যাঁরা কাব্যচর্চা করেন তো কাব্যচর্চাই করেন, যাঁরা সঙ্গীতচর্চা করেন তো সঙ্গীতচর্চাই করেন। খুব কম ব্যক্তির মধ্যে এই উভয় গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবি দ্বিজেন্দ্র-

লাল, কান্তকবি রজনীকান্ত, স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কাজী নজরুল ও দিলীপকুমার ছাড়া আর কারও মধ্যে এই সঙ্গীত-সাহিত্যের সফল যোগাযোগ ঘটে নি। আবার এঁদের ভিতর রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের মধ্যে এই যোগাযোগ যত স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ এমন আর কারও মধ্যে নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল মুখ্যতঃ কবি ও নাট্যকার, তারপর স্থরকার; কান্তকবি রজনীকান্তের মধ্যে বাণীরচনা ও স্থররচনার সামঞ্জস্য ঘটলেও তাঁর প্রতিভার পুঁজি ছিল অল্প। উল্টো, স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রধানতঃ ছিলেন গায়ক, তারপর সাহিত্যিক। অতুল-প্রসাদের গানে স্থরের আবেদন যত মনোরম, বাণীর আবেদন তত নয়; দিলীপকুমারের গানে কথা জটিল কিন্তু স্থর সমৃদ্ধ। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁদের স্থর ও বাণী দুইই ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং তাঁদের গান একটি স্থসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে এসে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের গানে তেমনি কাজী সাহেবেরও গানে, কথার আবেদন বেশী কি স্থরের আবেদন বেশী বলার উপায় নেই; দুইয়ের অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়েই তাঁদের গান গান হয়ে উঠেছে। কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুল-গীতির বিচার করতে হলে স্থরকে খাটো করে বাণীকে প্রাধান্য কিংবা বাণীকে খাটো করে স্থরকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। ও দুটি বস্তুর মিলিত এবং অভিন্ন রূপের বিচারই সে গানের প্রকৃত বিচার।

কথাটা কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, যাঁরা নিজেরা গান লেখেন কিন্তু অপরকে দিয়ে তাতে স্থরযোজনা করিয়ে নেন তাঁদের গানে কখনও পূর্ণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আবার এর উল্টো পিঠে, যাঁদের স্থর দেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু নিজেরা গান রচনা করতে জানেন না, পদের জন্য অপরের শরণাপন্ন হন, তাঁরাও স্থর যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কিনা সন্দেহ। কেন না পদের জন্য অপরের উপর নির্ভর করতে গিয়ে তাঁদের স্থরের অনেক-খানি মারা পড়ে। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত যে, গানের ভিতর পদরচনা ও স্থরযোজনা একই ব্যক্তির দ্বারা স্থসম্পন্ন না হলে গান মাত্র আংশিক গান হয়; কখনও তা স্থর ও বাণীর স্থসমঞ্জস মিলনে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। এ কথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার, কথা ও স্থর মিলেই গান; শুধু কথা অথবা শুধু স্থরে কখনও গান

হয় না। শুধু কথায় যে জিনিসটি দাঁড়ায় তার নাম কবিতা; শুধু সুরের যে চেহারা তাকে আলাপ বা বিস্তার বলে চালানো যেতে পারে, কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্ন্যালের ভাষায় তাকে 'কণ্ঠবাদন'ও বলা যায়, কিন্তু গান তা কখনও নয়। গানের ক্ষেত্রে সুরবিভাগ ও পদবিভাগ—এরূপ যথেচ্ছ ভাগাভাগি চলে না। গান রচনা করছেন একজন, সুরযোজনা করছেন আরেকজন, এই যে রেওয়াজ আজকাল ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে তা সঙ্গীতের মর্ম্মমূলে আঘাত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এইরূপ শ্রমবিভাগ অযৌক্তিক শুধু নয়, বিনিঃশেষে ক্ষতিকর।

কাজী নজরুলের গানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে, তাঁর সুরসৃষ্টির ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। ঝুমুর বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে স্বদেশী সঙ্গীত, মার্চের সুর, গজল, ঠুংরী, আধুনিক, মিশ্র সুরের বাংলা গান, খেয়াল, ধ্রুপদাঙ্গ গান, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, লুপ্ত বা অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে রচিত বাংলা খেয়াল—কোন কিছুই তাঁর প্রতিভার পরিধির বাইরে নয়। সুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ গতিবিধি—যে হাতে তিনি দৃপ্ত মার্চ সঙ্গীত রচনা করেছেন সেই হাতেই চটুল গজলের প্রেমবিহ্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই হাতেই আবার গম্ভীর রাগাশ্রিত ভগবদ্বিষয়ক ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করেছেন। এতে যেমন কাজী নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর সাঙ্গীতিক রুচিটিও যে বিশেষ নমনীয় ও বিভিন্নক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল সে কথা প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে হয়ত খানিকটা মধুকরবৃত্তির আভাস আছে, কিন্তু এরূপ অবলীলায় ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে বিচরণ সহজ কাজ নয়। রুচির স্থিতিস্থাপকত্ব গুণ যাঁর নেই তাঁর পক্ষে একই কালে মার্চের গান আর শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করা অসম্ভব। বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, অসম্ভব শক্তিশালী ব্যক্তিও একই বাঁধা পথে চলতে আরাম পান। আরামটা শুধু অভ্যাসের জন্যই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করতে গেলে তাঁদের সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবার ভয় থাকে বলেই তাঁরা তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে আরাম পান। এই ধরনের প্রতিভা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তা অসাধারণ প্রতিভা নয়ঃ তার বিচরণের ক্ষেত্র যেমন অপরিসর, তেমনি তার কর্মোদ্যম,লক্ষ্য ও অভীপ্সা একদেশদর্শী, সঙ্কীর্ণ।

কিন্তু কাজী সাহেব এই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত। তাঁর সুরসৃষ্টির পরিধি অতি ব্যাপক। সঙ্গীতের এত বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে পরীক্ষা বোধ হয় আর কেউ করেন নি। কাজী নজরুলের এই-যে প্রচেষ্টার ব্যাপকতা, এই-যে সর্বক্ষেত্রে সঞ্চরণশীলতা, এর মূলে রয়েছে তাঁর মৌলিক সৃষ্টিকুশল প্রতিভা। তাঁর এই সৃজনধর্মী প্রতিভার গুণে যখন যে ধরনের গান তিনি লিখেছেন (লিখেছেন অর্থাৎ পদরচনা করে তার উপর সুরযোজনা করেছেন) তা-ই তাঁর হাতে সোনা হয়ে ফুটে উঠেছে।

নজরুলের প্রতিভায় আবেগের লীলা প্রধান : তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উৎস তাঁর হৃদয়, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীসুলভ মস্তিষ্ক নয়। এ কথা যেমন সাধারণ-ভাবে তাঁর কাব্য সম্পর্কে খাটে, তেমনি তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কেও খাটে। তাঁর সুরের লীলায় উচ্ছল প্রাণের প্রাবল্য থেকে থেকে নিজেকে জানান দিচ্ছে : সুরের স্রোত প্রাণাবেগে চলোর্মিমুখর। মার্চের সুরে যেমন তাঁর প্রাণের লীলা প্রকট, তেমনি তাঁর স্বদেশী গানে পরাধীনতার গ্লানিজর্জর সুতীব্র অনুভূতিপরায়ণ হৃদয়ের অভিব্যক্তিটুকু সুস্পষ্ট। আবার কীর্তনে ও শ্যামা-সঙ্গীতে তাঁর ভক্তিবিগলিত অন্তরের আত্মসমর্পণের আকূতি উচ্ছলিত। কাজী নজরুলের সমস্ত সৃষ্টিতেই এই হৃদয়ের ঘোষণা প্রবল—যেমন তাঁর কবিতায় তেমনি তাঁর গানের ভিতরও হৃদয়সংবেদনটিই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

মার্চ সঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। কাজী সাহেবের অতি পরিচিত দুটি মার্চের সুর—

> ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
> নিম্নে উতলা ধরণী তল
> অরুণ প্রাতের তরুণ দল
> চল্ রে চল্ রে চল্।

কিংবা,

> টলমল টলমল পদভরে।
> বীরদল চলে সমরে॥

বোধ করি সকলেরই জানা আছে। গান দুটি তাঁরা কোন না কোন উপলক্ষ্যে শুনেছেন নিশ্চয়। এই গান দুটির দৃপ্তভঙ্গি, বলিষ্ঠ আশাবাদ ও উৎসাহের দীপ্তি যেমন মনকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনই তারই সঙ্গে সমতা

রক্ষা করে ইউরোপীয় ঢঙে যে সুর আরোপ করা হয়েছে তাতে শিরায় শিরায় চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। আমাদের দেশে মার্চের সুর কাজী নজরুলই প্রথম প্রবর্তন করেন। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কর্মপন্থার মধ্যে যে দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধস্পৃহা একদিন জেগে উঠেছিল, সেই সংগ্রামী মনোভাবকে সুরে রূপ দেবার কল্পনা কাজী নজরুলের মনেই প্রথম জাগ্রত হয়। সংগ্রাম-সঙ্গীতের তিনিই প্রথম চারণ কবি। তাঁর এই সুরগুলির প্রেরণা ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে এসেছে সন্দেহ নেই (মার্চের ব্যাণ্ডের তালে তালে তিনি যখন সুরকে কোথাও ত্বরান্বিত, কোথাও মন্থর করেন সেটা যে বিদেশী সুরের ঢঙে করেন তা বেশ বোঝা যায়), কিন্তু আশ্চর্য নিপুণতার সহিত তিনি সে সুব আমাদের স্বদেশীয় আবহাওয়ার উপযোগী করে নিয়েছেন। কাজী সাহেবের পরে সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ও দিলীপকুমার রায় মার্চ সুর দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের সুরে সংগ্রাম-শীলতা এত প্রখর নয়।

জাতীয় সঙ্গীত রচনায়ও কাজী সাহেবেব দান অনস্বীকার্য। এই পথে অবশ্য তিনি প্রথম নন, তাঁর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ গীতিকার বাঙালীর দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে নিজ নিজ বিশিষ্ট দান রেখে গেছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কাজী সাহেবের দানও সামান্য নয়। স্বাজাতিকতা ও আত্মচেতনার স্ফুরণে তাঁর কোরাস গানগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

> দুর্গম গিবি কান্তাব মরু দুস্তব পাবাবাব
> লঙ্ঘিতে হবে বাত্রি নিশীথে, যাত্রীবা হুঁসিযাব।

এই কোরাস গানটির বাণী ও সুরের মিলিত আবেদনে মুগ্ধ হয় নি এমন শিক্ষিত বাঙালী খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। এটি বাংলা দেশের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কোরাস সঙ্গীত। এ গানটি কবি সুভাষচন্দ্রের দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য রচনা করেছিলেন, তাঁর সে প্রয়াস সর্বাঙ্গসার্থক হয়েছিল।

জাতীয়তার মন্ত্রে যেমন তিনি দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বিধাহীন ঘোষণাটুকুও এসেছে। মুসলিম গণজাগরণের প্রতীক কাজী সাহেবের চোখে সমস্ত প্রকার বন্ধনই

আত্ম-অবমাননাকর। বন্ধনমুক্তির যে নূতন মন্ত্রে তিনি তাঁর সহধর্মী ভাইদের দীক্ষা দিলেন তাতে নারী সমাজকেও তিনি সমান আগ্রহভরে আহ্বান জানিয়েছিলেন। নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল পাশার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত মুসলিম বাংলার অগ্রসর চিন্তাধারার নায়ক কাজী নজরুল নারীকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারেন না। তাঁর 'নারী' কবিতায় স্ত্রীপুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও মহিমা তিনি যে আদর্শবাদ নিয়ে ফুটিয়েছেন, সেই আদর্শবাদের ভিত্তিতে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর চমৎকার গানও লিখেছেন। যথা :

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা
জাগো স্বাহা সীমন্ত রক্তটীকা।
(জাগো) দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগবসনা
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গস্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদদলিতা···

মনে হয় কবিতা। কিন্তু ছন্দটুকু আরেকটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, গানের উদ্দেশ্যেই এটি রচিত। অনেকে কাজী নজরুলের গানের ছন্দ সম্পর্কে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি সব সময় গানের ছন্দের প্রচলিত শৃঙ্খলা মেনে চলেন না, তাঁর গানের ছন্দ কেমন যেন অবিন্যস্ত বন্ধুর অনিয়ন্ত্রিত। এই অভিযোগ নিতান্ত ভিত্তিহীন নয় (উপরের গানটির অনিয়ন্ত্রিত ছন্দই তার প্রমাণ), কিন্তু সুরযোজনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা অল্পবিস্তর পরিচিত তাঁদের নিকট এই ছন্দের অনিয়ম অনিয়ম বলে ঠেকবে না। কাজী সাহেব সুরের বিকাশকে যদৃচ্ছা লীলায়িত করবার জন্যই যে ইচ্ছামত গানের ছন্দকে টেনে বাড়ান বা সঙ্কুচিত করেন তা তাঁর কবিতা ও গানের পার্থক্যটুকু একটু মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। কবিতায় তাঁর ছন্দ মোটামুটি সংযম-শাসনে শাসিত, অথচ তিনিই যখন গান রচনা করেন, ছন্দে ভয়ানক আল্‌গা দেন। সুরের নিজস্ব প্রয়োজনের মুখ চেয়েই যে তিনি এটা করেন, সুরযোজনার প্রাথমিক সূত্রটুকু যাঁর জানা আছে তিনিই তা স্বীকার করবেন। কোন লাইনে অক্ষর কম পড়ল তো সুর দীর্ঘায়িত করে তাকে টেনে বাড়ানো হল, আবার অক্ষর বেশী হল তো সুরকে

ত্বরান্বিত করে লয়ের সমতাবিধান করা হল—নজরুলের অনেক গানেই এই প্রক্রিয়া চোখে পড়ে। একই ব্যক্তি গীতরচয়িতা ও সুরকার হওয়াতে এইরূপ সুবিধা দেখা দেয়। আমরা অতুলপ্রসাদের মধ্যেও এ জিনিসটি দেখি। কিন্তু যাঁরা গীত রচনা মাত্র করেন, সুরযোজনা করেন না, তাঁদের গান ছন্দের দিক দিয়ে বড় বেশী নির্ভুল, মারাত্মক রকমের নির্ভুল!

বাংলা গজল গান প্রবর্তনের সবটুকু কৃতিত্ব নিঃশেষে কাজী নজরুলের প্রাপ্য। এককালে বাংলার আকাশে বাতাসে এই গজল সুরগুলি ছড়িয়ে ছিল; এখন অবশ্য গজল গানের জনপ্রিয়তায় কতকটা মন্দা পড়ে গেছে। বিশুদ্ধ পারসিক গজলের সুরে গানের মাঝে মাঝে দীর্ঘায়িত রেখায় আবৃত্তি ('শ্যের') এবং তারপর পুনরায় দ্রুত তালসংযোজন—এইটি গজলের বৈশিষ্ট্য। নজরুলেরও অধিকাংশ গজলের তা-ই বৈশিষ্ট্য। কলকাতা থেকে সুদূরতম পল্লীপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র একদিন তাঁর গজলের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। আলস্যপরায়ণ শৌখীন বাবু থেকে কর্মরত সাধারণ শ্রমিক, বিড়িওয়ালা, গাড়োয়ান প্রভৃতি সকল স্তরের লোকের মুখে কোন না কোন গজলের কলি গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে। শুধু তাই নয়, গজলের সুর অর্কেস্ট্রা ও যন্ত্রসঙ্গীতের দরবারে গিয়েও হানা দিয়েছে। সুরের এই গণাভিমুখীনতায় হয়ত সুরের কৌলীন্য নষ্ট হয়েছে, কিন্তু কতদূর জনপ্রিয় হলে গান এরূপ সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

নজরুলের গজল গান সংখ্যায় অগণন। "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল," "কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে," "ভুলি কেমনে আজো যে মনে," "এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলে বল কে," "এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া," "চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না ওই নয়নবানে," "আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী," "নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল," "কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি," "কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলায়," "কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী," "পথ চলিতে যদি চকিতে"—কত গানের নাম করব! দিলীপকুমার রায় এককালে এই গজলগুলির জনপ্রিয়তা বর্ধনে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মণ প্রমুখ শিল্পীরাও একদা এসকল গানের সার্থক প্রকাশক ছিলেন।

আধুনিক বাংলা গান বলতে যে শ্রেণীর গান বোঝায় তাতেও নজরুলের দান অজস্র। "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নমো," "গানগুলি মোর আহত পাখীর সম," "কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া" (রাগপ্রধান—"ন মানুঙ্গী ন মানুঙ্গী" নামক সুপরিচিত হিন্দী গানের বাংলা রূপ) প্রভৃতি অনেক গানেরই নাম কবা যায় যাতে নজরুলের সুরের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় প্রকট। আবাব লোক-সঙ্গীতের সুরে তাঁর বিচিত্র ছাঁদের অজস্র গান পডে রয়েছে। ঝুমুর ("চোখ গেল চোখ গেল," "রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম খেজুর পাতার নূপুর বাজায়"); ভাটিয়ালি ("পদ্মার ঢেউ রে, পদ্ম দিয়ে যাও রে", "ও বিদেশী বন্ধু"); বাউল ("আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল আমারি এই আপন দেহ"), লাউনি ("পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়")—যে কোন ধবনের লোকসঙ্গীত তিনি বচনা কবেছেন তাতেই তাঁব বৈশিষ্ট্য অনন্য হয়ে দেখা দিয়েছে। শেষোক্ত গানটিব কথাই ধরুন।

পাষাণেব ভাঙালে ঘুম কে তুমি সুবেব ছোঁয়াষ,
গলিযা সুবেব তুষাব গীত-নির্ঝর বযে যায।
উদাসী বিবাগীব মন যাচে আজ বাহুব বাঁধন,
কত জনমেব কাঁদন ও পাযে লুটাতে চায।
তোমাব চবণ ছন্দে গো মুঞ্জবিল গানেব মুকুল,
তোমাব বেণীব বন্ধে গো মবিতে চায সুবেব বকুল,
চমকে ওঠে মোব গগন ওই হবিণ-চোখেব চাওযায।

লোকসঙ্গীতের ধাঁচে কথা ও সুরের এমন চমৎকার মিলন খুব কম গানেই চোখে পডে। বিশেষতঃ এ গানের "তোমার বেণীর বন্ধে গো মরিতে চায় সুরের বকুল, চমকে ওঠে মোর গগন ওই হরিণ-চোখের চাওয়ায়" লাইন দুটির তুলনা হয় না। সুবেও কী আকূতি, কী আবেগ ঝরে ঝরে পড়েছে! এ ছাডা, মাবফতী, জারী, দেহতত্ত্ব, ছাদপেটানো গান, সারি, নবীর আবির্ভাব-মূলক গান, কত বিচিত্র পল্লীসঙ্গীত যে তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য এককালে তিনি এই ধরনের ঝুডি ঝুডি গান লিখেছেন।* তাদের সবগুলিই যে উতরেছে তা

* কাজী নজরুল ইসলাম সবশুদ্ধ আনুমানিক তিন হাজাব গান বচনা কবেছেন। পৃথিবীব সঙ্গীতবচনাব ইতিহাসে এইটিই বোধ হয সর্বোচ্চ বেকড। ববীন্দ্রনাথেব গানের সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজাব চাবি শত।

বলি নে—উৎকৃষ্টের সঙ্গে অনেক অপকৃষ্টও মিশে আছে—কিন্তু এই বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভারের পিছনে যে নিয়তনবনবোন্মেষশালিনী একটি অজস্র-সম্ভাবনাময় সৃষ্টিশীল প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে তো অস্বীকার করতে পারি নে।

নজরুলের ভক্তিভাবের গান তাঁর সঙ্গীতের অন্য আর এক রূপ। তাঁর কীর্তন ও শ্যামাসঙ্গীত অনেকেই শুনেছেন নিশ্চয়। যাঁরা তাঁর এই হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রয়ী গানগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন টেনে আনেন তাঁরা নজরুলের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেন না। শ্যামাসঙ্গীত হোক কীর্তন হোক আর ইসলামী গানই হোক, এই ধরনের রচনার প্রত্যেকটিতে কবির অপূর্ব ভক্তিরসাশ্রিত হৃদয়টি সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে ; সম্প্রদায়বিশেষকে খুশী করবার জন্য তিনি এ সব গান লেখেন নি। তাঁর "কী সুখে লো গৃহে রব" নামক বিখ্যাত কীর্তন গানটির কয়েকটি পংক্তি শুনুন :

আমি ধূলি হব · সেই পথেরই ধূলি হব,
যে পথ দিয়ে চলে গেছে শ্যাম
সেই পথেরই ধূলি হব,
সে যে চলে যেতে দলে যাবে
সেই সুখে লো ধূলি হব,
আমি কী সুখে লো গৃহে রব।
* * *
হব ভিক্ষার ঝুলি শ্যাম লবে তুলি
বাহুতে আমারে জড়ায়ে,
ওগো, আমার বেদনা-গৈরিক-রাঙা
বাস দেব তারে পরায়ে।
আমার প্রাণের গোধূলি বেলায়
রঙে রঙে তারে রাঙাইব আমি,
ওগো, গেরুয়া-রাঙা বসন হয়ে
জড়ায়ে রব দিবসযামী..."

এতে যে নিবিড় আত্মসমর্পণের আকুতি ফুটে উঠেছে তা শ্রীরাধিকা না হয়ে যে কোন ভগবৎচরণে সমর্পিত ভক্তের হৃদয়ের আকুতি হতে পারত। এই ধরনের গানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন টেনে আনা অবান্তর, কেন না কবির চোখে শ্রীরাধিকা যা ভক্তিমতী রাবেয়াও তা—দুয়ের ব্যক্তিত্বের মূল ভক্তিতে

প্রোথিত। ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের ভিতর বিভিন্ন ধর্মসমন্বয়ের প্রেরণাটুকু আজকের দিনেও সমান বলবতী রয়েছে—সেটি কম আশার কথা নয়। এ সব প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র সুরের বিচারে গানটিতে খাঁটি কীর্তনের আমেজ লক্ষণীয়। কীর্তনের লয়, ধুয়া, আখর সবই অপূর্ব নৈপুণ্যে গানটিতে যোজনা করা হয়েছে। কাজীর শ্যামাসঙ্গীতগুলিও ভক্তিভাবের গানের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সুপরিচিত হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের অনুসরণে রচিত বাংলা খেয়াল নজরুলের সাঙ্গীতিক প্রতিভার আরেকটি দিক। এগুলিকে বলা যেতে পারে ভাঙা খেয়াল। পূর্ববর্তী যুগের দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তারপর আধুনিক যুগের একমাত্র কাজী সাহেবের মধ্যেই এই খাতে বিধিবদ্ধ ও ব্যাপক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। পরলোকগত শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী রেকর্ডে যে সব বাংলা খেয়াল গেয়েছেন তার একাংশ নজরুলের রচিত—প্রচলিত খেয়ালের ছন্দ সুর ভাব সেই সব গানে চমৎকার বিধৃত। ধ্রুপদাঙ্গ গানও তাঁর আছে। জ্ঞান গোঁসাইয়ের মুখে তাঁর সুর দেওয়া দরবারী-কানাড়ার "বাজে মৃদঙ্গ বাজে" গানটি শুনে মুগ্ধ না হয়েছেন কে?

লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত বা অপ্রচলিত রাগের পুনরুদ্ধার নজরুলের আর একটি মহৎ প্রচেষ্টা। যে সমস্ত রাগিণী অবহেলায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে, লোকরঞ্জন বাংলা গানের মধ্য দিয়ে তাদের পুনরুদ্ধারের বিধিবদ্ধ প্রয়াস বোধ করি আর কেউ এমন ঐকান্তিকতার সহিত করেন নি; 'খাম্বাবতী', 'মালগুঞ্জ', 'রাগেশ্রী', 'বিজয়া', 'কৌশিকী', 'শিবরঞ্জনী' প্রভৃতি অপ্রচলিত, অর্ধ-প্রচলিত একাধিক রাগ-রাগিণীকে তিনি এইভাবে বাংলা গানের সুরে তর্জমা করেছেন। তাঁর শিবরঞ্জনী সুরের "হে পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ" বা কৌশিকী সুরের "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে দিতে কোল" গান দুটির সঙ্গে বোধ হয় অনেকেরই পরিচয় আছে। এই প্রচেষ্টাকে সংরক্ষণকামী মনোবৃত্তি মনে করলে ভুল করা হবে; এর পিছনে পুরাতনকে নূতনের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার তাগিদটুকুই সমধিক প্রবল।

বিদেশী সুরের আশ্রয়ে রচিত গানের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর "দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি" গানটিতে South-sea Islands-এর

আবহাওয়াটুকু কী চমৎকারভাবেই না বাংলা সুরে ভেসে এসেছে! অনেক দিন আগে তাঁর আরবী সুরের একটি গান শুনেছিলাম, রেডিওতে গাওয়া হয়েছিল—তার কথা মনে নেই কিন্তু সুরটুকু আজও কানে লেগে রয়েছে। সিনেমার গানেও নজরুল একটি বিশিষ্ট নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেছিলেন; 'চৌরঙ্গী' ছবিতে তাঁর সুর দেওয়া গান যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই আমার এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন আশা করি।

কাজী নজরুলের গানের প্রায় সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করা হল। দুটি একটি দিক হয়তো বাদ পড়েছে, কিন্তু সব জড়িয়ে নজরুলগীতি সম্পর্কে পাঠকের মনে বোধ হয় একটা মোটামুটি ধারণা এ থেকে হবে। গুণগত দিক ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারেও সবার উপর দিয়ে কাজী নজরুলের জিত। সুরের বোধ অন্তরে কত দৃঢ়প্রোথিত ও গভীর হলে প্রায় তিন হাজার গান রচনা ও তাদের আশ্রয়ে বিচিত্র ছাঁদে সুরকে লীলায়িত করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। এক গ্রামোফোন রেকর্ডেই তাঁর অজস্র ঢঙের গান ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলা 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের জনপ্রিয়তার অনেকখানি কৃতিত্ব একা কাজী নজরুলের প্রাপ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

কবি আজ অনেক বৎসর যাবৎ নিদারুণ অসুস্থ—চিকিৎসকেরা তাঁর ব্যাধি দুরারোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবন্মৃতবৎ বাস করছেন। তবু আমাদের আশা করতে দোষ নেই। দেশবাসীর সম্মিলিত শুভেচ্ছায় সুস্থ হয়ে তিনি পুনরায় কাব্য ও সঙ্গীতের ছিন্নতন্ত্রী বীণায় নতুন করে সুর সংযোজনা করুন এই কামনা করি।

সঙ্গীতে দিলীপকুমার রায়

কোন একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার এক সংখ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা গান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের গানের বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। তাতে প্রশংসা ও সমালোচনা দুইই ছিল। প্রশংসা যৌক্তিক হোক অযৌক্তিক হোক লোকে তা বিনাপ্রতিবাদে গ্রহণ করে, কিন্তু এই কর্তাভজা দেশে কারও সমালোচনা করে সহজে পার পাওয়ার উপায় নেই। তাই দিলীপকুমারের অনুরাগী কেউ কেউ চেপে ধরেছেন কোন্ দিক দিয়ে এবং কী কারণে দিলীপকুমারের গান সম্পর্কে আমার আপত্তি, সেইটে লিখে জানাতে হবে। এই নিয়ে আমার আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল না, তা হলেও যখন কথা উঠেছে তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু অন্ততঃ বলা দরকার। দিলীপকুমার সম্পর্কে আমি বরাবর নীরব থাকব স্থির করেছিলাম, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ একবার যখন তীর নিক্ষেপ করে ফেলেছি, তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারি নে।

আশা করেছিলাম দিলীপ রায়ের গান সম্পর্কে অন্য কোন সঙ্গীত-সমালোচক কাগজের পৃষ্ঠায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবার জন্য এগিয়ে আসবেন। সে আশা সফল হয় নি। দিলীপকুমার আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল অত্যন্ত অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গীতাভ্যাস করছেন এবং নানা দিক দিয়ে বাংলা গানের ঐতিহ্যকে পুষ্ট করে চলেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, বিদগ্ধ রুচি ও মনঃপ্রকর্ষ বাংলা গানের ক্ষেত্রে রীতিমত আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল—এ কথা তাঁর অতি বড় বিরূপ সমালোচকও স্বীকার করবেন। অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেমনই হোক, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে বরাবর অশিক্ষিতপটুত্বেরই জয়জয়কার : মুষ্টিমেয় সংখ্যক সুরকার গায়ক বাদককে বাদ দিলে আর যাঁরা আছেন, শিক্ষা সংস্কৃতির বড় একটা ধার তাঁরা ধারেন না। সঙ্গীতকূপের তাঁরা মণ্ডুক, নাদব্রহ্মে এমনি লীন হয়ে আছেন যে বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে এতটুকু আগ্রহও তাঁদের ভিতর দেখা যায় না। এই যেখানকার অবস্থা, সেখানে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ একজন সঙ্গীতজ্ঞের দেখা পাওয়াটাই একটা

অভাবনীয় ব্যাপার। দিলীপকুমার রায় বাংলা গানের ক্ষেত্রে সেই অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি শেষরক্ষা করতে পেরেছেন কিনা সে কথা পরে বিচার্য কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর উপরেই বাংলা গানের দাবি ছিল সর্বাধিক। স্বভাবতঃ আন্তরিক ও অপরিসীম প্রাণশক্তিবান দিলীপকুমার বাঙালীর সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; তাঁর সেই একাগ্র সাধনার দ্বারা তিনি বাংলা গানকে সবিশেষ সমৃদ্ধও করেছেন। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত তাঁর গানের বিশদ আলোচনা বাংলা দেশে হল না। তাঁর গানের ভাল-মন্দ সমস্ত দিক নিয়ে এই দীর্ঘ কালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল—তা যে হয় নি তাতেই প্রমাণ আমরা শুধু গান শুনতে ভালবাসি, গায়কের গুণাগুণ নির্ণয়ে আমাদের উৎসাহ কম।

প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে দিলীপকুমার যখন প্রথম ওদেশ ঘুরে স্বদেশে ফিরে আসেন তাঁর কাছ থেকে বাংলার সঙ্গীতজগত অনেক কিছু আশা করেছিল। সে আশা তিনি বহুলাংশে পূরণ করেছেন। গান সম্পর্কে দিলীপকুমারের গতানুগতিকতামুক্ত চিন্তাধারা, বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য ও অগ্রসর মতবাদ প্রগতিকামী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর মনে রেখাপাত করেছিল। বাংলা গানের বিকাশে দিলীপকুমারের প্রথম বিশিষ্ট দান হল, আন্দোলন, বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীকে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বাঙালী "আত্মবিস্মৃত" জাতি, ঘরে তার অজস্র মণিমুক্তা ছড়ানো, তবু ভিক্ষাপাত্র হাতে পরের দুয়ারে তার ধর্ণা দেওয়া চাই—এই হীনতা আর আত্মঘাতী মানসিক দৈন্যের পাক থেকে মুক্ত হবার জন্য দিলীপকুমারই বোধ করি প্রথম বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীকে কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানান। বাংলার নিজস্ব গানের ভাণ্ডারে রয়েছে বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের ঐশ্বর্য আর কীর্তন ও ধ্রুপদরূপী মার্গসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য; তা সত্ত্বেও বাঙালী তাদের হেলাভরে একপাশে সরিয়ে রেখে ছুটল খেয়াল-ঠুংরীরূপ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কল্পিত বৈভবের পিছনে। খেয়াল ঠুংরী অসুন্দর জিনিস তা বলছি নে—কিন্তু পাত্রভেদে অমৃতও গরল হয়। খেয়াল ঠুংরী উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতিভার অনুসারী হতে পারে, কিন্তু বাঙালীর মেজাজ বোধ হয় পুরাপুরি সেসবের অনুকূল নয়।

বাঙালীর এই সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দিলীপকুমারই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙালী ওস্তাদপন্থীরা যাই বলুন এ বিষয়ে দিলীপকুমারের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত যে, উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গাইবার ঢঙ ও ধারা বাঙালীর প্রতিভার উপযোগী নয়। বাঙালীর মধ্যে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির দু'চার জন সেরা গাইয়ে না হয়েছেন এমন নয়, কিন্তু খতিয়ে দেখতে গেলে তাঁদের ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বাঙালীর কান সুরের আবেগাকুলতা ও মিষ্টত্বে যত সাড়া দেয়, কণ্ঠের কলাকারু বা প্রকাশ-ভঙ্গির জটিলতায় তত সাড়া দেয় না। উত্তর ভারতীয় ওস্তাদের কণ্ঠ বাঙালী গায়কের চাইতে বেশী লীলায়িত হয় তার মানে এ নয় যে হিন্দুস্থানী গায়ক বাঙালী গায়কের চাইতে স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ, তার মানে এই যে গলা খেলানোটা হিন্দুস্থানী গায়কের মেজাজের যত অনুকূল বাঙালী গায়কের তত নয়। এ থেকে নিশ্চয় এ কথা বলা চলে না যে, বাঙালী গায়কের কণ্ঠের কুশলতা কিছু কম। বাঙালী গায়কের কণ্ঠের কুশলতা আছে, তবে তা অন্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। অলঙ্করণের চাইতে নিরাভরণ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সুরকে যথাযথ-ভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকেই বাঙালী গাইয়ের সহজ ঝোঁক। বাঙালীর মন সুরের চটকে ভোলে না, সুরের গভীরতায় থিতিয়ে পড়তে চায়। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব গান যাই ধরি না কেন, তাদের প্রত্যেকটিতে সুরের আবেগ প্রবল, সুরের অলঙ্করণ নয়। অবশ্য জটিল তাললয়যুক্ত কীর্তন অনেক আছে, কিন্তু সেখানেও দেখি তাদের প্রয়োগ শুধু রসকে গাঢ়তর করবার জন্য, নিছক কণ্ঠনৈপুণ্য প্রকাশ করবার জন্য নয়।

এই থেকে দিলীপকুমার যা বলতে চেয়েছেন তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। কেউ যে কোন একটা জিনিস পারে বা পারে না তার অর্থ এই যে, সেই দিকে তার মনের সহজ ঝোঁক আছে বা নেই। প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত পারা না-পারার প্রশ্ন নয়, প্রবণতার প্রশ্ন। বাঙালী যে উত্তর ভারতের শিল্পীদের মত, বিশেষতঃ মুসলমান ওস্তাদদের মত, খেয়াল ঠুংরী গাইতে পারে না তার মানে এই যে সঙ্গীতের এই শ্রেণীগুলির প্রতি বাঙালীর মনে সহজ স্ফূর্তির অভাব। তার মন জুড়ে রয়েছে কীর্তন, বাউলের সুরের মায়া, নয়ত এদের সমবায়ে তৈরি আধুনিক মিশ্র সুরের মোহ। বাঙালীর ভিতর আবদুল

করিম খাঁ, জোহ্‌রা বাঈ, কেশরবাঈ কারকার প্রভৃতির ন্যায় উচ্চাঙ্গ রাগ-সঙ্গীত শিল্পী হয় নি এটা যেমন ঠিক, তেমনি এ কথাও ঠিক যে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের ভিতর কীর্তনের ভাবালুতা, বাউলের উদাস সৌন্দর্য, ভাটিয়ালির করুণ রস, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, আধুনিক বাংলা গানের নিরলঙ্কার স্বরৈশ্বর্য প্রভৃতি খুঁজতে গেলে বিফল-মনোরথ হতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমনি আত্মসচেতনতার অভাব যে, যা আমাদের ঘরের জিনিস তার প্রতি আমাদের হেলাফেলার মনোভাব, অথচ যা নাগালের বাইরে কিংবা যা না পেলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তার জন্য আমাদের কাঙালপনার অবধি নেই।

দিলীপকুমারের সাঙ্গীতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধ করি এই যে, তিনি বাঙালী সঙ্গীতকারকে আত্মসচেতন হতে শিক্ষা দিলেন, তাঁর চোখের সামনে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক যা করেছেন, দিলীপকুমার বাংলা গানের ক্ষেত্রে ঠিক সেই জিনিসটিই কার্যকরী করতে চেয়েছেন। একজন ভারতীয় চিত্রকরদের মন থেকে পাশ্চাত্ত্য চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির মোহ মুছে ফেলে তাকে স্বদেশীয় চিত্রকলারীতির অভিমুখী করে তুলেছেন; অন্যজন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দাসমনোভাবপ্রসূত ব্যর্থ অনুকরণ-প্রচেষ্টা ত্যাগ করে বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীকে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন। দুয়েরই লক্ষ্য আত্মবিস্মৃতির গ্লানি থেকে স্বদেশবাসীকে মুক্ত করা।

দিলীপকুমারের আর একটি প্রশংসনীয় দিক তাঁর অনমনীয় ওস্তাদি-বিরোধিতা। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নি, বরং তা উত্তরোত্তর কঠোরতর হয়েছে। ওস্তাদজনোচিত গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও শিক্ষাহীনতা তাঁর শিক্ষিত পরিমার্জিত মনকে আঘাত করবে এটা সহজেই বোঝা যায়। ওস্তাদী গানের কুশলতা তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু ওস্তাদী আবহাওয়া তিনি কোনও দিন বরদাস্ত করতে পারেন নি। বেশির-ভাগ ওস্তাদ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূঢ়ই শুধু নন, তাঁদের মূঢ়তার অহঙ্কার-টুকুও গগনস্পর্শী। শিক্ষিতের প্রতি তাঁদের অসহিষ্ণুতা, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা অশোভনরূপে প্রকট : আধুনিক রুচিবান প্রগতিশীল ভদ্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাঁদের মনে কেমন যেন একটা সহজাত হীনতাবোধ ও বিদ্বেষ আছে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের এইরূপ মনোভাব তাঁদের হাতে সঙ্গীতকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে এ বিশ্বাস আর যারই থাকুক দিলীপকুমারের অন্ততঃ নেই। এবং মোটামুটি তাঁর সন্দেহটুকু অভ্রান্ত। ১৯২৪ সনে দিলীপকুমার সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন শুধু ওস্তাদদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার জন্য। পরেও তিনি ওস্তাদদের কাছে থেকে জানবার সুযোগ পেয়েছেন অনেকবার। দেখেশুনে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, বেশির-ভাগ ওস্তাদ কেবল পুরাতনের জাবর কেটে চলেছেন ; নতুন সৃষ্টির তাগিদ তাঁদের মনে নেই, তার সামর্থ্যও তাঁদের নেই। সঙ্গীতসাধনার নামে তাঁরা সঙ্গীতে পৌনঃপুনিকতার রাজত্ব চালাচ্ছেন—থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ের রাজত্ব। ওস্তাদদের মধ্যে কণ্ঠের যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায় এবং যার কথা ভাতখণ্ডেজী দিলীপকুমারকে আলাপচ্ছলে কয়েকবার বলেছেন, সেটা নিছক ঘরানার সংস্কার ও অভ্যাসের সুফল, তাকে কিছুতেই উচ্চস্তরের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার লক্ষণ মনে করা যায় না। দিলীপকুমারের এই মতে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী যে, ওস্তাদদের যা কিছু দেবার ছিল তা তাঁরা থলে ঝেড়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে আর আশা করবার কিছু নেই। নব নব সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পথ-পরিক্রমা শেষ হয়ে গেছে ; এখন শুধুই তার পুরানো পথ মাড়ানো চলছে। দিলীপকুমারের ওস্তাদি-বিরোধিতার মধ্যে সঙ্গীতকে মধ্যযুগীয় মনোভাবমুক্ত করার বলিষ্ঠ আহ্বানধ্বনি নিহিত রয়েছে ; আশা করি সেই আহ্বানে প্রত্যেক শিক্ষিত সঙ্গীতরসিক সাড়া দেবেন।

দিলীপকুমারের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল বাংলা গানে সুর-বিকাশের স্বাধীনতা স্বীকার। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেব দৃষ্টিভঙ্গি আর দিলীপকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘোরতর পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সঙ্গীতের নজীরে বাংলা গানের সুরকে গোড়াতেই নির্দিষ্ট করে দেবার পক্ষপাতী ; কেউ তাঁর সুর-দেওয়া গান নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী যেমন তেমন ভাবে গা'ক এ তিনি সমর্থন করতেন না। তাঁর গানের উপর তিনি স্বাধীনতার 'স্টীমরোলার' চালাতে নিষেধ করেছিলেন তার অর্থ এই যে, তাঁর বাঁধাধরা সুরের কাঠামো কারও হাতে বিকৃতিপ্রাপ্ত হোক এটি তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অকৃত্রিম অনুরাগী হাওয়া সত্ত্বেও বলতে

আমরা বাধ্য যে, ভারতীয় সঙ্গীতে ইউরোপীয় সঙ্গীতের এই সংস্কার প্রবর্তনের ফলে শুভ যত না হয়েছে তার চেয়ে অশুভ বোধ করি বেশী হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কের স্বাধীনতা নিতান্ত সঙ্কুচিত; সেখানে সুরকারের কৃতিত্বটুকু মাত্র অবিসম্বাদী, গায়ক অথবা গায়িকা নিছক যন্ত্রমাত্র। কবি যে সুর বেঁধে দিয়েছেন তার থেকে এক পা এদিক-সেদিক হবার যো নেই, পূর্বনির্ধারিত সুরের গতিপথটুকু অনুসরণ করে চলতেই হবে। এইরূপ পর-নির্ভরতার আবহাওয়ার মধ্যে গায়ক-গায়িকার স্বাধীনতা প্রতিপদে ব্যাহত না হয়ে পারে না।

দিলীপকুমারের গানে এই পদ্ধতির বিরোধিতা চোখে পড়ে। তিনি বলতে চান যে, সুরবিকাশের স্বাধীনতা ভারতীয় সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের ভিতর একটি মস্ত জায়গা জুড়ে আছে, তাকে খাট করলে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করা হয়। এদেশে সুরকারের নাম কেউ মনে রাখে না তার নিহিতার্থ এই যে, সুরকার সুরযোজনা করেই খালাস, তার পরের করণীয় গায়কের, তখন আর সুরকারকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই। গায়কের প্রতি অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ করতে গিয়ে আমরা সুরকারের মর্যাদা কথঞ্চিৎ পরিমাণে খাট করেছি সন্দেহ নেই, তা হলেও এ কথা মানতেই হবে যে, আমাদের দেশে গায়ক সুরকারের তুলনায় বরাবর সমধিক মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, গায়কের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা এখানে অনধিকারচর্চার সামিল। গায়ক সুরের মূল কাঠামোটি বজায় রেখে যদৃচ্ছা সুরকে লীলায়িত করে তুলবেন, তাঁর শিল্পিসত্তার অবাধ স্ফুরণের মধ্য দিয়েই শুধু গানের মহিমান্বিত রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব—এই সংস্কার অদ্যাবধি এদেশে বলবৎ।

দিলীপকুমার এই সংস্কারে বিশ্বাসী, তাই তিনি শিল্পীকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী। গায়কের ঐতিহ্যগত সহজ অধিকারকে খাট করতে তিনি নারাজ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নিষেধ সত্ত্বেও। আমার মনে আছে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর আগে বেলঘরিয়ার 'গুপ্তনিবাসে' দিলীপকুমার এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সামনে তাঁর "হে ক্ষণিকের অতিথি" নামক ভৈরবী সুরের বিখ্যাত গানটি নিজের ঢঙয়ে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। দিলীপকুমার তাঁর অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী তাতে আখর যোজনা করেছিলেন এবং আরও নানা

ভাবে তাকে নিজের খেয়াল অনুযায়ী বিকশিত করে তুলেছিলেন। গানটি যে শুনতে মন্দ লেগেছিল তা বলতে পারি নে, তবে কবি সেই গান শুনে দিলীপকুমারের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে একটু মুচকি হেসেছিলেন মাত্র। অর্থাৎ গানটি তিনি অনুমোদন করেন নি। দিলীপ-কুমারের কণ্ঠের খুব বেশী অনুরাগী যদিও আমি নই, তা হলেও নীতি হিসাবে তৎপ্রচারিত গায়কের স্বাধীনতার আদর্শে আমি আস্থাবান, এবং আমার মনে হয় ভারতীয় গায়কের স্বরবিকাশের স্বাধীনতা হরণ করে তাকে গাইতে বলা আর পাখা কেটে নিয়ে পাখিকে উড়তে বলা একই ধরনের অত্যাচারিসুলভ রসিকতা।

সুরযোজনায় বাংলা গানে দিলীপকুমার ইউরোপীয় ভঙ্গি প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে এই প্রচেষ্টাকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। দিলীপকুমার অনেকদিন বিদেশে ছিলেন এবং অভি-নিবেশের সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। তাঁর পক্ষে তাই বাংলা গানে ইউরোপীয় প্রভাব আনতে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং আনাড়ীকে এই কাজ করতে না দিয়ে তাঁর মত বিশেষজ্ঞের হাতেই এ কাজের ভার ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ইউরোপীয় সুরের ভঙ্গিতে বাংলা গান রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে কতকটা সফলও হয়েছিলেন। তিমিরবরণ ঐকতান বাদনের ক্ষেত্রে এই দিকে চেষ্টা করেছেন। এঁদের সকলেরই প্রয়াস জয়যুক্ত হোক, প্রত্যেক অগ্রসরপন্থী সঙ্গীতরসিক তা কামনা করবেন। দিলীপকুমারের রুশ সুরের ভঙ্গিতে রচিত "বুলবুল মনফুল সুরে ভেসে", কিংবা "অকূলে সদাই চল যাই ছুটে ভাই" কিংবা "Ave Maria" সুরের অনুসরণে বাংলা গান বাংলা গানের সুরকে নিঃসংশয়িতরূপে সমৃদ্ধ করেছে, সংরক্ষণশীলদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই এ কথা বলব।

সুরযোজনায় তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল একই গানে বিভিন্ন সুরের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ, বিশেষ করে কিছুদিন যাবৎ তাঁর গানে কীর্তনাঙ্গ সুরের সবিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেমন অনেক গানেই বাউলের রস ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, তেমনি দৈলীপ ঢঙের গানে কীর্তনের বসটুকু সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কীর্তনের ধরনে বাংলা গানে আখর যোজনা

তাঁর আরেকটি অভিনব প্রচেষ্টা। দিলীপকুমার গাইবার সময় অনেক গানেই আখর যোজনা করেন দেখতে পাই, তবে মনে হয় দৈলীপ আখরগুলি একই কথা বা একই পঙক্তির রূপান্তরিত পুনরাবৃত্তি মাত্র, তাতে সুরের নব নব রূপ প্রকাশ পায় না। দিলীপকুমার কবি-সাহিত্যিক এবং স্বয়ং গীতরচয়িতা বলে তাঁর পক্ষে এই আখর সংযোজনা হয়ত মোটেই আয়াসসাধ্য নয়, কিন্তু দেখতে হবে তাতে সুরের নব নব আবেগ ফুটে ওঠে কিনা। আমাদের মনে হয় ফোটে না—আখরগুলিতে বাণীর রস মাত্র পাওয়া যায়, সুরের রস নয়। আখর যোজনার উপর অত্যধিক জোর না দিয়ে দিলীপকুমার যদি সুরকে নব নব রূপে বিকশিত করার চেষ্টা করতেন তা হলে তাঁর গান আরও অনেক সমৃদ্ধ হতে পারত।

দিলীপকুমার আরও কয়েকটি দিক দিয়ে বাংলা গানে অভিনবত্বের অবতারণা করতে চেয়েছেন, তার ভিতর অত্যধিক তালের শাসন থেকে বাংলা গানকে মুক্ত করবার প্রয়াস সত্যই প্রশংসনীয়। তালের শ্বাসরোধ-কারী পীড়ন থেকে বাংলা গানকে অব্যাহতি দিতে না পারলে বাংলা গানের স্বাধীন বিকাশ শুধু কথার কথা হয়ে থাকবে। তালপ্রকরণের এই জুলুমের দিকটি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, পরে দিলীপকুমার সেই সূত্রটি তুলে ধরেন। দুঃখের বিষয়, এই নিয়ে আর আজকের দিনে তেমন কোন আন্দোলন হচ্ছে না। কেবল সুপরিচিত সঙ্গীত-প্রাবন্ধিক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের কোন কোন লেখায় এ বিষয়ের আভাস পাচ্ছি। তালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় দিলীপকুমারের পুরাতন উৎসাহই বা কোথায় গেল?

সুরযোজনায় দিলীপকুমার সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছেন তাঁর পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের দৃষ্টান্তের দ্বারা। আবার এই তিনজনের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুরের ভঙ্গিই বোধ করি তাঁর গানের কাঠামোয় অত্যধিক রেখাপাত করেছে। দিলীপকুমারের গানে টপ্পার ঢঙে তানবিস্তারের যে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় তার মূলে রয়েছে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব। দিলীপকুমারের সাঙ্গীতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কিছুদিন কাজী নজরুলের প্রভাবও পড়েছিল। কাজী সাহেবের গজলগুলির ব্যাপক প্রচারণা ও জনপ্রিয়তার পিছনে দিলীপকুমারের

সক্রিয় সহযোগিতা নানাভাবে কাজ করেছে। পরে তিনি কিছুকাল সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সংস্পর্শে এসে তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দিলীপ-কুমারের সেই সময়কার কোন কোন সুরে অলক্ষ্যে হিমাংশু দত্তের প্রভাব এসে পড়েছে। তবে এ সমস্ত বলার পরও এই বলতে হয় যে, দিলীপকুমারের প্রতিভা একান্তভাবেই তাঁর স্বকীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতকারদের মিলিত প্রভাব তিনি এমনি স্বকীয় ভঙ্গিতে আত্মসাৎ ও জীর্ণ করেছেন যে এ থেকে যা গড়ে উঠেছে তা একান্ত ও অবিসম্বাদী দৈলীপ ঢঙ ; আর কিছুর সঙ্গে তাকে এক করে দেখা চলে না।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, দিলীপকুমার সুরকার হিসাবে যত বড়, গায়ক হিসাবে তত বড় নন। ধ্রুপদাঙ্গ গান টপ্পার ঢঙয়ের বাংলা গান কীর্তনাঙ্গ গান বা অন্য যে ধরনের গানই হোক না কেন, তাঁর কোন গানেই সুরের আমেজ তেমন পাওয়া যায় না। সুরের স্থায়িত্বের প্রতি তিনি দৃশ্যতঃ সম্যক্ অবহিত নন। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গায়কদের আর যত দোষই থাকুক এই অভিযোগ অন্ততঃ তাঁদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা চলে না যে তাঁরা সুরেলা নন। কিন্তু দিলীপকুমারের গানের এই দিকটায় শৈথিল্য চোখে পড়ে। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর রাগসঙ্গীত সাধনার বুনিয়াদ তেমন পাকা নয়। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, দিলীপকুমার ইউরোপে থাকা কালে বহুদিন ওদেশের ভঙ্গিতে কণ্ঠসাধনা ও কণ্ঠমার্জনা করেছেন, যার ফলে ভারতীয় গানের সুরবিকাশের উপযোগী আঁশ তাঁর গলায় নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে স্বর নিক্ষেপ করেন এবং চড়ার দিকে কৃত্রিম উপায়ে কণ্ঠকে সঙ্কুচিত করে আনেন। এতে আর যাই হোক ভারতীয় সুরের ধ্যান-রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না, তা ভারতীয় প্রথার সুরজ্ঞমাত্রই স্বীকার করবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলি দিলীপকুমারের কণ্ঠে চমৎকার ফোটে তার একমাত্র কারণ এই যে, ওই গানগুলির বাঁধুনিতে ইউরোপীয় সুরের ঢঙ প্রবল। দিলীপকুমারের কণ্ঠ তাতে অধিক স্ফূর্তি পায় এবং স্বভাবতঃই সেজন্য অন্যান্য গানের চাইতে জাতীয় সঙ্গীতে তিনি সমধিক রস ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

দিলীপকুমারের গানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তাঁর গলায় সূক্ষ্ম 'কাজ' অত্যন্ত কম। সারেগামা সাধার ভঙ্গিতে সপ্তকব্যাপী আরোহাবরোহ-

ক্রমে তান দেওয়া ছাড়া তাঁর কণ্ঠের আর কোনরূপ নৈপুণ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে টপ্পার ঢঙয়ে ভাগে ভাগে বিন্যস্ত যে সমস্ত আংশিক তান দেন তা নিতান্ত অভ্যাসগত কৃত্রিম ব্যাপার, কণ্ঠের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাদের বলা চলে না। তাঁর হাত থেকে হারমোনিয়মটি সরিয়ে নিলেই এই অভিযোগ যথার্থ কি অযথার্থ তার প্রমাণ মিলতে পারে। তান-প্রয়োগে তিনি বরাবর এক বিশেষ ধরনের তানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তার অর্থ, এই তান তাঁর কণ্ঠের গঠনের অনুসারী, অন্যবিধ তান তাঁর গলায় আসে না।

তৃতীয় অভিযোগ, তিনি গানে মাত্রাজ্ঞান মেনে চলেন বলে মনে হয় না। বিশেষ, আশ্রমপন্থী হওয়ার পর থেকে তাঁর এই আতিশয্যের প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তাঁর "বৃন্দাবনের লীলা-অভিরাম" নামক সুবিখ্যাত গানটি এ কথার সবসেরা প্রমাণ। এ গানের রূপায়ণে দিলীপ-কুমারের বৈচিত্র্যপ্রয়াসী সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি তাঁর আতিশয্যপ্রীতিও পরিলক্ষণীয়। এ গানটির শুরু হয়ে আর থামার নাম নেই। ভক্তিবাদের অতিরিক্ত প্রাবল্যে তিনি সব রকমের গানকে প্রায় সাধনসঙ্গীতের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। তাঁর গানে আবেগের অংশ নব্বুই, সুরের ভাগ দশ। আধুনিক গানে কীর্তনের ঢঙ প্রবর্তন করা যেতে পারে, কিংবা তাকে সর্বাংশে কীর্তনাঙ্গ করে তোলাতেও বাধা নেই, কিন্তু সমস্ত গানকেই ভজন আর সাধনসঙ্গীত করে তুলতে হবে এটা শ্রোতার উপর অত্যাচার বৈ আর কী?

সুরকার হিমাংশু দত্ত

সুরকার হিমাংশু দত্ত, 'সুরসাগর', বাংলা গানকে কোন্ দিক দিয়ে কী ভাবে কতদূর সমৃদ্ধ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অনেকদিন আগেই রচিত হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হয় নি তাতেই বোঝা যায়, আমরা শুধু গান শুনতে ভালবাসি, গানের মূল্যবিচারে তেমন উৎসাহ পাই নে। এখনও গান এদেশে কেবলমাত্র কানের জিনিস হয়ে আছে, উপযুক্ত অনুভবের সাহায্যে তাকে যে মর্মস্থ করা দরকার, সেটা কারুর মনে হয় না। বরং বেশ বোঝা যায়, অনেকে তা রীতিমত অপছন্দই করেন। সে যাই হোক, হিমাংশু দত্তর জীবিতকালে যা সম্ভব হয় নি তাঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে কেউ সে কাজ করবেন, এরূপ একটি আশা মনে উদিত হয়েছিল। কিন্তু যতগুলি আলোচনা চোখে পড়ল তাতে হিমাংশু দত্তর কোষ্ঠীবিচারটাই প্রধান হয়ে উঠেছে, তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে সেখানে জীবনবৃত্তান্তটাই প্রকট। বিষয় নয়, বিষয়ের বর্ণসূচী। আর যদিবা কেউ তাঁর সঙ্গীতের মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন, সেটা মুখ্যতঃ সিনেমার সঙ্গে জড়িয়েই করেছেন। কিন্তু হিমাংশু দত্তর আসল পরিচয় সিনেমায় নয়, সিনেমার গানে তাঁর সৃষ্টিকুশলতার ভগ্নাংশমাত্র প্রকাশ পেয়েছে।

'সুরসাগর' আজন্ম সুরের পূজারী। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গানের প্রতি তাঁর এই প্রীতি ও নিষ্ঠা আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়। তাঁদের গৃহের আবেষ্টনীতেই এই প্রভাব ছিল। এক এক পরিবারে যেমন এক একটি বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পায়, এঁদের পরিবারে তেমনি ছিল সঙ্গীতের প্রবণতা। বালক হিমাংশুকুমারের মধ্যে সেই প্রবণতা গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। মাতার নিকট সঙ্গীতে তাঁর হাতেখড়ি। পরবর্তী জীবনে হিমাংশু দত্ত স্বরলিপি প্রণয়নে ও স্বরলিপি উদ্ধারে এত যে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তার প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর গৃহের আবহাওয়া থেকে লাভ করেছিলেন। তাঁর বড়দাদা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দত্ত একজন কৃতী সঙ্গীতবেত্তা—যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর নৈপুণ্য উচ্চশ্রেণীর। সঙ্গীতের

ঔপপত্তিক (Theoretieal) দিকেও তাঁর জ্ঞান অল্প নয়। এহেন যোগাযোগের ফলে খুব অল্প বয়সেই হিমাংশু দত্তর সঙ্গীত-প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিল।

কিন্তু বাঙালী ছেলেরা সাধারণতঃ যে পদ্ধতিতে গান শেখে হিমাংশু দত্ত ঠিক সেভাবে গান শেখেন নি। এই দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার পদ্ধতিকে প্রায় একক বলা চলে। আমরা ছোটবেলায় যখন গান গাইতে শিখি, গান শিখব বলে শিখি না; আপনা থেকেই গান আমাদের গলায় ভর করে। বয়সটাই তখন এমন যে গান শোনামাত্র সুরের জাদু মনকে আবিষ্ট করে—পরের গলার গান অবিলম্বে এবং অবলীলাক্রমে নিজের গলায় উঠে আসে। ওই অধ্যায়টিতে স্বতঃস্ফূর্তির ভাব প্রবল, নির্বিশেষ আবেগই তখন আমাদের মুখে সুর জোগায়। কিন্তু আরও যখন বড় হই তখন আর এ ভাবটি থাকে না—তখন মনে হয় গান 'শিখব', সেটা বিধিমতে শিখব, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে শিখব। আর সত্যি, আমরা তখন ওস্তাদের কাছে 'নাড়া' বেঁধে, সাকরেদ হয়ে, আদাজল খেয়ে লেগে যাই রাতারাতি ওস্তাদ হবার জন্য। সবাই যে হই তা নয়, তবে কেউ কেউ হন। কাজেই দেখা যায়, সঙ্গীতশিক্ষার এই অধ্যায়টিতে চেষ্টার ছাপ খুব সুস্পষ্ট—আর তা নিয়ন্ত্রিত হয় একটি সক্রিয় ইচ্ছার দ্বারা।

হিমাংশু দত্তর ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। তাঁর বেলায় প্রক্রিয়াটা ঘটেছিল উল্টোভাবে। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা প্রথমে সক্রিয় সাধনার খাত বেয়ে পরে আবেগাকুলতার সমুদ্রে এসে মিশেছিল। নিষ্ঠা ও অভিনিবেশের দ্বারা সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক রূপটিকে প্রথমে আয়ত্ত করে পরে তিনি সঙ্গীতের রসের দিকটিতে মজেছিলেন। সংস্কৃতে যেমন সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি পাঠের আগে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়নের রীতি আছে, এ-ও অনেকটা তেমনি। হিমাংশু দত্তর প্রকৃতিতে সঙ্গীত সহজাত হলেও গোড়ায় তিনি সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক দিকটিকে আয়ত্ত করবার দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন—তারই ফলে অতি অল্প বয়সে রাগ-রাগিণী ও স্বরলিপির জ্ঞান তাঁর অধিগত হয়েছিল। অতি কিশোর বয়সেই তিনি যে-কোন প্রচলিত রাগ-রাগিণীর ঠাট, জাতি, পকড়, বাদী, বিবাদী, সম্বাদী; রাগটি ঔড়ব কি খাড়ব জাতীয়, উত্তরাঙ্গ কি

পূর্বাঙ্গ তা অনায়াসে বলে দিতে পারতেন—আর স্বরলিপি ছিল তাঁর নখদর্পণে। ভাতখণ্ডেজীর 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি—ক্রমিক পুস্তকমালিকার' ছয় ছয়টি ভল্যুম সর্বদা তাঁর পাশে পাশে ফিরত—তিনি কোনপ্রকার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে মুখে মুখেই স্বরলিপি চটপট গলায় তুলতে পারতেন; পুঁথির স্বরসঙ্কেত মুহূর্তেকে তাঁর কণ্ঠে গান হয়ে বেরোত। ইউরোপীয় সঙ্গীতেই শুধু এই ধরনের শিক্ষার রেওয়াজ আছে, আমাদের দেশে এ জিনিস অতি বিরল। ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত লক্ষ্ণৌর ম্যারিস কলেজে অবশ্য এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। তাতে আর কিছু হোক আর না হোক স্বরজ্ঞানের ভিত্তিটি যে খুব পাকা হয় তাতে সন্দেহ নেই।

হিমাংশু দত্তর মন ছিল বিজ্ঞানীর মন। গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তিনি তাঁর সঙ্গীতসাধনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি অটুট ছিল। আমাদের দেশে সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের মধ্যে কিন্তু এ জিনিসটি বড চোখে পড়ে না—তাঁদের একমাত্র পুঁজি আবেগ আর প্রেরণা। আবেগ আর প্রেরণা ভাল জিনিস, বিশেষতঃ কলাশিল্পের ক্ষেত্রে এ দুটি বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আবেগকে সম্বল করে চলাও ভাল নয়। এতে গায়ক বলে নাম কিনতে হয়ত আটকায় না—কিন্তু সঙ্গীতসাধনার ভিত্তিটি চিরকাল কোথাও না কোথাও কাঁচা থেকে যায়। সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা এইদিকে একটু মন দিলে তাঁরা সবিশেষ উপকৃত হবেন বলে আমাদের ধারণা।

তাই বলে এ যেন কেউ না মনে করেন যে, হিমাংশু দত্ত শুধু স্বরলিপি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সুরের বহিরঙ্গ সাধনাতেই তিনি খুশী ছিলেন না—মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার সাধনাও তাঁর ছিল। আর সেই সাধনাতেও তিনি অনুরূপ সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। গোড়ায় তিনি সুরের বহিরঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করেছিলেন সত্য, কিন্তু ক্রমেই তাঁর কণ্ঠ আবেগে নুয়ে আসতে লাগল। সুরের বিশুষ্ক দেহে দেখা দিল রক্ত-মাংস, এল প্রাণ। সা-রে-গা-মা-র বিচ্ছিন্ন রূপ ঘুচে গিয়ে দেখা দিল সুরের সমগ্র রূপ—বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ। যাঁরা হিমাংশু দত্তর প্রথম যৌবনের গান শুনেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। তাঁর সে

সময়কার কণ্ঠের জাদু আজও আমাদের মনে আছে। রবীন্দ্রগীতির সরল সৌন্দর্য, আধুনিক সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, আর ভজনের আবেগ—সবই তাঁর কণ্ঠে অপরূপ মহিমায় ফুটে উঠত। পরে অবশ্য তাঁর কণ্ঠ ক্রমেই ম্লান হয়ে এসেছিল—কিন্তু তা এইজন্য নয় যে তিনি আর গাইতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গীতসাধনার আবেগ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল—গান গাওয়া থেকে উত্তরিত হয়ে তিনি চলে এসেছিলেন সুর বাঁধার তীরে। অপরের কণ্ঠে সুর যোগাবার ভার নিয়েছিলেন তিনি। কাজেই কণ্ঠচর্চার আর সময় ছিল না। নূতন নূতন সুর তৈরির নেশা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, এই নূতন আনন্দ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করে ফেলেছিল বলা চলে। সুর কণ্ঠ ছেড়ে তখন তাঁর মগজে বাসা বেঁধেছে, মগজ থেকে হৃদয়ে। ফলে তাঁর কণ্ঠের অভিব্যক্তি আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

হিমাংশু দত্ত, 'সুরসাগর', প্রধানতঃ সুরকার, তারপর অন্য কিছু। তাঁর 'সুরসাগর' উপাধি এই দিকটিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে। বস্তুতঃ, প্রায় তরুণ বয়সেই যখন তাঁকে সারস্বত সমাজ থেকে 'সুরসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়, আমরা আনন্দিত হয়েছিলুম কিন্তু বিস্মিত হই নি। সুরযোজনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় তার আগেই পেয়েছিলুম। প্রথম যে গানটিতে তিনি সুরকরণ করেছিলেন সেটি একটি গজল—লোকান্তরিত অজয় ভট্টাচার্যের রচনা। "হাস্নুহানা আজ নিরালা ফুটিলি কেন আপন মনে।" এর পর একাদিক্রমে বহু গানে তিনি সুরযোজনা করেছেন। অজয় ভট্টাচার্য ও সুবোধ পুরকায়স্থ ছিলেন তাঁর গানের পদকর্তা—তাঁরা পদ রচনা করে দিতেন, তিনি নিরালায় বসে তাতে সুরযোজনা করতেন। আর সেই গান তাঁর নিজের কণ্ঠে, জ্ঞান দত্তর (মেগাফোন রেকর্ড খ্যাত) কণ্ঠে ও কিছু পরবর্তী কালে কুমার শচীন দেববর্মনের কণ্ঠে ক্রমাগত গুঞ্জরিত হয়ে ফিরত। হিমাংশু দত্তর কুমিল্লার আবাসগৃহ সঙ্গীতের একটি মধুচক্র ছিল—তার সান্ধ্য বৈঠকগুলিতে সুরের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বয়ে যেত। মাঝে মাঝে বাইরে থেকেও গুণীজন তাঁদের গৃহে সমাগত হতেন। শান্তিনিকেতনের শ্রীক্ষিতি-মোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় যখনই কুমিল্লা যেতেন, হিমাংশু দত্তদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির বন্ধন ছিল।

হিমাংশুকুমার বয়সে ক্ষিতিমোহনের পুত্রের তুল্য ছিলেন—তা হলেও তাঁদের ভিতর একটা স্নেহসিক্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে এসেই হিমাংশু দত্ত প্রথম কবীর, দাদু, সুরদাস প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকদের দোঁহা ও ভজন গানের অপরূপ মাধুর্যের পরিচয় পান। পরবর্তী জীবনে ক্ষিতিমোহন যেখানেই ধর্মীয় ব্যাখ্যার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন, হিমাংশু দত্তকে সহচররূপে নিতেন তাঁর কথকতায় সুর জোগাবার জন্যে। হিমাংশু দত্তর ভজন গান শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যানের পরিপূরক ছিল। রেডিয়োতেও এই যোগাযোগ অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন।

'সুরসাগর' কোন ধরাবাঁধা ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, ওস্তাদদের অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা তাঁর ভাল লাগত না। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তিনি আজন্ম স্বাধীনচারী ছিলেন —পারতপক্ষে তথাকথিত ওস্তাদের ছায়া মাড়াতেন না। এ রকম হবার আরও একটি কারণ এই যে, ছোটবেলা থেকেই ভাতখণ্ডেজীর শিক্ষা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ভাতখণ্ডেজীর প্রতি ওস্তাদদের বিমুখতা সর্বজনবিদিত। সেটাও অজ্ঞাতসারে তাঁর মনকে ওস্তাদদের প্রতি বিরূপ করে থাকবে। ওস্তাদদের একদেশদর্শিতা ও আত্যন্তিক সংরক্ষণ-কামিতা তিনি আদপেই সহ্য করতে পারতেন না। এ ছাড়া শান্তিনিকেতন ও বিশেষ করে রবীন্দ্রগীতির প্রভাবও তাঁর জীবনে অসামান্য। কবির সঙ্গীতের আদর্শ খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনকে আলোড়িত করে তুলেছিল। হিমাংশু দত্ত রবীন্দ্রগীতির একজন গভীর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কবির কত গানই যে তাঁর জানা ছিল! জানা ছিল মানে লোকমুখ থেকে শুনে জানা নয়—নির্ভুলভাবে জানা, অবিকৃতভাবে জানা। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রগীতির সুর তাঁর সুরযোজনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মোটকথা, ওস্তাদপন্থী গতানুগতিকতার প্রতি বরাবর তিনি বিরূপ ছিলেন। ধরাবাঁধা শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর পরিশীলিত পরিমার্জিত মনের ঝোঁক ছিল অবাধ অথচ স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত আত্মবিকাশের দিকে। হিমাংশু দত্ত শুধু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি একই কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল বিচারবোধ দ্বারা দীপ্ত, রুচি ছিল মার্জিত। দুঃখের বিষয়, এই মার্জিত রুচি আমাদের দেশে

তথাকথিত সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেরই নেই—শিক্ষায় যেমন তাঁরা পশ্চাদ্‌গামী, রুচিতেও তেমনি অমার্জিত। এদেশে সঙ্গীত যে শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে অগ্রগামী হতে পারছে না তার একটা কারণ বোধ করি এই অবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে।

'সুরসাগর' গজল দিয়ে সুরযোজনার শুরু করেছিলেন, পরে আর তাঁকে বড় একটা গজল সুর রচনা করতে দেখা যায় নি। তিনি হাল্কা সুরে ও মুখ্যতঃ দাদরা ছন্দে এক সঙ্গে কতকগুলি গান রচনা করলেন। আদ্ধা ও হালিয়া কার্ফার ছন্দেও কিছু কিছু সুর রচনা করেছিলেন। তাঁর এই যুগের সুরগুলির মধ্যে "তার কাজল নয়নে ছিল", "খুঁজে দেখা পাইনে যাহার", "ওগো মরমিয়া", "আজি এ মাধবী রাতে", "জানি না সেই অজানারে", "ও বীণকার", "আজ ফাগুনের প্রথম দিনে", "এলো কোন্ চৈতী হাওয়া গন্ধ-উতল বনে বনে", "আবেশ আমার যায় উড়ে কোন্ ফাল্গুনে", "সে কোন নব ফাগুন প্রাতে" প্রভৃতি গানের সুরের নাম করা যায়। এর পরের অধ্যায়ে তাঁর সুরে চটুলতার ভাব একটু কমে আসে; সেই স্থলে দেখা দেয় রবীন্দ্রগীতিসুলভ স্থির সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন চারটি কলি থাকে, হিমাংশু দত্তর এ যুগের সুরগুলিও তেমনি চারটি কলিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসল মাধুর্য যেমন তার সঞ্চারীতে, হিমাংশু দত্তও তাঁর গানের সঞ্চারীগুলিতে তাঁর হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য নিঃশেষে ঢেলে দিলেন। তাঁর "আজি আমারি কথা", "ঝরা চামেলি বনে", "আজি বাদল রাতে", "উষার উদয়ক্ষণে" প্রভৃতি গানের সুরই এ কথার প্রমাণ। এ সময়ে তিনি কিছু কিছু ঠুংরী ভাবান্বিত সুরের গানও তৈরি করলেন। যেমন, "বসন্ত তোর লীলা কি আজ হল অবসান", "তব স্মরণখানি", "ফাগুন আজি কেন" প্রভৃতি।

এর পর তাঁর ঝোঁক গেল হিন্দী খেয়াল ভেঙে বাংলা গান রচনার দিকে। পর পর অনেকগুলি খেয়াল তিনি বাঁধলেন—কিন্তু তাঁর সুরের গুণে সেগুলির আর হিন্দুস্থানী চেহারা রইল না—তাদের ভিতর খাঁটি বাংলা সুরের আদল এসে পড়ল। বাংলা গানের সুর হিন্দুস্থানী সুরকে আত্মস্থ করে তাকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করল। "যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে (গান্ধার)"; "আলো-ছায়া দোলা উতলা

ফাগুনে (বাহার)", "মম মন্দিরে এলে কে তুমি (আড়ানা)", "মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয় (মালগুঞ্জ)" প্রভৃতি গানগুলি এই পর্যায়ের। তাঁর বিখ্যাত সুর "নতুন ফাগুনে যবে" অবশ্য হিন্দুস্থানী গান ভেঙে করা নয়—তবে তার ভিতর হিন্দুস্থানী সুরের বাঁধুনি খুব স্পষ্ট। রাগেশ্রী রাগের উপর সুরটির ভিত্তি—তবে বাংলা সুরের নিজস্ব জারকরসে জীর্ণ হয়ে তার চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। তাঁর দুর্গা সুর ভেঙে করা "ফাগুনের সমীরণ সনে", তিলক-কামোদ সুরে "আজি মধু রাতে কার বাঁশী বাজে হায়", তিলঙ সুরে "বাজে রিণিঝি ঝিনি তাহার নূপুর ধ্বনি" ও "জাগি রজনী", জয়জয়ন্তী রাগে "ফিরে এলো শ্রাবণ ধারে" প্রভৃতি গানগুলি সম্বন্ধেও এ কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। সুর হিসাবে তাঁর "ছিল চাঁদ মেঘের পারে" গানটি আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি পুষ্পচন্দ্রিকা রাগের ভিত্তিতে রচিত এবং এ রাগ হিমাংশু দত্ত নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি কিছু কিছু নাচের সুরও তৈরি করেছিলেন। যেমন "বল্ হিম ঋতু বল", "ধীরে ধীর চরণে", "ঝরানো পাতার পথে"। এগুলির ভিতর ইউরোপীয় সুরের ধাঁচ খুব স্পষ্ট।

এর পর তিনি সঙ্গীতপরিচালকরূপে সিনেমায় যোগদান করেন। এটা যে তিনি ইচ্ছার বশে করেছিলেন তা নয়, জীবিকা সংস্থানের তাগিদই ছিল তার ভিতরের কথা। তাঁর সিনেমার অনেক গানই জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু আমরা বলব যথার্থ 'সুরসাগর' সে-সব গানে তেমনভাবে উপস্থিত নেই। পূর্বেকার অধ্যায়ের গানে তাঁকে আমরা তাঁর যথার্থস্বরূপে যেমন ভাবে পাই, সিনেমার গানে তেমন ভাবে পাই না। তার কারণ সিনেমার সুরে বিভিন্ন দর্শকের বিভিন্ন রুচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুরযোজনার একটি মধ্যপথ উদ্ভাবন করে নিতে হয়। এতে যে সুরকে অবিকৃত রাখা আর সম্ভব হয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। দর্শককে খুশী করার পথ হল মধ্যপথ—সে পথ শিল্পীর পথ নয়। দর্শকদের (এবং সেই সঙ্গে প্রযোজককে) খুশী করবার জন্য সুরকে মাঝে মাঝে সাধারণের স্তরে নামিয়ে আনতে হয়ই, কিন্তু তা দিয়ে শিল্পীর বিচার হওয়া উচিত নয়। আর্থিক প্রেরণার বশে যে-কোন শিল্পীকেই বাস্তবের সঙ্গে কিছু না কিছু আপোষ-রফা করে চলতে হয়, সেটা তাঁর যথার্থ স্বরূপ নয়। সিনেমার গান দিয়ে তাই হিমাংশুকুমারকে বিচার

করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাঁর দান একেবারে অনুল্লেখ্যও নয়। "রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা" প্রভৃতি বহুলপ্রচারিত গানগুলিতে বিশেষত্ব অবশ্যই কিছু আছে। তাঁর এইসব গানে মিশ্রণের প্রক্রিয়া বড় স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ; ফল্গুধারার মত অন্তরালসঞ্চারী নয়। এতে গানগুলি অবশ্য খুব চটকদার দেখায়, কিন্তু তাদের ঐশ্বর্যের পুঁজি অপেক্ষাকৃত অল্প। সিনেমার সুর না হলেও তাঁর বিখ্যাত "তাজমহল" গান, "প্রেমের না হবে ক্ষয়", "চাঁদ ভোলে নাই চামেলিরে তার" প্রভৃতি গানগুলিকেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। "তাজমহল' গানটি সুরের দিক থেকে যেমনই হোক তার আবেদনটি গীতি-কবিতার। গানটির জনপ্রিয়তার মূল এইখানেই।

হিমাংশু দত্তর জীবনে সিনেমার অধ্যায় এক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই তিনি ভারতীয় সুরে পাশ্চাত্ত্য হার্মনির প্রয়োগ সম্বন্ধে সাগ্রহ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত ঐকতানবাদনের ভিতর সেই প্রচেষ্টার ছাপ ধরা পড়ে। এই পথে তাঁর একমাত্র সহগামী তিমিরবরণ ও রবিশঙ্কর। এদেশে আর কেউ Orchestration-এ Harmonics-এর রীতি প্রয়োগের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। গানের সুরেও ইউরোপীয় ঢঙে বৈচিত্র্য প্রবর্তনার প্রাথমিক চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বেঁচে থাকলে হিমাংশু দত্ত এই ক্ষেত্রে আরও অনেক মূল্যবান কাজ করে যেতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস।

সুরসাগর নতুন রাগিণীও তৈরি করে গেছেন। আধুনিক সুরকার আর কেউ এ বিষয়ে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন কি না সন্দেহ। তাঁর পূর্বোল্লিখিত পুষ্পচন্দ্রিকা রাগ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। রসজ্ঞরা এতে তাঁর সৃষ্টিকুশলতা, গভীর মার্গসঙ্গীত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হবেন।

হিমাংশু দত্তর সুরদানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষভাবে দুটি জিনিস আমাদের আলোচনা করা দরকার। এক, তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতে গভীর জ্ঞান; দ্বিতীয়, তাঁর মার্গসঙ্গীতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। ওস্তাদের কাছ থেকে ধরাবাঁধা নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ না করলেও ঘরে বসে তিনি ক্লাসিকাল গান সম্পর্কে দস্তুরমত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ দুয়ের সমন্বয়েই তাঁর সুর—অথচ তা রবীন্দ্রগীতিও নয়, ক্লাসিকাল গানের বাংলা সংস্করণও নয়। সে সুর নির্বিশেষে 'সুরসাগরের' সুর। তাঁর যে-কোন সুর শুনলে বলে দেওয়া

যেত এটি তাঁরই সুর—অন্য কারও নয়। সুরকারের পক্ষে এই স্বাতন্ত্র্যটুকু অর্জন করাই আসল। রবীন্দ্রনাথের পর অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, দিলীপকুমার, পঙ্কজ মল্লিক এবং হিমাশু দত্তর এই স্বাতন্ত্র্য ছিল—আর কোন সুরকারের মধ্যে এ জিনিস চোখে পড়ে না। হিমাশু দত্ত সুরযোজনায় নির্বিচার মিশ্রণ পছন্দ করতেন না। মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় তিনি রবীন্দ্রানুসারী পথ অনুসরণ করেছেন—সংযমের পথ, মিতব্যয়িতার পথ, অন্তরালের পথ। তাঁর মিশ্রণ বরাবর ঘোমটার আড়ালে চলত, প্রখর দিবালোকে স্পষ্ট উদ্ঘাটিত হতে ছিল তার নববধূর সঙ্কোচ। সিনেমায় প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত তিনি সেই সঙ্কোচকে কখনও পীড়িত করেন নি।

আমাদের দেশে সুরকারের মর্যাদা এখনও যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নি। গায়ক অথবা বাদককে নিয়েই আমাদের সবটুকু মাতামাতি—অথচ যিনি তাঁদের কণ্ঠে ও যন্ত্রে সুর জোগান তিনি এখনও পাদপ্রদীপের আড়ালেই রইলেন। ইউরোপে কিন্তু এর উল্টো। সেখানে Composer-এর যে সম্মান, Executant-এর সম্মান তার সিকির সিকিও নয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন, আমাদের দেশের সুরকারদের মধ্যে আত্ম-অবলুপ্তির (Self-effacement) প্রেরণা বড় প্রবল। তাঁরা নিজেরা মুছে যেতে রাজী, কিন্তু সুরগুলিকে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য রেখে যাওয়া চাই। কত রাগ-রাগিণীই তো প্রচলিত আছে, তাদের কয়টির স্রষ্টার নাম আমরা জানি? গায়ক হিসাবে হিমাংশু দত্তর স্মৃতি হয়ত অচিরকালের মধ্যে মুছে যাবে, কিন্তু সুরকাররূপে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে কোনক্রমেই মলিন হতে দেওয়া উচিত নয়।

গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য

কোন কবি অথবা সাহিত্যিকের তিরোধানের অব্যবহিত পরমুহূর্তে তাঁর প্রতিভার পরিমাপ করতে যাওয়া নানা কারণে শক্ত। প্রথমতঃ, জীবনান্ত দ্বারা কবি অথবা সাহিত্যিক তাঁর চতুর্দিকে এমন একটি শোকের পরিমণ্ডল রচনা করেন যে সেই কুয়াসা ভেদ করে লেখকের কৃতিত্ব নির্ণয় করা বড় সহজ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শোকের প্রশ্রয়ে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কটি সব ছাড়িয়ে এমন বড় হয়ে দেখা দেয় যে সেটাও মৃতের যথাযথ মূল্য-নিরূপণে বাধার সৃষ্টি করে। গীতিকার হিসাবে অজয় ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব বিচারে উল্লিখিত দুটি কারণ বর্তমান লেখকের পক্ষেও বাধাস্বরূপ হতে পারে; তবে সাধ্যমত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সম্পর্ক আড়ালে রেখে, তাঁর প্রতিভার আলোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে পরিচয়ের সীমার মধ্যে টেনে আনা হবে; কিন্তু তা করা হবে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত দানের জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য।

বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্র প্রধানতঃ সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেছেন। এইটে দুঃখের বিষয়। অজয় ভট্টাচার্য সিনেমার ক্ষেত্রে নিতান্ত নবাগত ছিলেন। অন্ততঃ, পরিচালকরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ খুব সেদিনকার ঘটনা। তা ছাড়া, এইক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়ও খুব বেশী চমকপ্রদ নয়। সুতরাং গীতিকাররূপে অজয়বাবুর প্রধান পরিচয়কে পিছনে ফেলে রেখে সিনেমার পরিচালক রূপে তাঁর কৃতিত্বের উপর জোর দেওয়া কিঞ্চিৎ অযৌক্তিক বৈকি। অবশ্য এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, অজয়বাবুর মত শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিকে চলচ্চিত্রশিল্পের খুবই প্রয়োজন ছিল; আর কিছুদিন এই ক্ষেত্রে কাজ করতে পারলে তিনি সিনেমার উপর তাঁর পরিশীলিত মনের ছাপ রেখে যেতে পারতেন নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে আজ আমরা যে অবস্থার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তা খুব গর্ব করবার মত অবস্থা নয়। হাতুড়ে, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত-দেরই এখানে রাজত্ব; সমস্ত আবহাওয়ার উপর স্থূলতার এক কঠিন অবলেপ।

এই স্থূলতা দূর না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। এই দিক থেকে অজয়বাবুর পরিমার্জিত, প্রকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কাজে আসত বলে মনে করি। সুতরাং অজয়বাবুর মৃত্যু চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষেও ক্ষতি সন্দেহ নেই।

গীতিকাররূপে অজয়বাবুর বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে তাঁর পার্থক্যই বা কোন্‌খানটায় তার একটা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। লিখবার সুবিধার জন্য আমরা এখন থেকে তাঁকে 'কবি' নামে অভিহিত করব।

যদি কেউ কবির রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর গানে, খুব উচ্চ ভাবসমৃদ্ধি অথবা কল্পনার অভ্রংলিহ অভিযান আশা করেন তা হলে, বলে রাখা ভাল, তাঁকে নিরাশ হতে হবে। কবির গানের এমন একটি পংক্তি আলাদা করে দেখানো যাবে না যা দেখে 'পেয়েছি' বলে উল্লসিত হয়ে ওঠা যায়। কিন্তু সব জড়িয়ে তাঁর গানের আবেদন মর্মস্পর্শী। যে কোন সফল গানের লক্ষণই হল এই যে তা প্রধানতঃ সুরধর্মী। তাতে কাব্য থাকবে না তা নয়, কাব্য অবশ্যই থাকা চাই, কিন্তু কাব্যকে ছাপিয়ে ধ্বনি ও ছন্দের ঝঙ্কারটাই তাতে অধিক টুং টাং করে বাজবে। গানের প্রতিটি বাণী হবে সরল, ধ্বনিসুকোমল এবং সব জড়িয়ে তার আবেদন হবে হৃদয়গ্রাহী। এর জন্য খুব উচ্চভাবগম্ভীর কবিত্ব না হলেও চলে; বরং গানের ক্ষেত্রে অনেক সময় গভীর কাব্য সুরের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এই আমরা দেখি। তাই প্রত্যেক পংক্তিনির্বিশেষে গানকে উচ্চভাবমণ্ডিত হতে হবে এতটা আশা করা অন্যায়, আর সেই নিরিখে গানের বিচার হওয়াও উচিত নয়। কবির গানে উচ্চভাবসমৃদ্ধ বাণীর অসদ্ভাব ছিল এই যুক্তি তাঁর বিপক্ষে প্রয়োগ না করে বরং তাঁর অনুকূলে প্রয়োগ করা চলে। কবিতার বেলায় উইলিয়াম মরিস সম্পর্কে সমালোচকরা যে কথা বলেন, গানের ক্ষেত্রে কবির সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর সে কথা প্রযোজ্য। গানের সার্বিক আবেদনটাই বড় কথা; সেইদিক থেকে কবি অর্থাৎ অজয়বাবু নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর গীতিকার।

ছোটবেলা থেকে কবি কুমিল্লায় মানুষ হয়েছিলেন। ত্রিপুরা জিলার আকাশে-বাতাসে সুর ছড়িয়ে আছে, কুমিল্লা তারই কেন্দ্র। সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীতচর্চার জন্য এই জায়গাটি প্রসিদ্ধ। বিশেষ, 'আধুনিক বাংলা গান' অভিধায় বাংলার সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রে যে একটি নূতন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে

কুমিল্লাকে তার প্রাণকেন্দ্র বললে বোধ হয় খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না। এই আবহাওয়ার মধ্যে আবাল্য লালিতপালিত কবির মনে খুব শৈশবেই সঙ্গীতপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। এ কথা বিশ্বাস্য আরও এ-কারণে যে, ছেলেবেলায় কবি যাঁদের সমপাঠী, সমধর্মী অথবা বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ সঙ্গীতজগতে তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। মহম্মদ খুরসিদ (খস্রু মিঞা—লোকান্তরিত), হিমাংশু দত্ত সুরসাগর (লোকান্তরিত), কুমার শচীন দেববর্মন, জ্ঞান দত্ত প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠিত গায়ক ও সুরকারের সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয় ছিল। এঁরা একসঙ্গে মিলেছেন-মিশেছেন, হাসি-গল্পে মেতেছেন, থিয়েটার করেছেন (কবির অভিনয়প্রতিভা অসাধারণ ছিল), গানের জলসায় ঘুরেছেন ; এক কথায় এঁদের গতিবিধির কক্ষপথ ছিল এক। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করাই বোধ হয় সঙ্গত যে পরবর্তী জীবনে কবির গীতিকাররূপে সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠার পিছনে ফরমায়েসমাফিক গান লেখার তাগিদ ততটা কাজ করে নি, যতটা কাজ করেছে তাঁর ভিতরকার আবাল্য-লালিত স্বাভাবিক সাঙ্গীতিক প্রেরণা। সব লেখককেই কর্মজীবনে ফরমায়েস মত কিছু কিছু লিখতে হয় ; তার থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে তাঁর লিখবার তাগিদটা মেকি। প্রত্যেক বড় লেখকেরই প্রতিভাবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, এই সব অতিতুচ্ছ ফরমায়েসের তাগিদেই তাঁর প্রতিভা বৃহত্তর পরিধিতে ক্রমপ্রসারিত হয়েছে এবং একসময় তিনি সন্দেহাতীত ভাবে জনবরেণ্য হয়েছেন। কিন্তু মূল যে প্রেরণা—যার উৎস অন্ততঃপক্ষে পত্রিকাসম্পাদক কিংবা ব্যবসাদারদের অনুরোধ-উপরোধের মধ্যে নিহিত নেই—তার মূল্য এতে কিছুমাত্র কমে না। অজয় ভট্টাচার্য ফরমায়েস মত কবিতা লিখতেন এইরূপ অভিযোগ কোন কোন মহলে শোনা গেছে। অভিযোগটির মূলে কিছু পরিমাণে সত্য থাকলেও তা যে গুরুত্বহীন তা-ই প্রমাণ করবার জন্য এত কথা বলা।

গোড়ার দিকে কবির উপর কাজী নজরুলের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। কবির কিশোর জীবনে কাজী নজরুল কিছুদিনের জন্যে কুমিল্লায় গিয়ে বসবাস করেছিলেন। সে সময়টা কাজী নজরুলের কবিজীবনের অগ্নিযুগ ; তাঁর প্রতি কবিতার ছত্রে ছত্রে তখন বিদ্রোহ ও অস্বীকারের উদ্ধত বাণী। সেই আগুনের দীপ্তি সহজদাহ্য কিশোর মনের উপর ঠিকরে পড়ে তাকেও জ্বালিয়ে

তুলেছিল। কবিতা তিনি আগেও লিখছিলেন, কিন্তু এখন থেকে নজরুলী বিদ্রোহের ঢঙে কবিতা লেখার সূত্রপাত হল। প্রত্যেক কবি অথবা লেখকের জীবনে অনুকরণের একটা অধ্যায় থাকে; সেটা যে স্বাভাবিক, এবং লজ্জার বিষয় কিছু নয়, সহজে তাকে অতিক্রম করা থেকেই তার প্রমাণ হয়। অর্থাৎ অনুকরণের স্তরকে অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পারার ক্ষমতা থেকেই বোঝায় লেখকের প্রতিভার ক্রমপরিণতির পক্ষে এই অধ্যায়ের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন যখনই ফুরোয়, অনুকরণস্পৃহারও মৃত্যু ঘটে।

কবি গান লিখতে আরম্ভ করেন আরও পরে। হিমাংশু দত্ত 'সুরসাগর'-এর উপরোধেই তিনি প্রথম গান রচনা করেন এবং সে গান একটি গজল। সে সময়ে কাজী সাহেবের গজল গানের সুর বাংলার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল; সঙ্গীতরচনার সূত্রপাতে গজল গান দিয়ে হাতেখড়ির পিছনে মনে হয় এই যুগপ্রভাব খানিকটা কাজ করেছিল। 'সুরসাগর' স্বয়ং সেই গানে সুরযোজনা করেছিলেন। গানটির প্রথম লাইন হল "হাস্নুহানা, আজি নিরালা ফুটিলি কেন আপন মনে।" পরে সে গান গ্রামোফোনে দেওয়া হয়েছিল; অনেকেই শুনে থাকবেন।

এর পর পরের পর নানা ধরনের গান রচনা করতে থাকেন তিনি, আর 'সুরসাগর' অক্লান্তভাবে তাতে সুর বসিয়ে যেতে লাগলেন। মনে হয় যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই প্রতিভার স্ফুরণে এঁরা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়েছিলেন। একের অপূর্ণতা অপরকে দিয়ে পরিপূরণ করিয়ে নিতেই যেন এঁরা দুজন এক-ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছিলেন। অতঃপর আমরা দেখি গ্রামোফোনখ্যাত গজলগায়ক জ্ঞান দত্তের প্রদত্ত সুরকে আশ্রয় করে কবির গীতাবলী কিছুদিন উৎসারিত হল। তারও কিছুদিন পর কুমার শচীন দেববর্মনের সুরের মাধ্যমে কবির কাব্যপ্রেরণাকে বিচিত্র স্রোতে অবারিত হতে দেখা গেল। এখন থেকে শচীন দেববর্মনই হলেন কবির গানের ভাণ্ডারী। বন্ধু অজয়ের গানগুলিতে সুমিষ্ট সুরপ্রয়োগ ও কুশল কণ্ঠের ব্যঞ্জনার সাহায্যে তাদের সাধারণ্যে জনপ্রিয় করে তোলার ভার দেববর্মন মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করলেন। কাজেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কবির সঙ্গীতভাণ্ডারের চাবিকাঠিও তাঁর হাতে এসে পড়ল। 'ভাণ্ডারী' কথাটি এখানে এই অর্থে ব্যবহার্য।

কবির একটা অসুবিধা ছিল। তিনি নিজে সুরযোজনা করতে পারতেন না। সাধারণতঃ সুরকারদের বেলায় দেখা যায়, যিনি গানের বাণী রচনা করেন তিনিই সুরযোজনা করেন। একই ব্যক্তিতে এবং একই সময়ে সুর ও বাণীর সমন্বয়ে যে জিনিসটি দাঁড়ায় সেইটিই 'গান' আখ্যা পেয়ে থাকে। নিধুবাবু থেকে আরম্ভ করে কান্তকবি রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল এবং সর্বশেষে দিলীপকুমার পর্যন্ত সবারই গানে এই লক্ষণ সমভাবে বর্তমান। সুর ও ভাব কিছু আলাদা বস্তু নয়; গানে এ দুটি জিনিস অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথকে যদি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়, তা হলে গানে সুর আগে আসে কি বাণী আগে আসে সে সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বোধ হয় দুটিরই তাগিদ সমসাময়িক ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন গান সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। শোনা যায় "ধনধান্য পুষ্পে ভরা" গানটি রচনা করবার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল একই কালে সুর ও ভাবের প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।

সঙ্গীতরচনার এইটিই যদি স্বীকৃত মানদণ্ড হয় এবং সমস্ত গীতিকার-সুরকারের বেলায়ই তা প্রযোজ্য হয়, তা হলে কবি অজয় ভট্টাচার্য যথার্থ গীতিকার নন এরূপ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয়। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীত-ক্ষেত্রে সুরযোজনা ও পদরচনা আর একই ব্যক্তির করণীয় নয়। অন্যান্য বিষয়ে শ্রমবিভাগের মত এই বিষয়েও যেন একটা শ্রমবিভাগের নীতি স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয়। শুধু অজয় ভট্টাচার্যের বেলায়ই নয়, সমস্ত আধুনিক গীতিকার সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। অর্থাৎ বাংলার সাম্প্রতিক সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিতে গীতিকার এবং সুরকারের সমাবেশ বড় একটা চোখে পড়ছে না। তা থেকে মনে হয়, সঙ্গীতে সুরযোজনার কাজটি পূর্বের তুলনায় জটিলতর হয়েছে। সুরকার গীতিকারের পথ ছেড়ে আলাদা হয়ে এসেছেন, গীতিকারও সুরকার-নিরপেক্ষ নিজের কাজ বুঝে নিয়েছেন। এই শ্রম-বিভাগকে যদি সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে একটি অপরিহার্য অধ্যায় বলে ধরা যায় তা হলে তা ভাল কি মন্দ সে বিচার করেই গীতিকারকে তাঁর যথাপ্রাপ্য মর্যাদা দিতে হয়। একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি অজয় ভট্টাচার্য সুরযোজনা করতেন না বটে, তবে ছোটবেলা থেকে গায়ক বন্ধুদের সাহচর্য ও সাঙ্গীতিক পরিপার্শ্বের কল্যাণে সুরযোজনার মূলগত নিয়মগুলি সম্পর্কে তাঁর

মনে সহজ একটা ধারণা এসে গিয়েছিল। ফলে সুরের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে গানের বাণীকে তদনুযায়ী বিন্যাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু সুরকারের দাবির নিকট নিজেকে তা বলে খাটও তিনি করেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি গানে সুর ও কথার সুসমঞ্জস ভাবটুকু লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে। অজয়-গীতির সুর ও ভাব যেন খাপে খাপে মিশে আছে; একটি আর একটিকে ছাড়িয়ে সেখানে বড় নয়। এমনকি, হিন্দি গান ভেঙে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় যে-সব বাংলা গান তিনি রচনা করেছেন তাতেও সুর ও বাণীর মিলনের ছন্দে এতটুকু তাল কাটে নি; মনে হয় এগুলিও তাঁর মৌলিক সঙ্গীতরচনা।

পরম্পরার দিক থেকে কবিকে কাজী নজরুল ও দিলীপকুমারের অব্যবহিত পরবর্তী গীতিকাররূপে চিহ্নিত করা চলে। কান্তকবি বহুদিন গতাসু হয়েছেন; দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত রাগপ্রভাবান্বিত 'ভাঙা-খেয়ালের' আসর ভেঙে পড়েছে; রবীন্দ্রনাথ অস্তাচলের পথে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু তখনও তাঁর নূতন নূতন অগণিত সঙ্গীতে প্রতিভার মধ্যজ্যোতি বর্তমান; অতুলপ্রসাদ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ ঠুংরী ওরফে 'লচা ঠুংরীর' সুরভঙ্গির অনুসরণে রচিত বাংলা গানে ভাটির টান ধরেছে; কাজী নজরুল গজল ও প্রেম-গীতিকার ক্ষেত্র ত্যাগ করে অর্ধলুপ্ত ও অপ্রচলিত রাগিণীগুলির ছাঁচে বাংলা গান লিখছেন আর ভিতরকার অধ্যাত্ম প্রেরণার বশে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেছেন; দিলীপকুমার তাঁর ভক্তিভাবের গানগুলির সুর-যোজনায় নিত্য নতুন সুরের পরীক্ষা চালাচ্ছেন; তাঁর গানের সুদীর্ঘ পদ, কীর্তনের ঢঙে আখর সৃষ্টি ও একই গানে বিচিত্র সুরভঙ্গিমা প্রবর্তনের প্রচেষ্টার ফলে বাংলা গান নূতন পথে পা বাড়াবার উপক্রম করেছে—ঠিক এমনি সময়ে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ।

কবি ততদিনে কাজী নজরুলের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন, তাঁর গানের বাণীতে রবীন্দ্রগীতিসুলভ পরিমার্জিত, পরিচ্ছন্ন ভাবটাই তখন প্রকট। প্রচলিত বিশ্বাস ও পদ্ধতি অনুসারে সাধারণতঃ মিলন-বিরহ, চাঁদ ও চকোর, শুক-সারী, ফুল লতা পাতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গান লেখাই রেওয়াজ। এই কবিজনপ্রসিদ্ধির ধারণা রবীন্দ্রপূর্ববর্তীদের ভিতর মজ্জাগত ছিল। অজয় ভট্টাচার্যও সেই বাঁধা পথের অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রগীতির অন্তর্গত

বিভিন্ন ঋতুরঙ্গবিষয়ক গানগুলিও সুতীব্র মিলনস্পৃহা ও বিরহব্যাকুলতার সূচক এবং প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্কটাই সেখানে মূল ভাব। রবীন্দ্ররচিত মিলনবিরহাত্মক গানগুলির কলাক্রিয়া কবি অজয় ভট্টাচার্য তাঁর পরিণত রচনায় অল্পবিস্তর অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের ভিতর যা দূরবগাহ কল্পনা আর কবিমনের চরম ভাবাভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছিল, কবি অজয় ভট্টাচার্যের বেলায় তা একটা কবিত্বমধুর দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র ; বড জোর প্রকর্ষবান চিত্তের রসে রসায়িত একটি সরস-সুন্দর কাব্যভঙ্গি। এইখানেই রবীন্দ্র-গীতিকায় ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের রচনায় মূলগত পার্থক্য।

কবির গানের পদ রবীন্দ্রপদের অনুবর্তী বটে তবে সুরের দিক দিয়ে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। ক্ষেত্রবিশেষে অজয় গীতিকার সুরের ভিতর রবীন্দ্রনাথের সুরের কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তার ভঙ্গি আলাদা। আজকাল যাকে আমরা 'আধুনিক বাংলা গান' বলি এবং যা শুধু নাম নয়, একটা বিশেষ আন্দোলনরূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তার বেশিরভাগ গানের যোগানদার ছিলেন কবি। গ্রামোফোনে, রেডিয়োতে, সিনেমায় তাঁর গান ছড়িয়ে আছে। সেগুলির সুরের ভঙ্গিমার সঙ্গে রবীন্দ্র-গীতির সুরের ভঙ্গিমাকে এক করার যো নেই। আধুনিক বাংলা গানে সুরের মিশ্রণ বড় স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ ; রবীন্দ্রসঙ্গীতে সেটি চলে অন্তরালে-অন্তরালে, ফল্গুধারার মত তার নিঃসাড় চলা। সাম্প্রতিক বাংলা দেশের শিল্পক্ষেত্রে 'আধুনিক বাংলা গান' একটি বিশেষ শ্রেণীর গান হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে, তার প্রতিপত্তির মূলে রয়েছে কবি অজয়ের অক্লান্ত সাধনা ও অকৃপণ দান। আধুনিক বাংলা গান মূলতঃ কাব্যসঙ্গীত ; অজয় ভট্টাচার্যের লেখনীমুখেই সেই কাব্যপ্রেরণা মুখ্যতঃ উচ্ছ্রিত হয়েছে বললে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি করা হবে না। কাজী নজরুলের গানে সরস কাব্যের পরিচয় আছে, কিন্তু তা আশানুরূপ মার্জিত নয়। অতুলপ্রসাদের কাব্যাংশ দুর্বল ও অসংস্কৃত ; সুরের উপর কোন রকমে তা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। দিলীপকুমারেও কাব্যাংশ নগণ্য, তবে সুরবৈচিত্র্যে তা মহিমান্বিত। তার পরই অজয় ভট্টাচার্য। কবির গানের ধ্বনিসুকোমল বাণীলালিত্য এবং সুরের সঙ্গে বাণীর পায়ে-পায়ে চলার সৌষম্য শ্রোতাকে আকর্ষণ না করে পারে না।

তাঁর গান উচ্চভাবগম্ভীর কবিত্বের সাক্ষ্য না-ই বা বহন করল (যেটা, আগেই বলেছি, সফল গানের বড় লক্ষণ নয়), কিন্তু সুর ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী মিলনে তার যে একটা নিজস্ব রূপ সৃষ্টি হয়েছে সে কথা কে অস্বীকার করবে ?

কবির গানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট হবে। কবির কাব্যভঙ্গি যে রবীন্দ্রকাব্যভঙ্গির অনুসারী ছিল তার দৃষ্টান্ত :

সীমার বাঁধনে এ মিলন নাহি রহে,
মন দেয়া নেয়া ধূলির বাসরে নহে,
আরো চাওয়া আরো পাওয়া যেথা সেথা চলো।

এখানে আরো চাওয়া, আরো পাওয়ার আকুতিটি নিঃসন্দেহে রাবীন্দ্রিক। অথবা,

আজ মনে হয় বিপুল ধরণী
ধরিতে পারে না দোঁহারে।

এতেও একই সুরের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির দৃষ্টি যেখানে ধূলিধূসর শহরের গণ্ডী অতিক্রম করে পল্লীপ্রান্তর ছাড়িয়ে গ্রাম্যগৃহাঙ্গনে আনাগোনা করছে, সেখানেও তাঁর চোখে বালিকা-বধূর যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে রবীন্দ্রভাবের আমেজ আছে। যথা :

বৈশাখে তার উদাস নয়ন আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন,
কাল দীঘিজলে আপন ছায়া সে আনমনে দেখে সাঁঝে,
মনের ঠিকানা খুঁজিয়া পায় না, ভুল হয় সব কাজে।
প্রথম আষাঢ়ে নীল মেঘপানে কেন সে বালিকা নীল আঁখি হানে !
ডাহুকির ডাকে কত ব্যথা জাগে পাষাণে বাঁধে সে হিয়া,
আঁধারে লুকায়ে আঁধার বয়ান প্রিয় লাগি কাঁদে প্রিয়া।

কিন্তু ভঙ্গিতে রবীন্দ্রভাবের আমেজ থাকলেই কবির নিজস্ব কৃতিত্ব খারিজ হয়ে যায় না। উদ্ধৃত ছত্র কয়টিতে সুন্দর সুমিষ্ট কথার বাঁধনে গ্রাম্যবালিকাবধূর কী সুন্দর চিত্রই না ফুটে উঠেছে ! নিপুণ শিল্পীর তুলির একটি আঁচড়ে যেমন অনেক কিছু ফুটিয়ে তোলা যায়, তেমনি সমস্ত গানের বেদনানিবিড় রসানুভূতিকে একটি মাত্র ছত্রের সুরের বাঁধনে আটক করা চলে। গানটির প্রথম পংক্তি তার প্রমাণ। "বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা" বলতেই যেন বঙ্গবধূর চিত্রটি ঝিলিক দিয়ে মনের পটে

ভেসে ওঠে। পরক্ষণেই হয়ত তা আড়ালে মিলিয়ে যায়, কিন্তু মিলোবার আগে রেখে যায় মনের উপর একটা বেদনাকরুণ অনুভূতির ছাপ্। কথায় যাকে খানিকমাত্র প্রকাশ করা চলে, সুর তাকে আরও বহুদূরে উড়িয়ে নিয়ে যায় ('কথার যেখানে শেষ, সুরের সেখানে আরম্ভ'—রবীন্দ্রনাথ)।

কবির প্রেমের গানগুলি চোখের উপর যে চিত্র তুলে ধরে তার প্রত্যেকটি সুন্দর। যথা :

যে পথে যাবে চলি'
মুকুল যেও দলি'
গানের বাঁশিখানি
ভাঙিও নিজ হাতে,
ভুলিয়া যেও স্মৃতি
ফিরায়ে নিও প্রীতি
একদা দিলে যাহা
অধীর মধুবাতে।

কিংবা,

আজি আমাবি কথা
ওগো বিমনা সাঁঝে
তব স্মরণ-বীণে
যেন বাবেক বাজে।

অথবা,

তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে,
নিয়ে গেছ হায় একটি কুসুম আমার কবরী হতে।

খেলাঘবে কবে ধূলির খেলায় দুটি হিয়া ছিল বাঁধা,
ওগো, আমার বীণাটি তোমার বাঁশীটি এক সুরে ছিল সাধা।
সে খেলা ফুরালো সে সুর মিলালো নিভিল কনক আলো,
দিয়ে গেছ মোরে শত পরাজয় ফিবে এসো জয়রথে।

অথবা,

প্রিয় আজো নয়, আজো নয়,
বিরহ-কপোতী আজিও কাঁদিছে ওঠে নি সে-চাঁদ মায়াময়।
আজিকাব বাঁশী জানে শুধু কাঁদা,
ফাগুনের সুরে হয়নি সে সাধা,
দখিনার বাণী এখনও পায়নি কুঞ্জের কিশলয়।

কিংবা,

স্বপন না ভাঙে যদি শিয়রে জাগিয়া রবো,
গোপন কথাটি মম নয়ন-সলিলে কবো।

প্রভৃতি কবি অজয়ের বহু প্রেমের গান, মিলন-বিরহ-গীতি শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত। কবিরচিত 'সুরপরী', 'আজি আমারি কথা', 'শুকসারী', 'মিলনবিরহগীতি' প্রভৃতি গীতিপুস্তকে এই গানগুলির অধিকাংশ সঙ্কলিত হয়েছে। আর সুরসন্ধানীরা কুমার শচীন দেববর্মন-কৃত 'সুরের লিখন' নামক স্বরলিপি-পুস্তকটিতে কবির কয়েকটি সুনির্বাচিত ভাল গানের যথাযথ স্বরলিপি পাবেন।

ছায়াছবির গানে জনমনের সাধারণ চাহিদা মেটানোই কবির লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু সেইজন্যে তাঁকে কখনও স্থূলতার স্তরে নেমে আসতে দেখা যায় নি। বরং তাঁর গানগুলিতে আগাগোড়া একটা পরিশীলিত রসস্নিগ্ধ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ডাক্তার' চিত্রের

যবে, কণ্টক পথে হবে রক্তিম পদতল
অন্তরে ফুটিবে যে সুন্দর শতদল,
দুঃখের লিপিলেখা বিচ্ছেদ কালিমায়
উজ্জ্বল হবে জানি মিলনের চাঁদিমায়,
বন্ধন মাঝে মোর মুক্তির কোলাহল।

অথবা 'অধিকার' চিত্রের

দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কি রে?
হাসবি তোরা বাচবি তোরা মরণ যদি আসেও ঘিরে।
অন্ধকারের শিশু তোরা,
আলোর তৃষায় মিছে ঘোরা,
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বালবি সবার প্রদীপটিরে।

প্রভৃতি ছত্রগুলিতে পরিচ্ছন্ন কবিমনের অনাবিল ভাবপ্রবাহ স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলেছে। আর দুঃখ-সহনের অন্তরের প্রচ্ছন্ন মহিমাটিও তাতে কত সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে!

কবির ভাটিয়ালি গানগুলিতে তেমনি আবার একটি খাঁটি গ্রাম্য আমেজ পাওয়া যায়। যেমন,

ওরে বন্ধুরে,
মনের কথা কইবার আগে
আঁখি ঝইরা যায়।
আমার মতন ব্যথা লইয়া
পাষাণও ভাঙিবে হায়॥

কিংবা,

ওরে সুজন নাইয়া,
কোন্ বা কন্যার দেশে যাওরে চাঁদের ডিঙা বাইয়া।
লক্ষ তারার নয়ন কোলে,
কার চাহনির মানিক জ্বলে,
আর্ ছা মেঘের পত্রখানি কে দিল পাঠাইয়া।

কিংবা,

ফুলের বনে থাকো ভ্রমর ফুলের মধু খাও,
আমার কথা কণ্ঠে লইয়া বঁধুর দেশে যাও।

অথবা,

কে যাবি চল্ বৃন্দাবনে,
যারে নাগাল পাই
প্রাণনাথ বঁধুরে পেলে
অঙ্গেতে মিশাই।

*   *   *   *

শুনি নাকি শ্যামের প্রেমে মরলে জীবন পায়,
জীবন থাকতে মরলাম আমি কে করে উপায়।

বিশেষ করে,

শ্রবণে বধির হব, না শুনিব বাঁশি,
নয়ন উপাড়ি' দিব, না হেরিব হাসি,
বাঁশীর সুরে ডুবে আমি ত্যজিব পরান॥

প্রভৃতি ছত্রগুলি যেন পূর্ববঙ্গগীতিকার প্রণয়বেদনাদ্যোতক শ্রেষ্ঠ ছত্রগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভজন গানেও কবির চমৎকার হাত ছিল। যথা,

প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে
রয় না বাহিরে,
ফুলের খেলায় চাঁদের মেলায়
কোথায় পাবি রে।

অথবা,

সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে
(তার) বনফুলমালা দোলে।
সে যে বংশীওয়ালা মোহিল ভুবন
(তার) মোহন মুরলি বোলে।

কিছুদিন কবি সাধনসঙ্গীত রচনায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গানগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা,

সেই ভাল মা এম্নি করে
লুকিয়ে থাকিস অন্ধকারে।
নইলে আমি তোবেই চেয়ে
কাঁদব কেন বাবে বারে?

অথবা,

আমার মনের মাঝে মন রয়েছে সেথায় ফোটে অচিন ফুল,
সবাই বলে ওরে পাগল এ যে শুধু মনেব ভুল।
(আমার) আঁখিব মাঝে রয় যে আঁখি, সে তো কভু দেয় না ফাঁকি,
কয় সে ডেকে দেখেছি ফুল অরূপ সে যে রূপের মূল।

শেষোক্ত গানটির তুলনা হয় না। দেহতত্ত্ব-প্রধান বাউল গানের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছত্র কয়টিতে রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ কবির সাধনসঙ্গীতের অধ্যাত্ম-প্রেরণায় মুগ্ধ হয়ে দিলীপকুমারের মারফৎ উচ্চ প্রশংসাবাণী পাঠিয়েছিলেন। তবে যতদূর জানি, কবির ভিতর এই ঐশী প্রেরণা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, অথবা তার মূল খুব গভীরে ছিল না।

হিন্দি গান ভেঙে কবি যে সব বাংলা গান রচনা করেছিলেন তার ভিতর "মনোহরবা মোরি রে"-র অনুকরণে "যদি দখিনা পবন" অথবা "মুরলী কি ধুন শুন সখিরি আজু"-র অনুকরণে "মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয়" কিংবা "দিল্ লে লিয়া হে মেরো"-র অনুকরণে ভৈরবী সুরের "প্রেম যমুনারি তীরে মোর হিয়া কেঁদে মরে" প্রভৃতি গানগুলি স্মরণীয়। তাঁর "আজি রাতে কে আমারে", "আলো-ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে", "ফুলের দিন হল যে অবসান" প্রভৃতি গানগুলিতেও হিন্দি সুরের স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ আভাস পাওয়া যায়।

কবির বহুলপ্রচারিত গজল গানগুলির মধ্যে "হাস্নুহানা, আজ নিরালা

ফুটিলি কেন আপন মনে", "ও পিয়ারী লায়লা আমার", "তুমি তো বঁধু জানো", "বঁধু এলো মধু রাতে", "কণ্ঠে তোমার দুলবে বলে গানের মালা গাঁথি" প্রভৃতি গান সমধিক উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে তিনি গজল গান রচনা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সঙ্গীতজগতে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের যথার্থ স্থাননির্দেশ করতে হলে রবীন্দ্রপরবর্তীদের ভিতর কাজী নজরুলের ঠিক পরেই তাঁর নাম করতে হয়। রবীন্দ্রপ্রদর্শিত পথে কবি অজয়ের গানে ভাবসৌকুমার্য ও বাণীলালিত্য চরমে উঠেছিল। কিন্তু এখন থেকে নতুন পথে গানের বাণীর মোড় ফেরানো দরকার। কবিজনপ্রসিদ্ধ পুরাতন বিষয়বস্তু ছেড়ে নূতন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত সাহিত্যাদর্শের সহিত সমতা রেখে গানের বাণীকেও গণজীবনাভিমুখী করতে হবে, তার জন্য গীতিরচনার পুরাতন ধারণা ও পদ্ধতিগুলি যদি বিসর্জন দিতে হয় তাতে পেছপা হলে চলবে না। শেষের দিকে কবি অজয়ের বিভিন্ন কবিতায় নতুন সমাজচেতনার সুর ফুটে উঠেছিল, বোধ হয় বেঁচে থাকলে গানের ক্ষেত্রে তিনি এই লক্ষণটিকে আরও অনেক পরিস্ফুট করতেন। তাঁর আইন-অমান্য আন্দোলনের যুগে রচিত গানগুলিতে এবং ইদানীংকার 'ছদ্মবেশী' বাণীচিত্রের "বন্দর ছাড়ো" গানটিতে গণমনের আকাঙ্ক্ষা উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। তা সঙ্গীতের একটি স্থায়ী প্রেরণায় পরিণত হবার সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল, এইটেই সব চাইতে দুঃখের।

সঙ্গীত-পর্যালোচনা

গত বিশ বছরের ভিতর বাংলা দেশে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন হয়েছে। সে সকল পরিবর্তন পর্যালোচনা করে তাদের কয়েকটি স্পষ্টচিহ্নিত নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথম যে পরিবর্তন সকলেরই দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে চোখে পড়বে তা হচ্ছে মার্গসঙ্গীত বা রাগসঙ্গীতের অনুশীলন সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের পরিস্ফীতি। আমাদের সঙ্গীতামোদী আধুনিক তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্লাসিকাল গান শেখার এতটা আগ্রহ দুই দশক পূর্বে ছিল না। শুদ্ধমাত্র রাগসঙ্গীত শেখানোর জন্য একাধিক সঙ্গীত বিদ্যালয় এই ক' বছরে কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি সুসংহত কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাগসঙ্গীতের অনুশীলনের বিস্তৃততর সুযোগ জনসাধারণেব সমক্ষে উন্মুক্ত হয়েছে। প্রধানতঃ রাগসঙ্গীত পরিবেশনকারী মিউজিক কনফারেন্সগুলি কলকাতার সাম্বৎসরিক উৎসবজীবনের একটি নিয়মিত অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজ অব্ মিউজিক-এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তির সুযোগ কলকাতা শহরে বসেই যাতে লাভ করা যায় এতৎপক্ষে স্থানীয় একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার স্তরে বিদ্যার্থীদের স্বেচ্ছা-পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, সঙ্গীতকে কলেজীয় শিক্ষার স্তরে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে সঙ্গীতে ডিগ্রীদানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এ সকল লক্ষণ যে সঙ্গীতের বিশেষ অগ্রগতি সূচিত করে তা বলাই বাহুল্য। রাগসঙ্গীতের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে। জীবিকার আকর্ষণে অনেক উত্তর ভারতীয় ওস্তাদ বাংলা দেশকে তাঁদের স্থায়ী কর্মক্ষেত্র করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাঙালীর রাগসঙ্গীতমনস্কতার সূত্রে আজকাল কলকাতা শহরে দক্ষিণী বা কর্ণাটী সঙ্গীতেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্রতি বৎসরই ত্যাগরাজের স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলকাতায় কয়েকজন প্রসিদ্ধ দক্ষিণী শিল্পীর পদার্পণ ঘটছে, তাঁরা কলিকাতাবাসীকে তাঁদের সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শন করে

চমৎকৃত করছেন। এক দিকে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রাগসঙ্গীত, অন্য দিকে উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) ও দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত— এই ত্রিধারায় মিলে বাংলা দেশে সঙ্গীতের ত্রিবেণী-ক্ষেত্র রচিত হওয়ার পথ সুগম হল।

এ তো গেল রাগসঙ্গীত অনুশীলনের ব্যবহারিক দিক। এ বিষয়ে চিন্তন-অনুধ্যান গবেষণাদির ক্ষেত্রও ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ রাগসঙ্গীতের চর্চা শুধ্ মাত্র প্র্যাক্‌টিকাল স্তরেই আবদ্ধ হয়ে নেই, তদ্বিষয়ক থিয়োরী নিয়েও আলোচনা চলেছে। এ কথার প্রমাণ গত কয়েক বছরে রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞদের রচিত কতকগুলি গ্রন্থের প্রকাশ এবং সঙ্গীতামোদী জনসাধারণের ভিতর তাদের সমাদর।

এ সমস্তই রাগসঙ্গীতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সূচক। একে আমরা বিশেষ আশাব্যঞ্জক লক্ষণ বলতে চাই। এ কারণে যে, যে-কোন ধারার ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপুষ্টির জন্য রাগসঙ্গীতের জ্ঞান একান্তভাবে আবশ্যক। আর এ জ্ঞান একমাত্র রাগসঙ্গীতের বিধিবদ্ধ অনুশীলনের মাধ্যমেই আয়ত্ত হওয়া সম্ভব। রাগসঙ্গীতের চর্চা শুধু যদি repetitive বা পৌনঃপুনিকতার লক্ষণমণ্ডিত হত, অর্থাৎ পুরাতনের রোমন্থন করাটাই যদি তার একমাত্র কাজ হত, তা হলে অবশ্য ভয়ের কারণ ছিল; কিন্তু যেখানে ভিত্ পাকা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিংবা প্রাদেশিক শাখার বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতের উন্নতি-বিধানের জন্য রাগসঙ্গীতের দ্বারস্থ হওয়া, সেখানে ব্যাপারটিকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না। আমাদের আধুনিক সঙ্গীতকারদের ভিতর একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রীত হয়েছি। তাঁরা ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছেন যে, আর কোন কারণে যদি নাও হয় শুদ্ধমাত্র আধুনিক সঙ্গীতের সমৃদ্ধি আর বৈচিত্র্য ঘটাবার জন্যই রাগসঙ্গীতের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যিনি যে ধারার সঙ্গীতের চর্চা করুন না কেন, সঙ্গীতমাত্রেরই ভিত্তি হল স্বরজ্ঞান। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা, রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের অনুমোদিত স্বরসাধন-প্রণালী ব্যতিরেকে এই স্বরজ্ঞান ভালরূপে আয়ত্ত করা যায় না। স্বরজ্ঞান বলতে বুঝি, সা রে গা মা প্রভৃতি সাতটি স্বরের যথার্থ বোধ এবং কণ্ঠে সেগুলিকে বিশুদ্ধ ভাবে রূপায়িত করবার ক্ষমতা। প্রাদেশিক ধারার সঙ্গীতে অভ্যস্ত আমাদের অধিকাংশ গায়কের কণ্ঠ স্বাভাবিক ভাবে সুমিষ্ট, কিন্তু

একটু কারুকার্যমণ্ডিত সূক্ষ্ম সুর কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে গেলেই তাঁদের কণ্ঠস্বরের অপ্রতুলতা ধরা পড়ে। সামান্য একটু জটিল সুরের পরীক্ষাতেই প্রমাণ করা যায়, আমাদের অধিকাংশ তথাকথিত আধুনিক বাংলা গান গাইয়ে তথা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠ বেসুরো। কণ্ঠ স্বাভাবিক ভাবে মিষ্ট হলেই সুরেলা হয় না। তার জন্য সাঙ্গীতিক পরিভাষায় যাকে 'স্থায়ী সাধন' বলে তা করা দরকার। আর এই স্থায়ী সাধন রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যাশ্রিত স্বরসাধন-প্রণালীর একটি অভ্যন্ত অঙ্গ। যাঁর স্বরসাধন-প্রণালীর অভিজ্ঞতা যত বেশী পাকা তাঁর স্বরজ্ঞান তত নিখুঁত। ন্যূনতম স্বরজ্ঞান ব্যতীত কোন প্রকার সঙ্গীতই সম্ভবে না।

স্বরজ্ঞানের উপর কিছু পরিমাণে রাগ-রাগিণীর জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় তো আরও উত্তম। সঙ্গীত অনুশীলনের ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীর জ্ঞানকে নিছক বাড়তি জ্ঞান মনে করা চলে না ; ওটি আবশ্যিক জ্ঞান এবং যত্নের সহিত অর্জনীয়। অনেক আধুনিক সঙ্গীতশিল্পী র গ-রাগিণীর জ্ঞানের উপর তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন না এই যুক্তিতে যে, আধুনিক সঙ্গীতের রূপায়ণে ওটি অপরিহার্য নয়। ধারণাটি ভ্রমাত্মক। স্বরজ্ঞানের মত রাগ-রাগিণীর জ্ঞানও সর্বপ্রকার সাঙ্গীতিক জ্ঞানের মূলে কিছু পরিমাণে অনুস্যূত হয়ে আছে। অন্যান্য শিল্পের বেলায় যেমন সঙ্গীতের বেলায় তেমনি, অশিক্ষিতপটুত্ব তথা প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্তির উপর নির্ভর করে শুধু তারাই যারা শ্রমভীরু, আলোককুণ্ঠ, ধৈর্যহীন। যে শিল্পীর রাগ-রাগিণীর আংশিক জ্ঞানও নেই, বুঝতে হবে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার মূলেই গলদ রয়ে গেছে।

সুতরাং যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, সর্ববিধ সঙ্গীতচর্চার ব্যাপারে রাগসঙ্গীত একটি প্রধান স্থান জুড়ে আছে, এ কথা বলা যায়। আর সেই কারণে দেশের অভ্যন্তরে এই-যে রাগসঙ্গীত চর্চার ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাকে আন্তরিক স্বাগত জানাতে হয়। আমাদের সঙ্গীতামোদীদের ভিতর রাগসঙ্গীতমনস্কতা যত বৃদ্ধি পাবে তত সঙ্গীতের বৈচিত্র্য সাধিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক সঙ্গীতের প্রচার কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়েছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তিরিশের বৎসরগুলিতে 'আধুনিক বাংলা গান' নামে এক শ্রেণীর তরলভাবাপন্ন হাল্কা সুরের গান বাংলা দেশের সর্বত্র ব্যাপক প্রসার

লাভ করে। এই গানগুলির কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ছিল, যা দিয়ে এই গানগুলিকে অন্য শ্রেণীর গান থেকে আলাদা করা যেত। যথা, বাণী অংশে প্রেমমূলক ভাবের প্রাধান্য; 'হিয়া', 'মরমী', 'সজনি' প্রভৃতি মিষ্টি মিষ্টি কথার বহুল—এবং প্রায়শঃ অর্থহীন—ব্যবহার; গাইবার সময় গানগুলিকে চটুল দাদরা এবং কার্ফার তালে ফেলা যেতে পারে এমন ছন্দের প্রয়োগ; সুরের নির্বিচার মিশ্রণ এবং গানের ছলে আবৃত্তির ঢঙে সুরের সানুনাসিক আবৃত্তি; সুরবিস্তার আদপেই না করা ইত্যাদি। এই গানগুলিতে না ছিল রাগ-সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্যের সামান্যতম আভাস, না ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিরাভরণ সৌন্দর্য। অথচ সহজগেয় বলে গানগুলি তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশের চিত্ত বিশেষভাবে অধিকার করেছিল। যে গান গাইতে দৃশ্যতঃ স্বরজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, রাগ-রাগিণীর ধারণা ততোধিক অবান্তর জ্ঞানে বর্জিত হয়, নামমাত্র লয়ের আশ্রয়ে সুরের ভঙ্গিতে কথা আবৃত্তি করলেই যা গান হয়ে ওঠে, যে গানে সুরমিশ্রণ আছে অথচ সুর নেই, সেই গান শুদ্ধমাত্র সহজতার জন্যই যে তরলমতি সঙ্গীতশিল্পীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ এ-জাতীয় গানের কোন ভবিষ্যৎ ছিল না—না সঙ্গীতশিল্পের শ্রীবৃদ্ধির দিক থেকে, না সঙ্গীত-শিল্পীদের স্বকীয় স্বার্থের দিক থেকে। তবু কেন জানি না এই শ্রেণীর তরল গান অনেকগুলি বৎসর আমাদের সঙ্গীতোৎসাহী যুবসম্প্রদায়ের অন্তর আবিষ্ট করে রেখেছিল।

সুখের বিষয়, বর্তমানে অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় কিম্ভূত সঙ্গীতগুলির পূর্বতন প্রতিষ্ঠা আর নেই। এক সময়ে রেডিওতে আধুনিক বাংলা গানের সবিশেষ চলন ছিল। রেডিও কর্তৃপক্ষ একটি বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আধুনিক বাংলা গানের ব্যবহার নির্মম হস্তে ছাঁটাই করে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তবে গ্রামোফোন রেকর্ডে এখনও তার ব্যবহার খর্ব করা সম্ভব হয়নি। জনসাধারণের ভিতর হাল্কা গানের প্রচার স্বভাবতঃই বেশী, এই আশায় গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তারা আজও তাঁদের পরিবেশনাসূচীর ভিতর আধুনিক বাংলা গানকে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছেন। অন্যকার দিনে, যখন দেশবাসীর সাঙ্গীতিক রুচির দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন হয়েছে, আধুনিক বাংলা

গান নামীয় জগাখিচুড়ি-সঙ্গীতকে এ-জাতীয় মর্যাদা দানের কোন অর্থ হয় না। মুনাফার লোভটাই যদি এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়, সেই দিক দিয়েও আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহ বোধ করবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন না জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বাংলা গানের পূর্বতন গৌরব স্পষ্টতঃই আজ স্তিমিত। প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যাবার পরেও পূর্ব-সংস্কার আঁকড়ে থাকবার মত ভ্রান্তি আর নেই।

তবে আধুনিক সঙ্গীতের সকল দিকই অশ্রদ্ধেয় নয়। চতুর্থ দশকের আধুনিক সঙ্গীত আন্দোলন 'রাগপ্রধান' নামক এক শ্রেণীর বাংলা গানের সূচনা ঘটিয়েছিল, যার সম্ভাবনা বিপুল। রাগপ্রধান বাংলা গান আধুনিক বাংলা গানেরই একটি শাখা, তবে আধুনিক গানের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য এখানে যে, আধুনিক বাংলা গানে সুরবিস্তার নেই, রাগপ্রধান গানে আছে। বস্তুতঃ রাগভঙ্গিম সুরবিস্তারই হল রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রধান ভিত্তি, আর সেইজন্যই তার ওই নামকরণ। সুরবিস্তার—যাকে ইংরেজীতে বলা যায় melodic improvisation—রাগসঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সঙ্গীত প্রধানতঃ সুরনির্ভর হওয়ায় অলঙ্করণ হিসাবে সুরবিস্তার তার ভিতর একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ধ্রুপদ গানের 'আলাপ' অঙ্গে এবং খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা গানের খোদ কাঠামোর ভিতর সুরবিস্তাররূপ অলঙ্করণটি সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে, সুরবিস্তার ছাড়া খেয়াল, ঠুংরী গান ভাবাই যায় না। ভারতীয় ক্লাসিকাল গান একরাগভিত্তিকই হোক (খেয়াল) আর মিশ্রণভিত্তিকই হোক (ঠুংরী), সুরবিস্তার তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং তার সমৃদ্ধির বিশেষ কারণ। যে গানে সুরবিস্তার নেই সে গানের আকর্ষণ সুরামোদীর নিকট বহুলপরিমাণে খণ্ডিত।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের এই সমৃদ্ধ সংস্কারটিকে রাগপ্রধান বাংলা গানে সজ্ঞানতঃ যোজনা করা হয়েছে, এবং বলাই বাহুল্য, বাংলা গানের আকর্ষণ তাতে বহুগুণ বেড়েছে। এই গানের বাণী বা কথা অংশে যেমন ভাবের লালিত্য আর মাধুর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তেমনি সুর অংশের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শুধু সুরের আবৃত্তির জন্য রাগপ্রধান গান নয়। রাগপ্রধান গানে আলাপের সুযোগ আছে, গান ধরবার পর সুরবিস্তারের সুযোগ আছে। গানটি মূলতঃ যে রাগিণীর আশ্রয়ে রচিত সেই রাগিণীকে

নিয়ে যদৃচ্ছা সুর খেলাবার অবকাশ আছে। তা ছাড়া সুরের স্থায়িত্ব ও স্বরবিশুদ্ধি রাগপ্রধান বাংলা গানের একটি প্রধান কথা। আধুনিক বাংলা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, গীত, ভজন প্রভৃতির মত কথার উপর দিয়ে সুরকে কেবলমাত্র ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে যাওয়ানোই তার কাজ নয়, সুর যাতে গায়কের কণ্ঠে কেটে বসে সেদিকেও তাকে চোখ রাখতে হয়। স্বাভাবিক-সুমিষ্ট অথচ বেসুরো গলায় রাগপ্রধান বাংলা গান গাওয়া কদাচ সম্ভব নয়।

এ সকল কারণে রাগপ্রধান বাংলা গান এক সময়ে খাঁটী সঙ্গীতামোদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচীন দেববর্মন প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট শিল্পী এই ধারার গানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিকার ছিলেন। যাঁরা ভীষ্মদেববাবুর "নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো", "ফুলের দিন হল যে অবসান", "তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি", "আলোক লগনে" প্রভৃতি গান কিংবা শচীনবাবুর কণ্ঠে "মম মন্দিরে এলে কে তুমি" "নতুন ফাগুনে যবে", "যদি দখিনা পবন", "আলোছায়া দোলা", "আমি ছিনু একা", ইত্যাদি গান শুনেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন রাগপ্রধান গান বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি। এবং আরও একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করলে তাঁরা দেখতে পাবেন, আধুনিক বাংলা গান নামধেয় সঙ্গীত তথা রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে রাগপ্রধান বাংলা গানের পার্থক্য সুবিপুল। রাগপ্রধান গানের গঠন আলাদা, তার রস আলাদা। বাংলায় এই ধারার গানের বিধিবদ্ধ এবং সানুরাগ চর্চার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক সঙ্গীতশিল্পীরা এ সম্পর্কে অবহিত নন। সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে রাগপ্রধান বাংলা গানের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রমাণ নেই, বরং পূর্বের তুলনায় স্পষ্টতঃই এই খাতে উৎসাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। আমাদের গায়কসম্প্রদায় তথাকথিত সহজিয়া সাধনের নামে যা কিছু আয়াসসাধ্য, যা কিছু দুরূহ তাকে এড়িয়ে চলতে শিখেছেন। ফলে রাগপ্রধান গানও সেই সঙ্গে বিসর্জিত হয়েছে। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সহজ সাধন একটা মস্ত বিভ্রান্তিকর কথা। এই বিভ্রান্তির মোহ থেকে বাংলা গানের শিল্পীরা যত শীঘ্র মুক্তি পান ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতও মূলতঃ 'সহজিয়া' সঙ্গীত, তবে তার করণ-কারণ, বৈশিষ্ট্যাদি ভালভাবে আয়ত্ত করতে হলে বহুদিন এ পথে লেগে থাকা

ছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে সব চাইতে বড় কথা হল এ সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত রুচির সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য, এবং অনুভূতির গভীরতা। সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় যিনি বাস করেন না, সৌন্দর্যকে যিনি জীবনের প্রধান আচরণীয় বিষয় বলে গণ্য করেন না, তাঁর পক্ষে এই রুচিসৌকুমার্য আর অনুভূতির প্রগাঢ়তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা যাঁর পক্ষে সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি সুবিচার করাও সম্ভব নয়। এই বিশেষ দিক দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুত্ব অসীম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার অনেক বেড়েছে। শুদ্ধমাত্র সাঙ্গীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে ঘটনাটিকে যদি উপরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়, অর্থাৎ জাতির বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে বিষয়টির অনুধাবন করা যায়, সে ক্ষেত্রে বিশেষ আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে। দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার যত বৃদ্ধি পাবে তত দেশবাসীর রুচি পরিশীলিত হওয়ার পথ সুগম হবে। শুধু সাঙ্গীতিক রুচি নয়, সমগ্রভাবে মানসিক রুচি, সাংস্কৃতিক রুচি। আর রুচির স্থূলতাই যে আমাদের উন্নতির পথে সর্বপ্রধান অন্তরায় এ কথা কে না জানে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানগুলিতে যখন শ্রোতৃসাধারণের ক্রমবর্ধমান সমাগম প্রত্যক্ষ করি তখন এই ভেবে আনন্দ বোধ করি যে, দেশবাসীর চিত্ত পরিশোধিত হওয়ার পথ ক্রমপ্রশস্ত হচ্ছে। জাতির সামগ্রিক তামসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এটি এমন এক ঘটনা, সংস্কৃতিপ্রিয় ব্যক্তি যাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেন না।

কিন্তু সুরের দিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু বলবার আছে। অন্ততঃ আজকাল যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরাদর্শ এমনিতেই অজটিল, অনাড়ম্বর, সুরকারের ইচ্ছানুসারে সেখানে সহজ সাধনের ভাবটিকে গানের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে; সুতরাং তার উপর আর অতিরিক্ত সারল্যের ভার চাপানো উচিত নয় এ কথা সহজ দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। কিন্তু পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীরা বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন বলে মনে হয়। তাঁরা সারল্যচর্চার নামে সারল্যকে বড্ড বেশী আঁকড়ে ধরেছেন। যে-কোন প্রকারের সঙ্গীতচর্চায় স্বরজ্ঞান একটি আবশ্যিক বস্তু, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পীরা এ বিষয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁদের

ধারণা, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ভাবে মিষ্ট হওয়াটাই যথেষ্ট ; সুরকে গলায় স্থায়ী আসন দেবার জন্য বিধিবদ্ধ স্বরসাধনের প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করেন না। এ অনুমান মাত্র নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের কণ্ঠস্বর একটু মনোযোগের সঙ্গে অবধান করলেই এ কথার যাথার্থ্য ধরা পড়বে বলে মনে করি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরবিস্তারের অবকাশ মোটে নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের একটি মূল বৈশিষ্ট্য শিল্পীর স্বাধীনতা—শিল্পীর স্বাধীনতা রবীন্দ্রসঙ্গীতে নির্মম হস্তে খণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ সর্ব বিষয়ে স্বাধীন মনোভাবের পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু স্বকীয় গানের বেলায় শিল্পীর স্বাধীনতা স্বীকারে তাঁর কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। স্বাধীনতা যেখানে অনাচার নয়, অসংযম নয়, পরন্তু সৌন্দর্যবৃদ্ধির পরিপোষক, সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শ মান্য। এই যুক্তি অনুসারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর শিল্পীর স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হওয়ার অনেকখানি অবকাশ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সে আশা অতৃপ্ত রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর গায়কের স্থান গৌণ ; সুরকারের কৃতিত্বটাই আসল। সুরকারের উত্তুঙ্গ মহিমার তলায় গায়ক সেখানে চাপা পড়েছেন বললে অন্যায় বলা হয় না। ফলে হয়েছে এই, রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে পরিমাণ মহীয়ান্, রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সে পরিমাণেই স্বল্পশক্তি জীব। ইংরেজী mediocre কথাটি রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের বেলায় সর্বাংশে প্রয়োগ করা যায়। তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রদর্শিত রেখাচিহ্নের উপর অন্ধ অনুকারকের মত দাগা বুলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু জানেন না। পূর্বচিহ্নিত সুররূপকে অবিকৃত ভাবে (কিন্তু সমৃদ্ধতর ভাবে নয়) কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তাঁদের সমস্ত কৃতিত্ব নিঃশেষিত। এজন্য অবশ্য গায়কই সবটুকু দায়ী নন, খতিয়ে দেখলে সুরকারের দায়িত্বটাই এ ক্ষেত্রে প্রধানতর বলে প্রতীয়মান হবে। তবে দায়িত্ব যাঁরই ভাগে যতটা পড়ুক এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুবিশাল পরিধির ভিতর গায়ক একটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করে আছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর।

এই অকিঞ্চিৎকরত্বের চেতনা জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক রবীন্দ্রগায়কসম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁরা হীনম্মন্যতার দ্বারা সংকুচিত হয়ে আছেন। যেখানে হীনম্মন্যতা সেখানেই অনাদর, অযত্ন,

অবহেলা। আর এই অবহেলারই একটি রকমফের হল স্বরজ্ঞান তথা রাগ-রাগিণীর জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে ঔদাসীন্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের কণ্ঠে রাগসঙ্গীতসুলভ সূক্ষ্ম কারুকার্যের বালাই নেই। উপরন্তু তাঁদের উচ্চারণ মুদ্রাদোষের দ্বারা বিকৃত। এক ধরনের সানুনাসিক আর ভঙ্গিমূলক উচ্চারণ প্রায় সকল রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর গানকেই কমবেশী খণ্ডিত করে রেখেছে। এঁদের গলায় সুর কখনও কেটে বসবার সুযোগ পায় নি, আর এঁদের লয়জ্ঞান সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

তবে এ সমস্তই হচ্ছে কমবেশী রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলিত গায়নপদ্ধতির ত্রুটি। প্রকারান্তরে শিল্পী-সম্প্রদায়ের ত্রুটি। শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি বাদ দিলে খোদ্ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এজন্য দায়ী করা যায় সামান্যই। শিল্পী-সম্প্রদায়ের বিচ্যুতিগুলি যত্নের সহিত সংশোধনীয়। স্বরজ্ঞান আর রাগ-রাগিণীর জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য তাঁদের বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠা উচিত। লয়বোধও তাঁদের আরও অনেক বেশী পাকা হওয়া দরকার। এ বাদে উচ্চারণের বিশুদ্ধিরক্ষা তথা মুদ্রাদোষ পরিহারের প্রশ্ন তো আছেই। সুররূপায়ণের খণ্ডিত অবকাশের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়নপদ্ধতির উল্লিখিত বিচ্যুতিসমূহ দূর করা সম্ভব হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেদন শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, এ কথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। যাঁরা জনসাধারণের ভিতর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারকামী এবং তদ্বিষয়ে সচেষ্ট, তাঁরা সমস্যার এই দিকটি চিন্তা করে দেখবেন বলে আশা করি।

রাগসঙ্গীত আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের প্রচারও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের সাঙ্গীতিক অগ্রগতির পক্ষে এটিকে আমরা সুস্পষ্ট আশাব্যঞ্জক লক্ষণ বলতে চাই। পল্লীমানসের উৎস থেকে লোকসঙ্গীতের স্রোত মূলতঃ উৎসারিত হলেও তা কেবলমাত্র পল্লীনিবদ্ধ সঙ্গীত নয়। জাতীয় চিত্তে লোকসঙ্গীতের আবেদন গভীর ও দূরপ্রসারী। যে জাতি তার লোকসংস্কৃতির সম্পদ্‌কে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে না সে জাতি স্বেচ্ছায় একটি বড় সম্পদ্ হারিয়ে যেতে দেয়। লোকসঙ্গীত লোকসংস্কৃতির সর্বপ্রধান অঙ্গ বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং সম্ভব হলে নূতন সৃষ্টির বৈচিত্র্যের দ্বারা তার পরিধির সম্প্রসারণ জাতিমাত্রেরই কর্তব্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের ভিতর লোকসঙ্গীত

একটি উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে। আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকে বিদগ্ধ সঙ্গীতের পাশে পাশে লোকসঙ্গীতের চর্চা হয়ে এসেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপযুক্ত প্রমাণাদির দ্বারা দেখিয়েছেন, বৈদিক যুগে মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল এবং একে অপরের পরিপূরক ছিল। বর্তমান যুগ সম্বন্ধেও সেই কথা। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে বিদগ্ধ সঙ্গীতের যোগ অতি নিগূঢ়। বিদগ্ধ সঙ্গীত সাধনায়ত্ত সঙ্গীত, অনুশীলনসাপেক্ষ সঙ্গীত, সুতরাং তার ভিতর শিক্ষাগত নৈপুণ্যের প্রশ্নটাই প্রধান; তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সেখানেও লোকসঙ্গীতের প্রভাব অন্তর্লীন স্রোতের মত বিদগ্ধ সঙ্গীতের দেহ বেষ্টন করে আছে। বিদগ্ধ সঙ্গীতের আবেগের উপাদানগুলি মূলতঃ লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে আহৃত। কাজেই লোকসঙ্গীতচর্চার উপযোগিতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। শুধু যে পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত তাই নয়, শহরবাসীদেরও এ সম্পর্কে সমান প্রযত্নশীল হওয়া আবশ্যক। বরং খতিয়ে দেখলে, শহর-বাসীদেরই এ বিষয়ে দায়িত্ব বেশী। নাগরিক সভ্যতার আওতায় বর্ধিত মানুষেরা যদি লোকসংস্কৃতির ধারাকে বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিতে না পারেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের তাবৎ সাংস্কৃতিক প্রয়াস প্রাণরসের অভাবে অচিরেই বিশুষ্ক হয়ে উঠতে বাধ্য।

তবে এখানেও গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনের প্রশ্ন আছে। লোকসঙ্গীত মাত্রেই শ্রদ্ধেয় বা গ্রাহ্য নয়। লোকসঙ্গীতের সেই সকল ধারাকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে যেগুলি যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত সজীবতা নিজের ভিতর আজও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। এক কথায় যে সকল গান যুগাতিক্রান্ত নয়, কালবারিত নয়, যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে যার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যায় নি। যেমন, বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, লৌকিক শাখার কীর্তন* ইত্যাদি। এ সকল ধারার গানের নিজস্ব আবেদন তো

* কীর্তন বিদগ্ধ সঙ্গীত। সাধনা ব্যতিরেকে কীর্তনের দুরূহ সুর লয় আয়ত্ত করা কঠিন। পদাবলী কীর্তন সুষ্ঠুভাবে গাইতে হলে দীর্ঘদিনের সাধনা চাই। তবে এ বাদেও কীর্তনের একটি শাখা আছে যাকে তার লৌকিক শাখা বলা যায়। লৌকিক শাখার কীর্তন গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে গীত হয়। সাধারণতঃ বৈষ্ণব ভিখারীদের মুখে এর নমুনা শুনতে পাওয়া যায়।

আছেই, তা ছাড়া বিদগ্ধ সঙ্গীতের সমৃদ্ধি বিধানেও এগুলির কার্যকারিতা অসীম। বাউলের উপাদানে রবীন্দ্রসঙ্গীত কী পরিমাণ সমৃদ্ধ সে কথা সকলেই জানেন; ভাটিয়ালির wailing বা ক্রন্দনপরতার ভাবটুকু রাগসঙ্গীতের অনেক সুরের মধ্যে (যথা, ঝাঁঢ়, খাম্বাজ, ভীমপলশ্রী, ধানেশ্রী, পটদীপ) অনুস্যূত হয়ে আছে; সুরের আবেদনের দিক থেকে ঝুমুর ভাটিয়ালিরই স্বগোত্র; আর লৌকিক শাখার কীর্তন নাগরিক কীর্তনের অপভ্রংশ, সে কথা পাদটীকায় এই মাত্র বলা হয়েছে। বিদগ্ধ সঙ্গীতের ভিতর এই সকল সুরের উপাদান যত মিশিয়ে দিতে পারা যায় ভত ভাল।

তাই বলে লোকসঙ্গীতমাত্রেই নির্বিচারে আহৃতব্য নয়। আজ স্থূল ঘাটু গান বা জারি গান বা গাজীর গানের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। এগুলিকে অবিকৃত আকারে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস মুমূর্ষু বস্তুকে জোর করে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসেরই নামান্তর।

লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বিবেচনা করে দেখতে বলি। দেশের ভিতর লোকসঙ্গীতের প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাল কথা, তাই বলে কেউ যেন না মনে করেন, লোকসঙ্গীতে নৈপুণ্যের কোন দাম নেই, অশিক্ষিত-পটুত্বটাই তার ষোল আনা নির্ভর। অমার্জিত গ্রামীণ কণ্ঠের একটা নিজস্ব আবেদন আছে সত্য, তবে সাধা গলার আবেদন থেকে তা বড নয়। রাগসঙ্গীতের করণ-কারণের সহিত পরিচিত সাধা গলায় গাওয়া ভাটিয়ালি বা কীর্তন নিশ্চয়ই অমার্জিত কণ্ঠের ভাটিয়ালি বা কীর্তনের চাইতে শুনতে অনেক মধুর। অভিজ্ঞতায় বার বার দেখা গেছে যে, সুর কণ্ঠে ভাল রপ্ত না হলে কোন গানই গান নয়—তা রাগসঙ্গীতই হোক আর লোকসঙ্গীতই হোক। এর প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। রাগসঙ্গীতে অভ্যস্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে কিংবা ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের গাওয়া কীর্তন অথবা সুপরিচিত রাগপ্রধান সঙ্গীতশিল্পী শচীন দেববর্মনের গাওয়া ভাটিয়ালি নিঃসংশয়ে গ্রামীণ শিল্পীর গাওয়া কীর্তন অথবা ভাটিয়ালি অপেক্ষা সমধিক আবেদন-সমৃদ্ধ; স্বরজ্ঞানই হল এর মূল কারণ। ভারতীয় সঙ্গীতের যে কোন শাখার সঙ্গীতকে কণ্ঠে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে চাই প্রকৃত সুরবোধ এবং স্বরবোধ। কথাটির উপর আগেও একবার জোর দেওয়া হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ববোধে পুনরায় তার উপর জোর দেওয়া হল।

রাগপ্রধান সঙ্গীত

'রাগপ্রধান সঙ্গীত' নামে আধুনিক বাংলা গানের একটি শাখা আছে। এই শাখার গান সম্পর্কে পূর্ব প্রবন্ধে কিছু বলা হয়েছে, এখানে প্রসঙ্গটিকে আরও একটু বিস্তৃত করছি।

এই শাখার গানের অনুশীলন কিছুকাল আগেও বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে, কিন্তু ইদানীং যেন এই শ্রেণীর গান শিল্পীদের মুখে আর তেমন শুনতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ফিল্ম-সঙ্গীত রেডিও-সঙ্গীত আর তথাকথিত আধুনিক কাব্যগীতির প্রাবল্যে রাগপ্রধান গানের চর্চায় দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই ভাটার টান লেগেছে বলে মনে হচ্ছে।

এটি খুব পরিতাপের বিষয়। রাগপ্রধান বাংলা গান আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে যথেষ্ট শোনা যেত। ৺জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মন প্রমুখ কুশলী গায়কগণ ছিলেন এই শ্রেণীর গানের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দী খেয়াল ভেঙে যে-সব বাংলা গান রচনা (সুররচনা) করেছিলেন কিংবা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় গ্রামোফোন রেকর্ডে যে কটি বাংলা গান গেয়েছিলেন সেগুলিকে রাগপ্রধান গানের উৎকৃষ্ট নমুনা বলা যেতে পারে। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর এক-কালীন ছাত্র শচীন দেববর্মনেরও একাধিক রাগপ্রধান গানের রেকর্ড আছে। এ-সব গান একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের "শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়" (ছায়ানট), "বাজে মৃদঙ্গ বাজে" (দরবারী-কানাড়া), "ঘন পবন শিহরিত বনানী রে" (বাহার), "অনিমেষ আঁখি আমার" (বাগেশ্রী), "আমায় বলো না ভুলিতে বলো না" (বেহাগ); ভীষ্মদেবের "তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি" (দেশী টোড়ী), "নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো" (ভৈরবী); কৃষ্ণচন্দ্র দের "ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে" (মালকোষ), "ওগো আমার মা জননী" (বাগেশ্রী); শচীন দেববর্মনের "যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে" (গান্ধারী টোড়ী), "মম মন্দিরে এলে কে তুমি আজি" (আড়ানা), প্রভৃতি গানের নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া তারাপদ চক্রবর্তীরও

কিছু কিছু গান আছে যার ভিতর রাগপ্রধান সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

রাগপ্রধান গানের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এ-সব গান হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতাশ্রয়ী এক একটি রাগ-রাগিণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই গানগুলি একরাগভিত্তিক। অর্থাৎ একটি মাত্র রাগের কাঠামোর উপর গানগুলি দাঁড়িয়ে আছে, ঠুংরী বা আধুনিক গানের মত তার মধ্যে একাধিক রাগের মিশ্রণ নেই।

কিন্তু রাগপ্রধান গান তেমন নয়। এ গানের ধরনটাই হল, এতে একটি মাত্র রাগকে কথায় ও সুরে লীলায়িত করা হয়, অথচ তা ঠিক হিন্দুস্থানী খেয়াল গান নয়। বাঙালীর সহজাত ভাবাকুলতা ও হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির যথেষ্ট অবসর আছে এই শ্রেণীর গানের সুররূপায়ণের মধ্যে। রাগপ্রধান বাংলা গান রাগভিত্তিক গান বটে, তা বলে আবেগবর্জিত নয়। হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের রূপ বঁড্ড ঋজু-কঠিন. দৃঢ়সংবদ্ধ। তা ছাড়া সে গানে বাণীর সৌন্দর্য বড় একটা থাকে না। তিন-চার লাইনে সম্পূর্ণ মামুলী ভাবের কথাযুক্ত অস্থায়ী অন্তরাতেই গান শেষ হয়ে যায়। খেয়াল গানের উপর রাগপ্রধান গানের এইখানেই জিত যে, এই গানে এক দিকে যেমন রাগসঙ্গীতের সুরের আমেজ পাওয়া যায় অন্য দিকে তেমনি বাংলা গানের রসমাধুর্যেরও তাতে কিছুমাত্র কমতি থাকে না। রাগপ্রধান গান যদিও রাগাশ্রিত সঙ্গীত, কিন্তু তার ওই মাধুর্যের কারণে তা খাঁটী বাংলা গান বই আর-কিছু নয়। রাগসঙ্গীতের সুরগাম্ভীর্য আর বাংলা গানের সহজাত সুরসুষমাকে এক সঙ্গে পেতে হলে রাগপ্রধান বাংলা গানের অনুশীলন ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না। এই গানে সুরবিশুদ্ধি আর সুরসৌন্দর্যের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হয়েছে, এ সঙ্গমে অবগাহন করলে কানের তৃপ্তি মনের তৃপ্তি।

রাগপ্রধান বাংলা গানের সুরযোজনায় একাধিক বিশিষ্ট সুরকারের সাধনার দান আছে। প্রাচীন বাংলা গানের রচয়িতাগণ, আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায় ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত সকলেই কোন-না-কোন ভাবে কিছু পরিমাণে রাগপ্রধান বাংলা গানের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন। প্রাচীন বাংলা গানের রচয়িতাগণ খেয়াল গানের ঢঙে অনেক একরাগভিত্তিক বাংলা গান রচনা

করেছেন (দৃষ্টান্ত : "বাজে শ্যামের মোহন বেণু", "কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত শীতল রাগে" প্রভৃতি গান)। রবীন্দ্রনাথের অগণন ব্রহ্মসঙ্গীত খাঁটী রাগসঙ্গীত হলেও তাঁর ভিতর ধ্রুপদের প্রভাবই বেশী, খেয়ালের ঢঙে বাংলা গান রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই রচনা করেছেন। খেয়ালে স্বরবিকাশের অবকাশ আছে, ধ্রুপদে নেই—এক আলাপ অঙ্গে ছাড়া। রাগপ্রধান বাংলা গানের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান লক্ষণই হল এই যে, এতে স্বরবিকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ স্বরকে যথা ইচ্ছা খেলানো যায়, বাণীর আঁটসাঁট বন্ধনের মধ্যে স্বরকে খাঁচার পাখির মত আবদ্ধ রাখবার রীতি সেখানে স্বীকৃত নয়। এই দিক থেকে খেয়াল গানের সঙ্গেই রাগপ্রধান গানের সমধিক মিল। ধ্রুপদের সঙ্গে তার শ্রেণীসাযুজ্য কম। সুতরাং রাগপ্রধান গানের বিকাশ সাধনে ববীন্দ্রনাথের স্বরযোজনার প্রভাব পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হলেও প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশী ক্রিয়াশীল হয় নি বলেই আমার ধারণা। বরং সেই তুলনায় অতুলপ্রসাদের দান এক্ষেত্রে বেশী। অতুলপ্রসাদের প্রতিভা প্রধানতঃ ঠুংরীকে আশ্রয় করে স্ফূর্তিলাভ করলেও তাঁর গানের লীলায়িত স্বরবিকাশের আদর্শ রাগপ্রধান বাংলা গানের রীতি-পদ্ধতিকে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করেছে। তবে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রভাব হল দ্বিজেন্দ্র-লালের, কাজী নজরুল ইসলামের ও হিমাংশু দত্ত স্বরসাগরের।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাঙা খেয়াল গান ও কাব্যসঙ্গীত, নজরুল ইসলামের লুপ্ত ও অর্ধলুপ্ত রাগিণীর আশ্রয়ে রচিত খেয়ালভঙ্গিম বাংলা গান (জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও শচীন দেববর্মনের কণ্ঠে কাজী সাহেবের একাধিক রাগপ্রধান গান রূপায়িত হয়েছে রেকর্ডে), হিমাংশু দত্তের বিশিষ্ট স্বররচনা-সকল রাগপ্রধান বাংলা গানের ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছে এবং তাকে তার বর্তমান উন্নত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে দিলীপকুমার ও তাঁর অন্যতম সঙ্গীতগুরু ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের দানও বড় কম নয়।

কিন্তু ইদানীং রাগপ্রধান বাংলা গানের তেমন চর্চা নেই। এটি খুবই দুঃখের বিষয়। বাংলা গানের শিল্পীরা সকলেই যেন বড্ড বেশী আধুনিক গানের চর্চায় মেতে উঠেছেন বলে মনে হয়। ফলে দেশে সঙ্গীতের নামে স্বরলয়হীন সানুনাসিক আবৃত্তির চর্চা বেড়ে গিয়েছে। রাগপ্রধান গানের

আদরমান্দ্যের একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এ গানে রাগের সবিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন এবং তার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সাধনার নিষ্ঠা চাই। অধিকাংশ গায়কই এতটা ঝক্কি পোয়াতে নারাজ। তাঁরা সস্তার কারবারী, সস্তায় বাজীমাৎ করতে চান। রাগপ্রধান গানের আঙ্গিক ও শিল্পরীতি আয়ত্ত করতে যে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তা তাঁদের নেই। বাংলা গানের একটা বিশেষ সমৃদ্ধ দিক শিল্পী-সমাজের অবহেলার দরুন ক্রমশঃ বিশীর্ণ হয়ে চলেছে। এ রকম হতে দেওয়া উচিত নয়। বাংলা গানকে স্বরৈশ্বর্যময় করে তুলতে হলে ও তার উন্নতি অব্যাহত রাখতে হলে রাগপ্রধান গানের অনুশীলন একান্ত ভাবেই করণীয়। বাঙালী গায়কসমাজ এ বিষয়ে অবহিত হলে ভাল হয়।

সঙ্গীত ও সাহিত্য

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে কর্মজীবন শুরু করার মুখে কিছুদিন একটি নিদারুণ সমস্যা দ্বারা প্রপীড়িত হয়েছিলেন। সঙ্গীত ও সাহিত্য এ দুয়েয় প্রতিই রোলাঁর ছোট-বেলা থেকে অনুরাগ এবং দুটি অনুরাগই সমান প্রবল। উভয় শিল্পকলাই তিনি সমান অভিনিবেশের সহিত অনুশীলন করে এসেছেন। কিন্তু কর্ম-জীবনের সূচনায় যখন জীবিকা নির্বাচনের প্রশ্ন এল, তিনি সাহিত্যকে জীবিকা করবেন কি সঙ্গীতকে জীবিকা করবেন এই প্রশ্নে সহসা মনস্থির করে উঠতে পারলেন না। অন্তরে চলল প্রবল আলোড়ন, দ্বিধা ও দোতুল্যমানতা; তৌলদণ্ডে সাহিত্যাসক্তি ও সঙ্গীতাসক্তির পরিমাপ ও পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যেরই জয় হল। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফলে বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক রূপে রোলাঁ ইতিহাসের স্বীকৃতি পেলেন।

জীবিকার ব্যাপারে সাহিত্যকে অবলম্বন করলেও রোলাঁর পক্ষে সঙ্গীতাসক্তি পরিহার কবা সম্ভব হয় নি। সঙ্গীতকে তিনি ছাড়তে চাইলেও সঙ্গীত তাঁকে ছাড়ে নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীত তাঁকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছে। রোলাঁ মুখ্যতঃ সাহিত্যিক হলেও একজন প্রধান সঙ্গীতজ্ঞও বটেন। সঙ্গীতসমালোচক, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনীকার ও পিয়ানোবাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি কম নয়। সঙ্গীতে তাঁর যেরূপ প্রতিভা, তাতে সাহিত্যকে অবলম্বন না করে তিনি যদি সঙ্গীতকে অবলম্বন করতেন, সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন। এটা নিতান্ত দৈবঘটনা যে, তিনি সঙ্গীতকে অবলম্বন না করে সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন। সঙ্গীতও তাঁর মূল জীবিকা হতে পারত। মন ও মেজাজের অন্য একটা ফেরতার সময় হয়ত তিনি সাহিত্যকে দ্বিতীয়ের মর্যাদা দিয়ে সঙ্গীতকেই প্রথমের মর্যাদা দিতেন এমন সম্ভাবনা তাঁর বেলায় অকল্পনীয় ছিল না।

আসলে সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। সকল শিল্পকলারই মর্মকথা এক। আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার প্রেরণা থেকেই শিল্পের

সৃষ্টি, তা সে সঙ্গীতই হোক সাহিত্যই হোক আর অন্য কোন শিল্পই হোক। প্রতি শিল্পরূপের প্রকাশ আলাদা, প্রকাশের উপায় আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য হল যে কোন একটা 'ফর্মের' মাধ্যমে মানুষের স্বভাবের গভীরে যে শিল্পী সত্তা রয়েছে তাকে অভিব্যক্ত করা। অভিব্যক্তিটা কখনও হয় কথায় (যেমন সাহিত্যে), কখনও রেখায় (যেমন চিত্রে), কখনও সুরে (যেমন সঙ্গীতে), কখনও ভঙ্গিতে (যেমন অভিনয়ে), কখনও ছন্দে (যেমন নৃত্যে) ; কিন্তু অভিব্যক্তির রহস্য সর্বত্র এক।

জীবিকার ক্ষেত্রে রোলাঁ সাহিত্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতকে পরিহার করতে পারেন নি এর থেকে এইটিই বোঝায় যে, জীবিকা অর্জনের বেলায় সাহিত্য ও সঙ্গীতকে দুটি আলাদা ভাগে ভাগ করা সম্ভব হলেও ব্যক্তিজীবনে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে তাদের ওভাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রতি যাঁর আকর্ষণ সমান তীব্র, তাঁকে এ দুয়েরই দাবি পূরণ করতে হবে। কেন না এইটিই তাঁর বিধিলিপি ; বিধাতা-পুরুষ সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁর মনোযোগ বিভক্ত করে তাঁকে সংসারে পাঠিয়েছেন। এই বিধাতৃ-আরোপিত নিয়তির ভার তাঁকে আমৃত্যু বহন করতে হবে। ঘড়ির দোলকের মত একবার তিনি সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকবেন, একবার সাহিত্যের দিকে। দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা তাঁর আজন্মের সহচর।

এ কথার তাৎপর্য এই যে, রোলাঁ এবং তাঁর ন্যায় মানসিকতা যুক্ত ব্যক্তিদের (আমাদের দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, দিলীপ রায় প্রমুখকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়) আত্মপ্রকাশের পথ দ্বিমুখী হতে বাধ্য ; নিরবচ্ছিন্ন একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করা তাঁদের স্বভাবধর্মের বিপরীত। যে ব্যক্তি প্রকৃত কবি কিংবা সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গীতে আসক্তি আছে যদি প্রমাণ করা যায় তা হলে অনায়াসে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে, তাঁর আত্ম-অভিব্যক্তির প্রয়াস সাহিত্য ও সঙ্গীত এই দুই ধারাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। সাপের জিহ্বার ন্যায় তাঁর অভিনিবেশ এবং আগ্রহ দ্বিখণ্ডিত হতে বাধ্য। অবশ্য সকল কবিই যে সঙ্গীতকার হবেন এ কথা বলা চলে না। সঙ্গীত সম্পর্কে আসক্তি এবং কিছু পরিমাণে স্বভাবপটুত্ব থাকা চাই। সঙ্গীতাসক্তি ও সাহিত্যাসক্তি পাশাপাশি বিধৃত থাকলে তবেই উপরের মন্তব্য সার্থকভাবে প্রয়োগ করা চলে।

উদ্ধৃত নামগুলি থেকে দুটি নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে এ দুটি দৃষ্টান্ত খুব ফলপ্রদ। যুগপৎ সঙ্গীত ও সাহিত্যনিষ্ঠার এর চাইতে চমৎকার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি ও গীতিকার। শুধু গীতিকার বললে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়; তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার। ইউরোপে শ্রেষ্ঠ সুরকারদের (composer) যে মর্যাদা দেওয়া হয়, সুরকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা তার চাইতে কোন অংশে কম নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথকে আমরা মুখ্যতঃ কবি বলে জানি। কবি যদি জীবনে আর কিছু নাও লিখতেন, শুধু অপূর্ব ভাব ও সুরসমৃদ্ধ গানগুলিই তাঁর একমাত্র দান হত, তা হলেও তিনি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে বিশ্ববাসী তাঁর প্রতিভার স্মৃতির নিকট অভিভূত চিত্তে তেমনি মাথা নত করত।

আসলে কবির সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্যে মূলগত কোন তফাৎ নেই। ও দুটি বিষয় একই বস্তুর রকমফের মাত্র। যে দুর্নিবার প্রাণচাঞ্চল্য তাঁর লেখনীমুখে অজস্র কথা ও শব্দের আকারে অফুরন্ত উচ্ছ্রিত হয়েছে, সেই প্রাণচাঞ্চল্যই আবার সুরের পাখায় ভর করে তাঁর কণ্ঠে সংস্থিত হয়েছে। কবির ভাবাবেগ কখনও কথার মালা গেঁথেছে, কখনও সুরের মালা। কখনও পুঞ্জ পুঞ্জ কথার ভারে তাঁর লেখনী নুয়ে পড়েছে; কখনও পুঞ্জ পুঞ্জ সুরের ভারে তাঁর কণ্ঠনালিকা বেপথুমতী হয়ে উঠেছে। কথা ও সুর; সুর ও কথা। কথার বলাকা ও সুরের বলাকার অন্তহীন শূন্যসঞ্চরণ। অপ্রতিরোধ্য প্রাণচাঞ্চল্য ও সৃষ্টিপ্রেরণার স্রোত দুটি ধারায় কেটে কেটে, ফেটে ফেটে পড়তে চাইছে কবির কাব্যে ও সঙ্গীতে।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও ওই একই কথা। কাজী নজরুলের সৃজনী প্রতিভা খুব উচ্চস্তরের কিনা এই নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, ভাবাবেগের প্রাবল্যে তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত সততচঞ্চল। কাজী নজরুলের প্রতিভার মূল অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব, তাঁর কাব্য এবং সঙ্গীতের স্রোত একই উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে। সে উৎস দুরন্ত প্রাণের অদমনীয় স্ফূর্তি। এই স্ফূর্তি কখনও সুরে কখনও কথায় অভিব্যক্ত; মেজাজের এক একটা মোড়-ঘুরতিকে

আশ্রয় করে সেই অভিব্যক্তি তৎকাল-বলবৎ ভাব অনুযায়ী স্বর বা কথার রূপ নিচ্ছে। কাচের আবরণের বিভিন্নতায় আলো কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও ফিকে সবুজ; কিন্তু তাদের সকলেরই অন্তঃসঞ্চারী প্রবাহ এক—বিদ্যুৎ। নজরুলের গান এবং কবিতা সম্পর্কেও এই কথা।

এই কারণে দেখতে পাই, নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের দোষগুণ ঠিক একই প্রকারের। কাজীর কবিতা যেমন আত্যন্তিক মাত্রায় আবেগ-প্রধান এবং সেই হেতু অসংস্কৃত ও অসংহত, তেমনি তাঁর গানও অত্যন্ত বেশী আবেগনির্ভর এবং তার রূপ অমার্জিত ও অপরিচ্ছন্ন। নজরুলের গানের ভিতর আয়াসপ্রসূত পরিমার্জনার ছাপ আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। আবেগের প্রাবল্যে স্বর প্রথমে যে রূপ ধারণ করল শেষ অবধি তাই রয়ে গেল, তাকে আর কাজী সংস্কৃত ও সংহত করবার চেষ্টা করেন না; প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের ধারা এটা নয়। তাঁরা যা-কিছু সৃষ্টি করেন আবেগের তাগিদেই সৃষ্টি করেন, কিন্তু একবার জিনিসটা দাঁড়িয়ে গেলে আরম্ভ হয় তাকে নিখুঁত করবার আরামবর্জিত অবিরাম প্রচেষ্টা; চলতে থাকে অন্তহীন পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন। যতক্ষণ না শিল্পবস্তুর রূপ শিল্পীর মনোগত রূপের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ এই সংস্কারপ্রচেষ্টা চলতেই থাকে।

কাজী নজরুলের কবিতা অথবা গান এ দুয়ের কোনটিতেই এই প্রথম শ্রেণীর শিল্পিসুলভ সজ্ঞানতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আদিম যুগের মাতৃ-প্রধান সমাজের দায়িত্ববোধহীন জনকের ন্যায় তিনি যেন সৃষ্টি করেই খালাস; তার পর আর তাঁর কোন দায় নেই। কাজী সাহেবের গানের কথাই বলি। বাংলা দেশে আর কোন সুরকার এত বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। খেয়াল, ভাঙা খেয়াল, ঠুংরী, গজল, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, ভাটিয়ালী, মারফতী, লাউনি, বিভিন্ন বিদেশী লোকসঙ্গীতের সুরের অনুকরণে বাংলা গান প্রভৃতি নানা ভিন্ন শ্রেণীর গানে তিনি সুরযোজনা করেছেন। হিন্দী খেয়াল ভেঙে যেমন তিনি বাংলা খেয়াল রচনা করেছেন তেমনি এই ক্ষেত্রে তাঁর আর একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হল, লুপ্ত অর্ধলুপ্ত রাগিণীর পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁর বিরামহীন প্রচেষ্টা। কিন্তু যে কথা আগে বলেছি, তাঁর কোন গানের রূপই সংহত নয়। তাঁর সবই এবড়ো-খেবড়ো,

ভাঙাচোরা, বন্ধুর। সচেতন মননশীলতার আপেক্ষিক অভাবই এইরূপ হওয়ার কারণ। গুণ ও দোষের দিক থেকে কাজী নজরুলের কাব্যসঙ্গীতের মধ্যে আশ্চর্য মিল। বোধ করি প্রত্যেক সাহিত্যিক-সঙ্গীতকার সম্পর্কেই এ কথা খাটে।

দিলীপকুমারের কথাই ধরুন। দিলীপকুমারের সাহিত্যে মুখরতা অত্যন্ত বেশী; তেমনি তাঁর সঙ্গীতেও। কি রচনায়, কি গানে দিলীপ রায় আরম্ভ করতে জানেন, থামতে জানেন না। এই ছেদহীন, একটানা চলবার তাগিদটা দিলীপকুমারের ব্যক্তিত্বের একেবারে গভীরে অনুস্যূত। তিনি সাহিত্যই করুন আর সঙ্গীতই করুন, নিয়তিনিরূপিত স্বভাবকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে যাঁদের সঞ্চরণ, একই কালে যাঁরা এ দুটি বস্তুর চর্চা করেন, তাঁদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমেই স্মরণ রাখা দরকার, এঁদের বেলায় সাহিত্যচর্চা নিছক সাহিত্যচর্চা নয়, তা সঙ্গীতচর্চাও বটে। অনুরূপ ভাবে তাঁদের সঙ্গীতচর্চাও সাহিত্যচর্চার পবিপূরক। একটির অনুশীলন দ্বারা অপরটিরও অনুশীলন করা হয়। ধরুন আপনি রচনার 'ফর্ম' সম্পর্কে অমনোযোগী। এই ক্রটি সংশোধনের জন্য আপনি সজ্ঞান প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন. যত্ন আয়াস ও অভিনিবেশের দ্বারা অবিন্যস্ত অসংযমকে নিরাকৃত করে লেখায় সংযমশৃঙ্খলা আনলেন; কিছুদিন বাদে অবধারিত ভাবেই দেখবেন যে আপনার গানেও তদনুপাত সংযোমবোধ সুমিতিবোধ এসেছে, যা আগে ছিল না। সাহিত্যরচনায় আপনি যদি প্রতিটি কথা মেপে মেপে বসানোর দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হন, প্রতিজ্ঞা করেন যে অর্থহীন কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি কথাও আপনি প্রয়োগ করবেন না; তা হলে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যেমন আপনার লেখার অশেষ সৌকর্য সাধিত হবে তেমনি আপনি বিস্মিত হয়ে দেখবেন, আপনার গানেরও তাতে আশাতীত উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে আপনি যত্রতত্র তানকর্তব প্রয়োগ করতেন, দেখা যাবে এখন সেখানে আপনার তানবিন্যাসে এসেছে শৃঙ্খলা, সুরবিস্তারের পূর্বতন জড়তা কেটে গেছে, সুরে এসেছে স্থিতি, গভীরতা, স্পষ্টতা। অবশ্য আপনার সাঙ্গীতিক শক্তির বিকাশের জন্য আলাদা ভাবে আপনাকে কণ্ঠসাধনা করতেই হবে, সে

প্রয়োজনীয়তা কোনমতেই পরিহার্য নয়। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের সযত্ন অনুশীলন দ্বারা আপনি একই কালে আপনার সাঙ্গীতিক প্রকাশভঙ্গিকেও অনেকখানি পরিমার্জিত করতে পারেন। সাহিত্যের ভাবরূপ ও সঙ্গীতের ভাবরূপ কিছু আলাদা বস্তু নয়। কাজেই সাহিত্যচর্চার দ্বারা একই কালে সঙ্গীতচর্চারও পোষকতা করা হয়। উল্টো, সঙ্গীতের অনুশীলন সাহিত্যানুশীলনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে গায়কেব সুর চঞ্চল সে যদি সুরে স্থিতি আনবার ঐকান্তিক প্রয়াস করে, তার সেই ঐকান্তিকতা অজ্ঞাতসারে তার রচনাকেও প্রভাবিত করবে। ফলে তার ভাষা হবে দৃঢ়তর, ভাব স্বচ্ছতর এবং রচনার গতি হবে অধিকতর চারুভঙ্গিম। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রুশোর সঙ্গীতবোধ অতিশয় প্রখর ছিল। সমালোচক-দের মতে রুশোর অসাধারণ ভাষানৈপুণ্যের মূলে ছিল তাঁর এই সহজাত সঙ্গীতবোধ। রুশোব শ্রুতিসচেতন কান শব্দ ব্যবহারে বরাবর ধ্বনিময়তা ও ছন্দোশৃঙ্খলার নীতি মেনে চলত। যে বাক্য কানের অনুমোদন পেত না সে বাক্য তিনি বাতিল করতেন। ফলে ভাষা হয়ে উঠত সুরানুগ, সৌন্দর্যমুণ্ডিত। সঙ্গীত ও সাহিত্যের নিগূঢ় যোগ এতে প্রমাণিত হয়।

দেখা যাচ্ছে অভিনিবেশটাই আসল কথা। যাঁর অভিনিবেশ যত গাঢ় যত অখণ্ড, তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টা তত সার্থক। এই শিল্পপ্রচেষ্টা সাহিত্যও হতে পারে, সঙ্গীতও হতে পারে, আবার ব্যক্তিবিশেষে অন্য কিছুও হতে পারে। শিল্পরূপ গৌণ, শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে সযত্ন মনোভাব এবং অখণ্ড মনোযোগটাই হল মুখ্য। যাঁর স্বভাবে এই অভিনিবেশক্ষমতা আছে তাঁর শিল্পকর্মের আর মার নেই।

একটি জিনিস লক্ষ্য করে পীড়া বোধ করেছি। বাংলার আধুনিক সাহিত্যিকদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গীতের তেমন সক্রিয় যোগ নেই। দু'একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অধিকাংশ সাহিত্যিকই সঙ্গীত সম্পর্কে উদাসীন। গায়ক-বাদকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সংস্কৃতি ও সাহিত্যজগতের আন্দোলন-আলোড়নের সামান্য খোঁজখবরও তাঁরা রাখেন না, রাখবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। শামুকের ন্যায় দিবারাত্র সঙ্গীতবিদ্যার খোলের ভিতর গুটিয়ে থেকেই তাঁদের আনন্দ। সাহিত্য ও সঙ্গীতের

মধ্যে এই বিয়োগ, এই কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা যে সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির পক্ষে কল্যাণকর নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃতির কল্যাণের মুখ চেয়ে সঙ্গীত ও সাহিত্যের এই ব্যবধান অবিলম্বে ঘোচাবার চেষ্টা করা উচিত।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা গান

'আধুনিক বাংলা গান' পদবাচ্য সঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এ কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, কিন্তু তাদের ভিতরকার তফাৎটা তলিয়ে দেখি না। আধুনিক বাংলা গান নিঃসন্দেহে একটি নূতন আন্দোলন; রবীন্দ্রসঙ্গীত তার ভিত্তি হতে পারে, তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য যতটা, পার্থক্য তার চাইতে ঢের বেশী। সেই পার্থক্যবিচারই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক বাংলা গানের সৃষ্টি হয়েছে ইদানীংকার কয়েকজন পরিচিত সুরকার ও গায়কের সমবেত প্রচেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনবোধে এক সুরে ভিন্নতর সুর মেশাতেন। সেই আদর্শের প্রভাব অজ্ঞাতসারে আধুনিক সুরকারদের উপর কাজ করে থাকবে, কিন্তু নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা গানের মূল প্রেরণা এসেছে হিন্দুস্থানী গানের পদ্ধতি থেকে। যে-কোন আধুনিক বাংলা গান শুনলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। তার ভঙ্গি, রূপ ও রস রবীন্দ্রসঙ্গীতের থেকে আলাদা। সুরযোজনার ভঙ্গিতে যদি বা কিছু মিল দেখা যায়, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ একটি মূল সুরের আশ্রয়ে গান দাঁড় করাতেন। তাঁর ভীমপলশ্রীর গানে আগাগোড়াই ভীমপলশ্রীর আমেজ থাকত; ভৈরবী সুরের গানে ভৈরবীর আমেজটিই ছিল প্রধান। পিলু সুরের গান মুখ্যতঃ পিলু সুরটিকেই লীলায়িত করতে চাইত। কবি সুরের মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, তবে তিনি যেভাবে সুরের মিশেল দিতেন তাতে কোন কিছু স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ ছিল না, সবটা প্রক্রিয়াই চলত আড়ালে-আবডালে।

আধুনিক বাংলা গানে ঠিক তার উল্টো। এখানে মিশ্রণটুকু নির্লজ্জভাবে অবারিত—যেন চোখে (কানে) এসে লাগে। যে-কোন আধুনিক বাংলা গানে আস্থায়ী থেকে সঞ্চারীতে আসতে সুর যেভাবে বদলে যায় তাতে সুরের মিশ্রণ অতিশয় প্রকট। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই মিশ্রণ ফল্গুধারার মত আড়ালে আড়ালে চলে—সর্বদাই তার গতি লোকচক্ষুর অগোচর। আধুনিক বাংলা গানে এই মিশ্রণ আপনাকে তারস্বরে ঘোষণা করে। যে গায়

অথবা যে শোনে উভয়েই সে সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। এই বিশ্লেষণাত্মক চেতনা ভাবপ্রকাশের প্রতিবন্ধক।

আর একটি তফাৎ এই যে, কবি সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যেই শুধু মিশ্রণ ঘটাতেন—একটি অসম রাগের সঙ্গে আরেকটি অসম রাগের মিশ্রণ সমর্থন করতেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভীমপলশ্রীর সঙ্গে বড় জোর সমজাতীয় খাম্বাজ, পিলু, কাফি, পটদীপ, ধানী, ধানেশ্রী প্রভৃতি সুরের মিশ্রণ চলতে পারে; কিন্তু ভীমপলশ্রীর সঙ্গে পুরিয়া, অথবা মল্লার জাতীয় রাগিণীর সঙ্গে পুর্বী-মার্বা শ্রেণীর রাগিণীর মিশ্রণ কদাচ নয়।

এ বিষয়ে আধুনিক সুরকারেরা নিরঙ্কুশ। এঁরা নির্বিচারে রাগিণীর মিশ্রণ চালান, রাগিণীগুলির মধ্যে গোত্রসম্বন্ধ আছে কিনা তার বড় একটা বাছবিছার করেন না। তাঁরা যে 'ঠাট' প্রকরণ জানেন না এমন নয়, কিন্তু এইপ্রকার মিশ্রণকে খুব দোষাবহ মনে করেন না। যেমন ধরুন, দেশ-এর ঠিক পরেই বাগেশ্রী কিংবা পুরিয়া, ভৈরবীর ঠিক গায়েই বেহাগের খোঁচ—এরকম মিশ্রণ আধুনিক বাংলা গানে আজকাল হামেসা চলছে। এই ধরনের মিশ্রণ নিন্দনীয় সন্দেহ নেই।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। যেমন ধরুন কবির প্রসিদ্ধ "দিনশেষে রাঙা মুকুল" গানটি। আগাগোড়া পূরবী সুরের একটা নিঃসাড় প্রবাহ এর ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। অবশ্য এই পূরবী সুর আর মার্গসঙ্গীতকথিত পূরবী সুর এক নয়, তা হলেও বাংলা দেশে কবিপ্রযুক্ত সুরটিই সাধারণতঃ পূরবী সুর নামে প্রচলিত। কিংবা কবির সর্বশেষ রচনা "সম্মুখে শান্তি পারাবার" গানটির কথা ধরা যাক। সেখানেও একই পূরবী সুরের লীলা। একটু পুরিয়া-ধানেশ্রীর আমেজ হয়ত আছে—কিংবা দুটো একটা ভিন্ন সুরের খোঁচ—কিন্তু সে-সব মূল সুরের সঙ্গে চমৎকার মিশ খাইয়ে গেছে। ছোট ছোট স্রোতের ধারা যেমন করে বড় নদীর ধারাতে এসে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় এ যেন ঠিক তাই। অথবা তাঁর বাউল গান। যেমন "সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে", "কবে তুমি আসবে বলে" অথবা "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে" প্রভৃতি। সবগুলি গানেই মুখ্যতঃ বাউল সুরের ঝিলিমিলি—তাতে অন্য সুরের প্রভাব যে নেই তা নয়, তবে মূল রসটি বাউলের। "হে ক্ষণিকের অতিথি" অথবা "কি মায়া লাগল চোখে" প্রভৃতি গানগুলিতে তেমনি মূল

ভাবটি হল ভৈরবীর, অন্যান্য মিশ্রিত (যদিও সামান্য) স্বরের ভাব মূল ভাবটিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেন একদেহে লীন হয়ে আছে।

কিন্তু আধুনিক বাংলা গানে স্বরমিশ্রণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে ভোরবেলাকার স্বরের সঙ্গে দুপুর বেলার স্বরের গলাগলিতে কেউ আপত্তি করে না, এমনকি সাঁঝবাতির স্বরও প্রয়োজনবোধে (বাণীর তাৎপর্য অনুযায়ী) সকালবেলার স্বরের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে পারে। সেখানে গোধূলি আকাশের তারার সঙ্গে শুকতারার দিব্যি হাতছানি চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্বরসাগরের স্বর-দেওয়া "নমো নমো বরণীয়" গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মূল স্বরটি রয়েছে যোগিয়ায়; অথচ দেখুন, বাণীর সহিত সঙ্গতি রাখতে গিয়ে সঞ্চারীর স্বরকে করা হয়েছে পূরবী-ঘেঁষা। এটা সত্যই একটু বিসদৃশ। তার পর কুমার শচীন দেববর্মন গীত "এই মহুয়া বনে" গানটির কথা ধরুন। সেখানে দেশ স্বরের ভাবটি প্রবল অথচ সঞ্চারীতে একরকম জোর করেই বাগেশ্রীর আমদানী করা হয়েছে। কিংবা তাঁর 'বিদায় দাও গো মোরে, উমা সতী কেঁদে কয়" নামক বিজয়ার গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর আস্থায়ী আরম্ভ হয়েছে পুরিয়ায়, অন্তরায় পুরিয়া ও দেশ-এর মিলন ঘটানো হয়েছে এবং গান শেষ হয়েছে কীর্তনাঙ্গ স্বরে। স্বরগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত মিল আদৌ নেই। এ-জাতীয় মিশ্রণ শ্রুতিসুখকর না হওয়াই স্বাভাবিক। এই ধরনের মিলনের ফল কখনও ভাল হয় না, সর্বদাই উভয় পক্ষের ভিতর খিটিমিটি লেগে থাকে। পদ্মা ও মেঘনা একসঙ্গে মিশেও যেমন যে যার ধারা ও জলবর্ণ অব্যাহত রেখে চলেছে এও অনেকটা সেইরকম। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মত তা পরিপূর্ণ মিলনে সার্থক নয়।

এ তো গেল আধুনিক বাংলা গানের অপ্রশংসার দিক। প্রশংসার দিকও কিছু আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পিঠে সেই প্রশংসাকে একবার যাচাই করা যাক।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যাকে স্বরের স্থায়িত্ব বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তার একান্ত অসদ্ভাব। গান গাইবার সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়কদের লক্ষ্য থাকে মুদারা অথবা তারার সা পর্দায় এসে স্বর যেন স্থায়িত্ব লাভ করে, যেন খরজের স্বর সমস্ত ঘরের আবহাওয়ায় গম্‌গম্‌ করে—এক কথায় তাঁরা স্বরের 'ধুন' সৃষ্টি করতে চান। আধুনিক রাগপ্রধান বাংলা গানের গায়করা

তাঁদের কণ্ঠে এই কৌশলটির সফল প্রয়োগ করেন দেখা যায়। গানের সুর 'সা'-য়ে ফিরে ফিরে আসে কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাকে গ্রামান্তরে বিহার করতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত সুরের আবহাওটাটাই মাটি হয়ে যায়—মনে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব জাগে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁরা গান তাঁরা এ বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত নন বলে মনে হয়। তাঁদের কণ্ঠে সুর শুধু পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, একটি পর্দায় তা অধিকক্ষণ স্থিতিলাভ করে না। এজন্য গায়কদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের গঠনের মধ্যেই সেই বৈশিষ্ট্যের অভাব।

আরও আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বড় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভঙ্গিমায় সেখানে সুরকার সমস্তটা কৃতিত্ব স্বয়ং আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত ; গায়কের পক্ষে একমাত্র সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের কৃতিত্ব ছাড়া আর কোন কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ সেখানে নেই। আধুনিক বাংলা গানের গায়কদের স্বাধীন স্পৃহা এ বিষয়ে অনর্গল, ইচ্ছামত সুরকে লীলায়িত করতে কেউ তাঁদের আটকাচ্ছে না। ইচ্ছা হয় সুরকে টেনে বাড়াও নয় তো তাকে লাগাম ধরে টেনে রাখো—কেউ বাধা দেবার নেই। কী উজ্জ্বল মুক্তি ভাবুন তো! অবশ্য সীমারেখা কোথাও নিশ্চয় আছে, কিন্তু আধুনিক গায়কের পক্ষে তা মোটেই ভয়াবহ নয়। বর্তমান সমাজে স্ত্রীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার প্রায় অপ্রতিহত, তা হলেও সময় সময় স্ত্রীর আরোপিত অধীনতাটুকু ভোগ করতে মন্দ লাগে না। এ অনেকটা সেই গোছের মধুর পরবশতা—তাতে কারও কৌলীন্য নষ্ট হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রগীতির গায়কেরা সুরকারের হাতের যন্ত্র মাত্র, বড় জোর মিঠে সুরের খেলনা বাঁশী। তাদের স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে, যতক্ষণ না চাবী টেপা হবে ততক্ষণ মুখ খুলতে পারবে না। সুরের উপর স্বাধীন ইচ্ছার 'স্টিমরোলার' চালানো এর থেকে কোন্ অংশে খারাপ বুঝতে পারিনে।

বাংলা গানের কথা

পুরাতন কাল থেকে এ যাবৎ বাংলা গানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার তিনটি স্পষ্টচিহ্নিত ভাগ। প্রথম, প্রাচীন বাংলা গান; দ্বিতীয়, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-অতুল-নজরুল সঙ্গীত; তৃতীয়, আধুনিক বাংলা গান। এর ভিতর প্রাচীন বাংলা গানের ধারা আজ লুপ্তপ্রায়; দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুল-রচিত সঙ্গীত কালেভদ্রে গীত; আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয়তার প্রাবল্য মন্দীভূত। বিগত চতুর্থ দশকের অর্থাৎ তিরিশ আর চল্লিশের অন্তর্বর্তী বৎসরগুলিতে 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় সঙ্গীতের আন্দোলনে যে জোয়ার এসেছিল স্পষ্টতঃই আজ তাতে ভাটার টান লেগেছে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরতরঙ্গে আজ আকাশ-বাতাস মথিত। আর সব-রকমেব সঙ্গীতকে হটিয়ে দিয়ে আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

বাংলার সঙ্গীত জগতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যথার্থ সঙ্গীতামোদীর মনে যুগপৎ আশা-নৈরাশ্য এই দুই ভাবেরই উদয় হওয়া স্বাভাবিক। আশা, কেন না, রবীন্দ্রসঙ্গীত জনমনের উপর যে পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করছে, সে পবিমাণে সাধারণের সাঙ্গীতিক রুচি পরিশীলিত, মার্জিত, অধিকতর সংবেদনশীল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের অনুভূতিকে সূক্ষ্মতর করে তুলতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুল্য সঙ্গীত আর নেই। কিন্তু তাবৎ লাভের পিঠেই একটা ক্ষতির অঙ্ক থাকে—এখানেও আছে। আর তাকেই নৈরাশ্যের কারণ বলা যেতে পারে। নৈরাশ্য, কেন না, নিছক সুরসমৃদ্ধির দিক থেকে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বারা আমাদের সাঙ্গীতিক প্রত্যাশার সম্পূর্ণ পূবণ হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের আদর্শ বড বেশী সরল, বড় বেশী সাদামাঠা, বড় বেশী অলঙ্কাররিক্ত। ভারতীয় সঙ্গীতের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল সুরের বিস্তার—সুরবিস্তারের সৌন্দর্য একবার যাঁর মন হরণ করেছে তিনি কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিরাভরণ, অজটিল সুরে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। বিষয়টি নিয়ে এই প্রবন্ধেই পরে আরও আলোচনা করার অবকাশ হবে, সুতরাং প্রসঙ্গটির আভাস দিয়েই এখানে ক্ষান্ত হলাম।

পুরাতন বাংলা গানের চর্চা বাংলা দেশ থেকে লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে, এটা মোটেই সুলক্ষণ নয়। রামপ্রসাদী সঙ্গীত, নিধুবাবুর টপ্পা, সাধক কমলাকান্তের ভক্তিসঙ্গীত, পুরাতন ঢঙের কীর্তন আজকাল আর কেউ বড় একটা গাইতে চান না।' আজকের দিনের সমুন্নত রুচির মানদণ্ডে পুরাতন বাংলা গানের বাণী অর্থাৎ কথার অংশ কিঞ্চিৎ অমার্জিত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সব গানের সুরের একটা নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল। এই আকর্ষণী শক্তির মূলে ছিল ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সুস্পষ্ট প্রভাব, যার দরুন সে সকল সঙ্গীতের আবেদন সুরনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আজিও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায় নি। আমাদের ছেলেবেলায় যে-সব পুরাতন ঢঙয়ের বাংলা গানের সবিশেষ চলন ছিল তার মধ্যে ছিল—"আজ কেন সই হল এত বেলা নাইতে যাবি নে", "কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত-শীতল রাগে, মোহ-তিমির নাশে প্রেম-মলয় বয়", "তারে ভোলা হল একি দায়, প্রাণ যায়", "বাজে শ্যামের মোহন বেণু" প্রভৃতি গান। কথাংশেব দিক দিয়ে এ সকল গান হয়ত আধুনিক রুচিব দরবারে মোটেই কল্কে পাবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও না মেনে পারা যায় না যে, এ সকল গানের একরাগভিত্তিক ক্লাসিকালধর্মী সুর অদ্যকার দিনের অনেক গানের সুর অপেক্ষাই উৎকৃষ্টতর ছিল। এখন তো বাংলা গানের সুরসমৃদ্ধি ঘটাবার নামে গানের ভিতর সুরের নির্বিচার মিশ্রণ চলছে। এই স্বৈরাচারী সুরমিশ্রণের ভিত্তিতে রচিত আধুনিক বাংলা গান অপেক্ষা পুরাতন দিনের একরাগভিত্তিক বাংলা গানসমূহের সুবের আবেদন যে অনেক বেশী ছিল তা যে কোন সুর-অভিজ্ঞ ব্যক্তিই আশা করি স্বীকার করবেন। কিন্তু কাকে এ কথা বোঝাব? অধিকাংশ লোকই আজ সুর-মিশ্রণের নামে অজ্ঞান—যে-কোন রকমের একটা মিশ্র সুর হলেই হল, হোক তা সস্তা হোক তা চটুল, কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

রাগ-রাগিণীর মিশ্রণের একটা স্বীকৃত নিয়ম আছে। ইচ্ছা করলেই যে-কোন রাগিণীর সহিত যে-কোন রাগিণীর মিশোল দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র সেই সব রাগ-রাগিণীর পারস্পরিক মিশ্রণ গ্রাহ্য যেগুলি সমপ্রকৃতিসম্পন্ন এক বা অনুরূপ ঠাটের অন্তর্গত। কিন্তু আজকাল এ নিয়ম কদাচ মান্য। যে যেমন খুশি কথার অর্থ অবলম্বন করে সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে যাচ্ছেন। এরূপ ভালমন্দ-বিবেচনাশূন্য সুরের মিশ্রণে যে গানের কৈবল্য ঘটানো হয়, তা

বলাই বাহুল্য। অথচ এ রকম আসুরিক মিশ্রণ আজকাল হামেসা চলছে। এ সব দেখে শুনে এক এক সময় আমাদের মনে হয়, নির্বিচার সুরমিশ্রণের আদর্শ অপেক্ষা একরাগভিত্তিক গানের আদর্শ অনেক বেশী মান্য এবং শেষোক্ত শ্রেণীর গানকেই অধুনা বাংলা দেশে বিধিবদ্ধ ভাবে চালাবার চেষ্টা করা উচিত। নিরঙ্কুশ মিশ্র সুরের প্রভাব যত কমে আসে ততই বাংলা গানের কল্যাণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান আজ আমরা ভুলতে বসেছি, এতে নিজেদেরই বঞ্চনা করা হচ্ছে। বাংলা গানের ঐতিহ্যভাণ্ডারে দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীত কত বড় সম্পদ এ যদি আমরা বুঝতুম, এমন করে তাকে অবহেলা করতে পারতুম না। বাংলা গানের সমৃদ্ধি বিধানে দ্বিজেন্দ্রলালের বড় দান দুটি—এক, হিন্দী খেয়ালের ঢঙে একক রাগের ভিত্তিতে বাংলা গান সৃষ্টি; দুই, ইউরোপীয় ধরনে বাংলায় কোরাস সুরের প্রবর্তন। কোরাস সুরের গানে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্যাপি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রমুখ সুরস্রষ্টারা একাধিক কোরাস গান রচনা কবেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেউ এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে মূলতঃ ভারতীয় ক্লাসিকাল রাগ-রাগিণীকেই অনুসরণ করা হয়েছে; তবু, আশ্চর্য, কেমন করে জানি না তাদের ভিতর একটা ইউরোপীয় সুরের আমেজ আনা সম্ভব হয়েছে। এ সব কোরাসের সুর ভারতীয় রাগ-রাগিণীর দেহ আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, আপাতবিচারে সেটা বোঝাই কঠিন। দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ কোরাসের সুর রচিত হয়েছে ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতি রাগিণীকে অবলম্বন করে, অথচ এমনি রচনার কৌশল যে গোড়ায় সে কথা আদৌ মনে হওয়ার যো নেই—মনে হবে ইউরোপীয় অর্কেষ্ট্রার সুর ভেঙেই বুঝি তিনি এইসব সুর খাড়া করেছেন। কোরাস গানে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের তুলনা হয় না। তাঁর কয়েকটি সুখ্যাত কোরাস গানের প্রথম পদ—(১) "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা", (২) "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ", (৩) যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ", (৪) "মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর, (৫) "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা", ইত্যাদি।

মূলতঃ উল্লিখিত দুই শ্রেণীর গানকে আশ্রয় করে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠলেও কাব্য-সঙ্গীতেও তাঁর দান কিছু কম নয়। বস্তুতঃ, দ্বিজেন্দ্রলালকেই বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বলা যেতে পারে। তদ্‌রচিত "নীলাকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো", "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে নিখিল-বিশ্ব তোমারই প্রতিমা", "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত আজ ভেসে আসে", প্রভৃতি গান কাব্য-সঙ্গীতের কতিপয় উৎকৃষ্ট নমুনা। বিলম্বিত ঢঙে গাওয়া এই গানগুলির বাণী ও সুরের কাব্যধর্মী পেলবতা শ্রোতার কানে বাস্তবিকই মধু বর্ষণ করে। আজকের দিনের শিল্পীরা এ সকল গান যে কেন গাইতে আর তেমন উৎসাহ পান না, বোঝা কঠিন। আমাদের ভিতর দ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক প্রতিভার যথার্থ সমাদর হয় নি বলেই আমার ধারণা, হলে এমন অবস্থা হত না।

অতুলপ্রসাদের গানের প্রকৃতি কিছু ভিন্ন। বাংলা গানের ভিতর হিন্দুস্থানী ঠুংরী গানের রস ও মেজাজ অতুলপ্রসাদ যেমন নিপুণভাবে সঞ্চার করতে পেরেছেন এমন আর কেউ পারেন নি। লক্ষ্ণৌপ্রবাসী অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ ঢঙয়ের ঠুংরী বা 'লছা ঠুংরী'-র ধরনে বাংলা গান রচনা করে বাংলা গানের সুরভাণ্ডারকে নিরতিশয় সমৃদ্ধ করে গেছেন। ঠুংরী গানে সুরমিশ্রণ হামেসা ঘটে থাকে, সকলেই জানেন। খেয়াল গানের মত ঠুংরী গান একরাগভিত্তিক নয়। বস্তুতঃ, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর প্রয়োজনানুরূপ মিশ্রণেই ঠুংরীর সৌন্দর্য। কিন্তু একটি কথা। ঠুংরীতে যে রাগমিশ্রণ ঘটানো হয় তার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, আছে স্বীকৃত নিয়ম। ঠুংরীতে মিশ্র সুরের লীলা প্রকট, তবে যে-কোন রাগিণীর সহিত যে-কোন রাগিণীর মিশ্রণ তথায় সিদ্ধ নয়। যে কথার আভাস পূর্বে একবার দেওয়া হয়েছে, সমপ্রকৃতির রাগের মিলনের আদর্শটি এখানেও সমান মান্য। একমাত্র সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যেই ঠুংরী গানে মিশ্রণ চলতে পারে, চলে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তা সত্ত্বেও উপরের রীতিটিকে ঠুংরী গানের একটি মূলসূত্ররূপে অনায়াসে নির্দেশ করা যেতে পারে।

অতুলপ্রসাদ ঠুংরী গানের এই সর্বস্বীকৃত রীতি বাংলা গানে সর্বাংশে অনুসরণ করে গেছেন। আধুনিক রীতি-সুলভ নির্বিচার, নিরঙ্কুশ মিশ্রণকে তিনি কোথাও তাঁর গানে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর রচিত গানগুলিতে মিশ্রণের

প্রক্রিয়া প্রায় অগোচরে সম্পাদিত হয়েছে বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "কত গান তো হল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়া," "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে" "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে" প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব গানে মিশ্রণ আছে, তবে তার প্রক্রিয়া প্রচ্ছন্ন, কোথাও নিজেকে উচ্চ কণ্ঠে জানান দেয় নি। পক্ষান্তরে একটি মূল রাগকে আশ্রয় করেই এ সব ক্ষেত্রে এক একটি গান লীলায়িত হয়ে উঠেছে।

অতুলপ্রসাদের কোরাস গানও সুবিদিত। তাঁর দুই একটি বিখ্যাত কোরাসের প্রথম পদ—"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির নাহি ভয়", "মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।" বাউল সুরের গান : "যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হল রে উছল রে ভোলা" ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদের গানের সুরের দিক যত সমৃদ্ধ বাণীর দিক তত নয়। তাঁর গানের কাব্যাংশ দুর্বল, ভাষা অযত্নবিন্যস্ত, ছন্দ ত্রুটিযুক্ত। তবে কবির ভাবের আন্তরিকতা অস্বীকার করা যায় না।

কান্তকবি রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগের আর এক জন প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার। তাঁর গানে ক্লাসিকাল সুরভঙ্গি ও বাঙালী-জনোচিত কাব্যভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গান —"তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর, মলিন মর্ম মুছায়ে" (ভৈরবী), "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ" (সাহানা), "ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে" (সাহানা) ইত্যাদি। তাঁর 'বাণী' ও 'কল্যাণী' গ্রন্থ চমৎকার দুটি গীতিমালার সংকলন। দ্বিজেন্দ্রলালের মত তিনিও হাসির গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সঙ্গীত-সংখ্যার দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম, পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলা তথা ভারতবর্ষে তো বটেই, বোধ করি পৃথিবীর সাঙ্গীতিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপনের গৌরব দাবি করতে পারেন। তাঁর গানের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃষ্টিপ্রাচুর্যকে অনেক সময় শিল্পাপকর্ষের নজীররূপে খাড়া করা হয়ে থাকে ; কাজী নজরুলের বেলায়ও এমনতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তাঁর গানের বিরুদ্ধে সাধারণের একাংশের প্রধান আপত্তি এই যে, তাঁর অধিকাংশ গান ফরমায়েসের তাগিদে রচিত, আর সে-কারণ সেগুলি আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্তির কৌলীন্যভ্রষ্ট।

কিন্তু এ-জাতীয় বাহ্য বিচার দ্বারা সৃষ্টিকর্মের যথাযথ মূল্য নিরূপণ করা যায় কিনা সন্দেহ। ফরমায়েসের তাগিদে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি সাধিত হওয়ার বহু নজীর পৃথিবীর শিল্পেতিহাসে আছে। আসলে ফরমায়েসটা হল বাইরের একটা অঙ্কুশ-তাড়না মাত্র, ভিতরে প্রেরণার উৎস না থাকলে শুধু কি অঙ্কুশের খোঁচাতেই সৃষ্টিস্রোত উৎসারিত হয়? সত্য বটে কাজী নজরুল জীবিকার তাগিদে তথা ফরমায়েসের চাপে পড়ে বহু গান রচনা করেছেন, তা বলে তাঁর গানের কোন রকম বৈশিষ্ট্য নেই মনে করলে তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার নিরতিশয় অমর্যাদা ঘটানো হবে। কাজী নজরুল সাধারণের নিকট মূলতঃ বিদ্রোহী কবি রূপে খ্যাত, কিন্তু তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার সে কথাও সমান চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। তাঁর কবি-পরিচিতির তলায় যেন তাঁর সাঙ্গীতিক পরিচয় চাপা না পড়ে।

অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার আবহাওয়ার ভিতর নজরুল-সঙ্গীতকে খাটো করবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। একে ঠিক সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র বলতে চাই নে, তবে চারিদিকে যে নজরুল-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে একটা ফিসফাস-গুজগাজের অভিযান চলছে সে লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এই অভিযান অচিরেই স্তব্ধ হওয়া দরকার।

নজরুল ইসলামের পরে আর একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতকারের নাম করতে পারি। তিনি শ্রীদিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার দীর্ঘকাল যাবৎ সঙ্গীত সাধনা করছেন এবং তাঁর সৃষ্টির দান প্রচুর। কণ্ঠশিল্পী হিসাবেও তাঁর সুনাম কম নয়। কাজী নজরুল ও দিলীপকুমার—এঁদের দুজনার সম্পর্কেই পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাহুল্যবোধে এখানে তাঁদের বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা হল না।

সুরযোজনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমারের পর সবচেয়ে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন লোকান্তরিত হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর মহাশয়। তাঁর দেওয়া সুরের ভিতর মার্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং আধুনিক কালোচিত সুরবৈশিষ্ট্য —এ তিনটি ধারারই সুসমঞ্জস সমন্বয় ঘটেছিল। অধুনা রাগপ্রধান বাংলা গান বলতে যে ধরনের গান বোঝানো হয়ে থাকে, বলতে গেলে হিমাংশু দত্তই তার স্রষ্টা। তবে হিমাংশু দত্তর একটি প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে,

তিনি নিজে গীতরচয়িতা ছিলেন না। বাংলা গানের দরবারে স্বরকার রূপে যাঁদের কৃতিত্ব স্বীকৃত্ব হয়েছে তাঁদের সকলেই একাধারে দুই—গীতরচয়িতা ও স্বরকার। বস্তুতঃ এ দুটি বৈশিষ্ট্য একত্র সমন্বিত হলে তবেই কেউ যথার্থ স্বরকার আখ্যায় ভূষিত হতে পারেন। স্বরসাগরের ব্যক্তিত্বের ভিতর এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় না হওয়ায় তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা আংশিক খণ্ডিত হয়ে ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।*

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গ নিবন্ধের সূচনায় কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে সেটিকে আরও বিস্তারিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক জীবনের দুটি স্পষ্টচিহ্নিত ভাগ আছে। একটি হল একরাগভিত্তিক ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতরচনার অধ্যায়; অন্যটি মিশ্র স্বররচনার অধ্যায়। ১৮৮০ সন থেকে শুরু করে প্রথম ২৫ বৎসরে তিনি যে অসংখ্য ব্রহ্মসঙ্গীত এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য গান লিখেছিলেন সেগুলি প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, আর জীবনের শেষ ৩৫ বৎসর স্বরমিশ্রণের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও ছন্দোময় বিচিত্র যে গান সকল রচনা করেছিলেন সেগুলিকে শেষোক্ত অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তুলনামূলক বিচারে রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের গানগুলি সাধারণ্যে সমধিক প্রচারিত ও আদৃত; তবে কারও কারও পক্ষপাত তাঁর প্রথম জীবনের গানগুলির 'পরে। যাঁরা ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সবিশেষ অনুরাগী, এবং সেখানেও ঠুংরী অপেক্ষা ধ্রুপদ-খেয়াল যাঁদের মনোহরণ করে বেশী, একরাগভিত্তিক স্বর তাঁদের যেমন আকর্ষণ করে মিশ্র স্বরের রচনা তেমন করে না। কবির প্রথম অধ্যায়ের রচিত সঙ্গীতগুলির স্বরের কাঠামোর ভিতর এক ধরনের rigidity থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি যেহেতু এক-রাগের আশ্রয়ে রচিত এবং ঐতিহ্যানুসারী, সেই কারণে তাদের আকর্ষণযোগ্যতার প্রমাণ আরও বেশী করে চোখে পড়ে। তা ছাড়া, এই অধ্যায়ের গানগুলির ভিতর স্বরবিস্তারের (improvisation) তবু যাহোক কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে, কবির পরিণত জীবনের গানে সে অবকাশ মোটে নেই। কবির উত্তর বয়সের গান বড় বেশী সাদামাঠা, বড় বেশী নিরাভরণ। সে সকল গানে স্বর ও বাণীর অঙ্গাঙ্গী সমন্বয় হয়ত সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য স্রষ্টাকে মূল্য বড়

* "স্বরকার হিমাংশু দত্ত" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কম দিতে হয় নি। গানের সুরকে অতিরিক্ত সরল আর উপকরণরিক্ত করে তবেই তিনি এই সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছেন। সুরের দিকে যাঁদের কান স্বভাবতঃ অত্যন্ত খাড়া তাঁরা এই ধরনের অলঙ্কাররিক্ত সুর শুনে কদাপি পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। কবির লোকপ্রিয় সঙ্গীতগুলি mediocre গায়কগায়িকাদের কণ্ঠেই খোলে ভাল। তেমনি, সুর-অনভিজ্ঞ শ্রোতার কাছেই তাদের আবেদন সমধিক। প্রথম শ্রেণীর গায়ক-গায়িকা কিংবা রাগসঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উৎসাহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন এমন নজীর খুব বেশী পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

তা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে আর একটি প্রধান আপত্তি এই যে, সে গানের রূপ বড় বেশী ধরাবাঁধা, পূর্বনির্দিষ্ট। সে গানের নির্ধারিত সুররূপ থেকে গায়কদের একচুল এদিক-ওদিক হওয়ার যো নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্ধারিত রেখাচিহ্নের উপর চোখ বুজে দাগা বুলিয়ে যাওয়া ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের বোধ হয় আর বিশেষ কোন করণীয় নেই। যিনি এ বিষয়ে যত বেশী পটু, তিনি তত বড় রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীরূপে অভিনন্দিত। ব্যক্তিত্বহীন গায়ক-গায়িকাদের নিকট এই অবস্থা কাম্য হতে পারে, কিন্তু সুরবৈভবের আদর্শ যাঁদের মন কেড়ে নিয়েছে, সে শ্রেণীর সুরনিষ্ঠ ব্যক্তি এ ধরনের সাঙ্গীতিক আবহাওয়ায় কখনও সম্যক্ স্ফূর্তি অনুভব করতে পারেন না। তাঁরা চান সুরবিস্তার, শিল্পীর কণ্ঠে অবাধ সুরের লীলায়ন; যে গানে সে অধিকার অস্বীকৃত, সে গান ভাল হলে কত আর ভালো হতে পারে? রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত, সে-কারণ যথার্থ সুরামোদীর নিকট রবীন্দ্রসঙ্গীত অল্পবিস্তর খণ্ডিত হয়ে আছে। সুরের সহজিয়া সাধনের নামে শিল্পীর উপর এত বড় জুলুম ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইতোপূর্বে আর হয় নি।

তাই বলে আধুনিক গান সম্বন্ধেও যে খুব বেশী উৎসাহিত হওয়া যায় তাও নয়। আধুনিক গানের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় অভিযোগ পূর্বেই উপস্থিত করা হয়েছে। নির্বিচার সুরমিশ্রণের স্বেচ্ছাচার আধুনিক গানকে সত্যিকার সুরামোদীর নিকট অগ্রহণীয় করে তুলেছে। আধুনিক বাংলা গানের বাণী-অংশ প্রায়শঃ দুর্বল, অমার্জিত। রুচির এই গ্লানি তার প্রভূত মূল্যহানি ঘটিয়েছে। আধুনিক গানে সুরবিস্তারের স্বাধীনতা আছে

বলে আপাতবিচারে হয়ত কতকটা উল্লসিত হওয়া চলে, কিন্তু যাকে আশ্রয় করে স্বরবিস্তার সেই মূলেই যদি গলদ থাকে, স্বরবিস্তারেরই বা কী সার্থকতা ?

তবে আধুনিক বাংলা গানের একটি শাখা আমাদের ভাল লাগে—স্বরবিস্তারের স্বাধীনতা তার আকর্ষণীয়তার মূল কারণ। স্বরসাগর হিমাংশু দত্ত এই শ্রেণীর গানের প্রধান স্রষ্টা এবং কুমার শচীন দেববর্মন তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিকার। রাগপ্রধান বাংলা গানের বিচিত্র সম্ভাব্যতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এখনও য়থেষ্ট অবকাশ আছে। বাংলা গানের উন্নতিকামী যথার্থ সঙ্গীতামোদীরা এই পথে এগিয়ে এলে একটা সত্যিকারের কাজ হয়।

বাংলার সঙ্গীত

বাংলাদেশে সঙ্গীতের অনুশীলন অবিচ্ছেদে চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে এবং আজও তার ধারা সমান প্রবলতার সহিত বহমান। বাংলার উভয়ভাগেই আজ সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে, এ সত্য চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, বিশেষতঃ তাঁদের মধ্যে যাঁদের কান সবিশেষ খাড়া তাঁদের পক্ষে তো এ জলজ্যান্ত সত্য কোনমতেই এড়িয়ে যাবার জো নেই। গত বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশের বুকের উপর দিয়ে কত যে ঝড়-ঝাপটার তাণ্ডব গেছে তা বলে শেষ করা যায় না; কিন্তু আশার কথা এই যে, তা বাঙালীর সহজাত সঙ্গীতপ্রীতিকে দমিত করতে পারে নি, বরং ওই দুর্দৈবের ফলেই যেন আরও বেশী মাত্রায় তার সঙ্গীতোৎসাহ প্রকাশমান হয়েছে। বাঙালীর প্রাণশক্তি যে কত প্রবল এই ঘটনা থেকে তার অন্যতর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমি বাংলার 'উভয় ভাগের' কথা বলেছি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পটভূমি মনে রেখে আলোচনা করতে কেমন যেন বাধে। বিশেষ, সঙ্গীতের ন্যায় এমন সর্বজনপ্রিয় সার্বভৌম লক্ষণমণ্ডিত শিল্পের বেলায় তো এই রাষ্ট্রিক মানচিত্র-বিভাজন স্বীকার করা আরও কঠিন। বাংলাদেশের সঙ্গীত এক নামেই সর্বত্র প্রচলিত: তার আর পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ভাগ নেই। আমরা আমাদের যৌবনকালে অহরহ মুসলমান ওস্তাদ গায়কদের সঙ্গ করেছি, তাতে কখনও মনে হয় নি নিজেদের অভ্যস্ত আবহাওয়া ছেড়ে ভিন্নতর বা বিসদৃশ আবহাওয়ায় গিয়ে পড়েছি; বরং ওই 'সামান্য' শিল্পপ্রীতির সূত্রে মানুষে মানুষে ঐক্যের বোধ গভীরতর হয়েছে, সাম্প্রদায়িক ভেদ একেবারেই ঘুচে গেছে। সঙ্গীতের মত এতবড় ঐক্যবিধায়ক বস্তু কি আর আছে?

তবু যে বাঙালীর সঙ্গীতকে উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের ধারা থেকে বিশ্লিষ্ট করে এখানে আলাদা ভাবে আলোচনা করতে বসেছি তার হেতু আছে। বাংলার সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের অংশ ও অধীন হলেও তার প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। পরের প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এখানে প্রসঙ্গটির সংক্ষেপ-উল্লেখ করা হল।

বাংলাদেশে দেশী অর্থাৎ লৌকিক সঙ্গীতের ঐতিহ্য যত প্রবল, রাগ-সঙ্গীতের ঐতিহ্য তত নয়। যাকে আমরা ক্লাসিকাল সঙ্গীত বলি সেই হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের চর্চা বাংলা দেশে হয় নি এমন নয়, তবে উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে যে রকম ব্যাপকভাবে হয়েছে সে রকম ব্যাপকতার সহিত এখানে কখনোই হয় নি। এ রকম ঘটবার একটা কারণ এই হতে পাবে যে, বাংলা দেশ প্রত্যন্ত প্রদেশ, ভারতের একেবারে পূর্বসীমায় অবস্থিত, সুতরাং এখানে মুসলমান আমলের দিল্লী বা আগ্রাকেন্দ্রিক দরবার-আশ্রিত রাগসঙ্গীত চেষ্টা সত্ত্বেও খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, মাঝপথে ভৌগোলিক বাধার দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। পাঠান বা মুঘল আমলে বাংলা দেশের যেমন এক প্রকার নামতঃ না হলেও কার্যতঃ কেন্দ্র-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল, তেমনি একপ্রকার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও ছিল। স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই বেশী প্রবল ছিল বলা যায়, কেন না এ স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর মজ্জাগত, বাইরের কোন ঘটনার দ্বারা আরোপিত নয়। বহু বহু ঐতিহাসিক ও মনীষী বাঙালীর এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে লিখে গেছেন, এখানে সে সব কথা পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নেই। তবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য একটি বিশেষ পথ ধরেছিল, সেটি এখানে আলোচনাযোগ্য।

বাংলাদেশে বহুকাল যাবৎ রাগসঙ্গীতের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোস্বামী বংশের সঙ্গীত-নৈপুণ্যের ইতিহাস সুবিদিত। বিষ্ণুপুরের পরেই শহর কলকাতার নাম করতে হয়। কলকাতার অভিজাত ধনিক ও জমিদারদের চেষ্টায়, বিশেষতঃ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে এক সময়ে কলকাতায় রাগসঙ্গীতের সবিশেষ প্রচলন ছিল। উনিশ শতকে কলকাতার ধনীদের মধ্যে রাগ-সঙ্গীতের পোষকতা করা বনেদিয়ানার একটি লক্ষণ বলে গণ্য হত। অনেক ধনী জমিদার শ্রেণীর মানুষই ওস্তাদ পুষতেন, কেউ কেউ নিজেরাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করতেন। রাগসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহর এবং ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, ভবানীপুর, রামগোপালপুর

প্রভৃতি জমিদার-অধ্যুষিত স্থানগুলির প্রসিদ্ধি ছিল। এ বাদে আগরতলা রাজবংশে এবং ত্রিপুরা জিলার শিবপুর (ওস্তাদপ্রবর আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের জন্মস্থান) প্রভৃতি গ্রামেও রাগসঙ্গীতের সবিশেষ অনুশীলন হয়েছে দেখা যায়।

কিন্তু সব মিলিয়ে বিচার করে বলতে হয়, বাংলার সামগ্রিক সাঙ্গীতিক ইতিহাস বা ভূগোলের সামান্য অংশই অধিকার করে আছে এই রাগসঙ্গীতের অনুশীলনের ঐতিহ্য। গোটা দেশের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের তুলনায় এই বিশেষ ঐতিহ্যকে ছিটেফোঁটার বেশী মর্যাদা দেওয়া যায় না। তার কারণ হল এই যে, বাঙালীর জাতীয় প্রতিভা রাগসঙ্গীতের শাস্ত্রানুসারী বন্ধন-পীড়নের মধ্যে কোনদিনই খুব বেশী স্ফূর্তি অনুভব করে নি, শাস্ত্রানুশাসনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে তার প্রাণ অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় লৌকিক সঙ্গীতের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তা অনেক বেশী মুক্তি অনুভব করেছে। শিল্পে মুক্তির স্বাদ যে একবার পায় সে আর পরের তল্পি, তা সে যতই মূল্যবান হোক, বয়ে বেড়াতে উৎসাহ বোধ করে না। নিজের ঘরে অপ্রমেয় সম্পদ থাকতে কে আর পরের আনুগত্য করে? কাজেই বাঙালী রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিত না হয়েও ওই খাতে তার সঙ্গীতসাধনার স্রোতকে কখনও পূর্ণোৎসাহে চালিত করে নি, যেমন করেছে স্বীয় লৌকিক বা দেশী ধারার সঙ্গীতের বেলায়। বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে যে লোকসঙ্গীতের সুর নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্যের মত সদাসঞ্চরমাণ, এবং যার পিছনে একটি দীর্ঘদিনের সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য বর্তমান, তা-ই বরাবর বাঙালীর মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

বাঙালীর জাতীয় মানসের গঠনে আবেগের কিছু প্রাবল্য আছে, এ কথা এ জাতির ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেছেন। বাঙালীর এই সহজাত আবেগাকুলতার সঙ্গে তার সাঙ্গীতিক রুচি ও মেজাজের বিশেষ ছাঁচটির সম্বন্ধ আছে। আবেগের প্রকৃতিটাই এমন যে বন্ধনের ঋজুতার মধ্যে তার প্রকাশ ব্যাহত হয়। খোলামেলা জায়গা না পেলে সে পাখা মেলে উড়তে পারে না। রাগসঙ্গীতের আঁটোসাঁটো শাস্ত্রানুগত্যের পীড়নের মধ্যে সে স্বতঃই আড়ষ্ট বোধ করে। তাই শাস্ত্রবহির্ভূত স্বাধীনতার বিস্তারের প্রতি তার এত লোভ। বাঙালীর সাঙ্গীতিক মেজাজের এই আবেগধর্মিতা,

তার সবটাই ভালো এমন কথা আমি বলব না, বস্তুতঃ এর ফলে সর্বভারতীয় সঙ্গীতের দরবারে আমাদের প্রতিষ্ঠার কিছু হানিও হয়েছে সে কথা অস্বীকার করবার নয়; কিন্তু যা সত্য, জাতিগত ভাবে সত্য, তার তো কোন চারা নেই। প্রিয় হলেও তাকে গ্রহণ করতে হবে, অপ্রিয় হলেও তাকে গ্রহণ করতে হবে। তবে এ সত্যের প্রিয় অংশটি নিতান্ত কম মূল্যবান্ নয়। আবেগধর্মিতার গুণে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালীর যা লাভ হয়েছে সেইটের 'পরে মনোযোগ নিবদ্ধ করাই আমাদের পক্ষে সমধিক উচিত কাজ হবে।

সত্য বটে মুসলমান রাজত্বের কালে মার্গ সঙ্গীতের পূর্বতন বিশুদ্ধতা আর অক্ষুণ্ণ ছিল না এবং পুরাতন শাস্ত্রশাসনও অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল— মুসলমান ওস্তাদেরা প্রকাশ্যতঃই ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে তাঁদের শিল্পী মেজাজের ঝোঁক অনুযায়ী রঙরসের যোজনা করতেন—তা সত্ত্বেও পুরাতন বিশুদ্ধির অনেকটা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পরেও যতটা অক্ষুণ্ণ ছিল তা-ও বড় সামান্য নয়। বাঙালী সঙ্গীতশিল্পী দর পক্ষে এইটুকু বন্ধনও পীড়ন-স্বরূপ ছিল। মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের দরবারে সভাগায়ক সদারঙ্গ এক ধরনের ঢিমা খেয়ালের প্রবর্তন করেছিলেন, যা গাম্ভীর্যে ও বিলম্বিত লয়ের মন্থরতায় প্রায় ধ্রুপদের জ্ঞাতি-কুটুম্ব। এই অতিমন্থর ভারিক্কী চালের গান বাঙালীর ধাতে সয় নি।

ফলে উত্তর ভারতের রাগসঙ্গীতের দিকে বাঙালী তেমন ঘেঁষে নি। তাঁরা বাংলাদেশের স্বকীয় কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি ইত্যাদি সঙ্গীতরূপের চর্চার মধ্যেই অনেক বেশী মুক্তির আনন্দ অনুভব করেছে। রাগসঙ্গীতের চর্চা যে না করেছে এমন নয়, কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশের গানের বিশেষ ঢংটি ওই রাগরূপের কাঠামোর মধ্যে কৌশলে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছে। বাঙালীর যে সহজাত আবেগপ্রাণতা আছে, ওই আবেগের মাধুরী মিশায়ে অতি কঠিনবন্ধ একরাগাশ্রিত ধ্রুপদ বা খেয়াল গানকেও নমনীয় আর সুললিত করে তুলেছে।

কীর্তনের বেলায় এ° কথার যাথার্থ্যের সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কীর্তন বাংলার সঙ্গীতভাণ্ডারের স্বকীয় দান। কিন্তু কীর্তনকে বাংলার লোকসঙ্গীতের সমগোত্র মনে করলে নিতান্তই ভুল করা হবে। কীর্তন স্বতঃস্ফূর্তিসম্বল, অনায়াসপটুত্বনির্ভর লোকসঙ্গীত পর্যায়ের সঙ্গীত নয়, তা

রীতিমত আয়াস ও অনুশীলনসাপেক্ষ গান, সুতরাং বিদগ্ধ বা নাগর সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। কীর্তন বড় বড় রাগের আশ্রয়ে উচ্চ তাল মান লয়ে গেয়। হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের অনেক সুপরিচিত রাগ বাংলা কীর্তনাঙ্গ গানেরও রাগ। অথচ কীর্তন গানের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, তাকে কোনক্রমেই হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের সঙ্গে এক করে দেখা চলে না। বাঙালীর সহজাত সাঙ্গীতিক প্রতিভার জারক রসে জারিত হয়ে কীর্তন সুপরিচিত রাগ ও তালে গেয় হওয়া সত্ত্বেও নিতান্তই বাঙালীর নিজস্ব সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিশেষ মানস-আবহের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে।

কীর্তনের মত সুর হয় না। এ এক অপূর্ব সৃষ্টি বাঙালীর সাঙ্গীতিক প্রতিভার। বৈষ্ণব ভক্তেরা একে বৈষ্ণব ভক্তিরসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মনে করেন। তাঁদের ভাবখানা এই যে, রাধাকৃষ্ণের বিষয়বস্তু ভিন্ন অন্য বিষয়ের গানে কীর্তন সুরের প্রয়োগ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ কথা এতাবৎ সত্য প্রমাণিত হলেও সাঙ্গীতিক বিচারে সুসহ নয়। কীর্তনের সুরের এমন একটা নিজস্ব আবেদন আছে যা বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবেও অপ্রতিরোধ্য। অর্থাৎ বৈষ্ণব ভক্তিরসের গানে কীর্তনেব সুর প্রযুক্ত হোক আর না-ই হোক, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ অবলম্বন করে কীর্তনাঙ্গ গান লীলায়িত হোক আর না-ই হোক, বাণী-নিরপেক্ষ ভাবেও কীর্তনের সুরের একটা মস্ত বড় আকর্ষণ আছে। নতুন যুগের সঙ্গীতকারদের এই নিয়ে চিন্তা করতে বলি এবং ভক্তিভাবের পদ ছাড়াও অন্য পদে কীর্তনের সুর যোজনা করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি। পরীক্ষার ফল যে খুব নৈরাশ্যব্যঞ্জক হবে তা মনে হয় না।

অবশ্য যাঁরা ভক্তিবাদী, আকৈশোর বৈষ্ণব ভক্তির ভাবরসের আবহে লালিত হয়েছেন, তাঁরা কীর্তনের সুর নিয়ে এই-জাতীয় নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে যে খুব বেশী প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করবেন তা বোধ হয় না। তাঁদের সংস্কারে হয়ত এতে আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রসিদ্ধ সুরকার সুবসুধাকর দিলীপকুমার রায়কে একবার এ বিষয়ে যাচিয়ে দেখেছিলাম; তিনি ভক্তিবাদী মানুষ, প্রস্তাবটিকে খুব বেশী উৎসাহভরে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবু বলব, সাময়িক অনুৎসাহে দমিত হবার কারণ নেই; একদিন না একদিন বাংলার সঙ্গীতমহলে এই নিয়ে পরীক্ষার

সূত্রপাত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বদ্ধমূল সংস্কারের মূল ধরে টান দিতে গেলে কিছু সময় লাগেই।

উত্তর ভারতের মুসলমান রাগশিল্পীদের সঙ্গে বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীদের এক জায়গায় মিল আছে। মুসলমান ওস্তাদেরা সঙ্গীতের শাস্ত্রবন্ধনের প্রতি খুব যে একটা বেশী শ্রদ্ধাশীল তা নয়। তাঁরা রাগাশ্রিত সঙ্গীত গাইবার সময়েও আপন মনে স্বরসৃষ্টি এবং স্বরের বিস্তার করেন। স্বরসৃষ্টি ও স্বরবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা তুলনারহিত, আর কোন সম্প্রদায়ের গায়কদের মধ্যে তাঁদের জুড়ি নেই। তাঁরা পণ্ডিত না হতে পারেন, কিন্তু যথার্থ শিল্পী। সঙ্গীতকোবিদ না হতে পারেন, কিন্তু যথার্থ সঙ্গীতগুণী। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রী ভাতখণ্ডেজী মুসলমান ওস্তাদদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে নানা উপলক্ষ্যে তীব্র ভাষা প্রয়োগ করলেও তাঁদের স্বাভাবিক স্বরসৃষ্টির নৈপুণ্যের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। তাঁদের 'শিল্পী' বলে অভিনন্দিত করেছেন। প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের জগতে শাস্ত্রশাসনের কড়াকড়ি ছিল, সঙ্গীতের তাত্ত্বিক দিকটির সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের প্রচলন ছিল, রাগের জ্ঞান ও রাগবিশুদ্ধির আদর্শের প্রতি যথেষ্ট অবহিত হওয়ার অভ্যাস বলবৎ ছিল; কিন্তু স্বরের শিল্পায়িত প্রকাশ সম্পর্কে হিন্দু সঙ্গীতকোবিদেরা ততটা মনোযোগী ছিলেন কিনা সন্দেহ। রাগের বিশুদ্ধি ও কৌলীন্য রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা বোধ করি রাগের স্বরৈশ্বর্যের বিকাশের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেবার অবসর পেতেন না; তাঁদের সময় ও উদ্যমের একটা মোটা অংশ ব্যয়িত হত সঙ্গীত-ব্যাকরণের চুলচেরা বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যানে এবং রাগপ্রকরণ চর্চায়। দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল মূলতঃ হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল এবং আজও সেখানে প্রাচীন শাস্ত্র-সঙ্গীতের আদর্শের আধিপত্য। দক্ষিণী সঙ্গীতের ঋজু কাঠিন্য তথা বিষ্ণু দিগম্বর-প্রতিষ্ঠিত নাসিক গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের সাঙ্গীতিক আদর্শ এবং পণ্ডিত কৃষ্ণরাও, নারায়ণ রাও ব্যাস, পটবর্ধন প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীতের ধাঁচ-ধরন অনুধাবন করলেই বোঝা যায় হিন্দু সঙ্গীতাদর্শের সঙ্গে মুসলমান সঙ্গীতাদর্শের কোথায়, কী কী বিষয়ে পার্থক্য। হিন্দু সঙ্গীতকাররা আচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রানুগত; মুসলমান সঙ্গীতকারেরা ব্রাত্য, সংযমবন্ধন-লঙ্ঘনকারী। শেষোক্ত শিল্পীরা শাস্ত্রের ধার সামান্যই ধারেন। তাঁরা প্রাণের আনন্দে

সুরসৃষ্টি করেন, সুর সর্বত্র শাস্ত্রসীমা মেনে চলল কি না তলিয়ে বিচার করবার মত ধৈর্য বা নিয়মনিষ্ঠা তাঁদের নেই। বিষ্ণু দিগম্বরের পুত্র লোকান্তরিত ডি. ভি. পালুসকর এবং (ধরা যাক) এককালীন প্রসিদ্ধ ঠুংরী-গায়ক মৈজুদ্দিন খাঁর গায়নরীতির তুলনা করলেই এ পার্থক্য প্রতীয়মান হবে। পালুসকর আচারবাদী সংযমনিষ্ঠ, শাস্ত্রানুশাসনের বশংবদ গায়ক; পক্ষান্তরে মৈজুদ্দিন ছিলেন ভাবে-ভোলা বেপরোয়া কণ্ঠশিল্পী। প্রাণের স্ফূর্তিতে গান গাইতেন, শাস্ত্রের রেখাচিহ্নের উপর দাগা বুলিয়ে কণ্ঠে সুর ফোটাতেন না। এমনকি, মৈজুদ্দিনের সম্বন্ধে এ-ও শোনা যায় যে, তাঁর রাগের বৈয়াকরণিক জ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না; শুধু তাই নয়, কোন্ রাগিণীকে ভীমপলশ্রী বলে কোনটিকে বাগেশ্রী; তা-ও নাকি তাঁর জানা ছিল না। অথচ যখন গলায় সুর ফোটাতেন নিখুঁত ভাবে এক-একটি রাগের রূপ প্রকাশ করতেন এবং তাতে আশ্চর্য সুরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতেন। মুসলমান ওস্তাদদের এই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সুরের জাদুতেই ভাতখণ্ডেজী মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মুসলমান কলাবিদ্‌দের এই ব্রাত্যোচিত সঙ্গীতসৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সাঙ্গীতিক রুচি-মেজাজের মিল আছে। এখানকার আবহাওয়াও কতকটা ব্রাত্য, শাস্ত্রবিরোধী, লোকায়ত। মানুষের আবেগ-জীবনের সঙ্গে এখানকার সঙ্গীতের খুবই নিবিড় যোগ। শাস্ত্রের নিয়ম-নির্দেশ অনুসরণ করে জীবনকে একটা সুনির্দিষ্ট ছকের মধ্যে ফেলে স্বস্তিময়, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করার চেয়ে শাস্ত্রের নিগড় ভেঙে অজানার পথের পথিক হবার দিকেই যেন বাঙালী মনের দুর্দমনীয় ঝোঁক: বাঁধন ছেঁড়ায় তার বড় আনন্দ। কি সঙ্গীতে কি শিল্পে সাহিত্যে কি ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সর্বত্র এ কথা সত্য। এ দেশের ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি জাতের পাঁতি ভেঙে সমগ্র বাঙালী জাতিকে একপ্রাণ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; এ দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যিনি সব প্রচলিত ধর্মমতের সমন্বয় ঘটিয়ে এক আশ্চর্য মৌলিক ধর্মমত উপস্থাপিত করেছিলেন জনসমাজের সমক্ষে তাদের দৈনন্দিন কর্মের জীবনকে উন্নত করে তোলবার জন্য; এ দেশে শাস্ত্রসীমাকে উল্লঙ্ঘন করে আউল-বাউল প্রভৃতি কত যে সহজিয়াপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে তার লেখাজোখা নেই; এ জাতির ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নায়ক হলেন রাজা

রামমোহন রায়, যাঁর ভিতর হিন্দু ঐস্লামিক ও খ্রীষ্টীয় এই ত্রয়ী চিন্তাধারার সামঞ্জস্য হয়েছিল; এ দেশের আধুনিককালীন সাহিত্যে কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, যাঁরা দুজনেই দেশী-বিদেশী সূত্র থেকে কাব্যের অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন, কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাদর্শের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমায় নিজেদের আবদ্ধ করে রাখেন নি; সমাজ-সংস্কারের নেতা হলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, যিনি 'লোকাচারের নিতান্ত দাস' ছিলেন না, আমৃত্যু বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছেন সমাজের বহুবিধ অনাচার কদাচার কুসংস্কার দূর করবার সাধনায়; এ দেশের সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ হলেন বিবেকানন্দ, যিনি ধর্মনেতা হয়েও ধর্মের কথা বলেন না, বলেন বীর্যবান হতে শক্তিমান হতে, জাতিভেদের কুপ্রথাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার জন্যে জানান কম্বুকণ্ঠে আহ্বান।

এই যে-দেশের মানুষের মানসিক কাঠামো, সে দেশের মানুষ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যে বিশেষ উৎসাহভরে শাস্ত্র-শাসনের হাতে-ধরা হয়ে চলতে চাইবে, তেমন আশা করা যায় না। তাই তো দেখি, এ দেশে শাস্ত্রসঙ্গীতের চর্চা হলেও শাস্ত্রসঙ্গীতের যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁরা সঙ্গীতজগতের নেতৃত্ব করেন নি, নেতৃত্ব করেছেন রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ কাজী নজরুল ইসলাম দিলীপকুমার হিমাংশু দত্ত প্রমুখ সৃষ্টিধর্মী সুরকারগণ। এঁদের সকলেরই ক্লাসিকাল ধারার সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় ছিল বা আছে, কিন্তু কাউকেই সংজ্ঞার্থে ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ধারক-বাহক বলা চলে না। অথচ দেখা যায়, এঁরাই বাংলার সঙ্গীতের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ। এই আপাত-অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটতে পেরেছে এই কারণে যে, বাংলাদেশে শাস্ত্রের উপর দাগা বুলনোর কৃতিত্বকে খুব বড় করে দেখা হয় না, বড় করে দেখা হয় সৃষ্টিধর্মিতাকে, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারার কৃতিত্বকে। শেষোক্ত মানদণ্ডের বিচারে উল্লিখিত সুরসাধকগণ যে বাংলা গানের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তা কে অস্বীকার করতে পারে? বিস্তার-বিশ্লেষণ করে এ কথা বোঝাতে হয় না এতই স্বতঃসিদ্ধ এ কথার অকাট্যতা।

রাগসঙ্গীতের বেলায়ও দেখি, বাংলাদেশে কণ্ঠনিপুণ অপেক্ষা সৃষ্টিনিপুণের মূল্য বেশী; শাস্ত্রানুগামী অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়শীলের মূল্য বেশী। শাস্ত্রনির্ভরতার তুলনায় আত্মনির্ভরতার সম্মান বেশী বাংলাদেশে। অর্থাৎ পরানুগত্য অপেক্ষা

স্বাধীনচিত্ততা এখানে সমধিক আদৃত। দুজন বিশিষ্ট রাগসঙ্গীতশিল্পীর দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথার প্রমাণ দেওয়া যায়। ৺জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর গোস্বামী বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সঙ্গীত-কোবিদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠস্বর ছিল অতিশয় সুরেলা। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় যাকে বলে 'বোলন্দ্' আওয়াজ, সেই উদাত্ত গম্ভীর নিটোল অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন তিনি। কণ্ঠস্বরের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও গায়নক্ষমতার দিক দিয়েও তাঁর শক্তি অতি উচ্চস্তরের ছিল। স্বরবিস্তার এবং তানকর্তব দুইয়েতেই তিনি সমান সুদক্ষ ছিলেন। অথচ দেখা যায়, এত এত গুণের প্রসাদ সত্ত্বেও ভীষ্মদেবের কাছে তিনি নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের তুলনায় অনেক নীরেস—তাঁর কণ্ঠ ধাতবক্রেঙ্কারযুক্ত, অস্বাভাবিক ভাবে চড়া (হারমোনিয়মের 'এফ্ শার্প' থেকে গান ধরেন), শ্লেষ্মাময়, কিছুটা কর্কশ। অথচ যখন গান আরম্ভ করেন, চকিতে গোটা পরিবেশের বদল হয়ে যায়। সুর যেন কণ্ঠস্বর থেকে মধুর ন্যায় ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। কী সেই জাদু, যার ফলে এই অপেক্ষাকৃত কর্কশ ধাতব আমেজযুক্ত কণ্ঠস্বর থেকেই এমন সুমিষ্ট স্বরলহরীর নির্গম হতে থাকে?—এ আর কিছু নয়, ভীষ্মদেবের অসাধারণ সুরসৃষ্টির ক্ষমতা। এ শক্তির কাছে শাস্ত্রানুগত্য আপনা থেকেই পরাস্ত হয়ে যায়। ভীষ্মদেব যখন সরগম করেন, সে শুধু সা রে গা মা পা ধা নি-র বিন্যাস নয়, সে একটা সৃষ্টি—একটা অপূর্ব সম্মোহন। এ বস্তু একেবারেই অনন্যপরতন্ত্র।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ আর ভীষ্মদেবের রেকর্ডের গাওয়া বাংলা গানগুলির তুলনামূলক বিচার করলেও আমরা উপরের মন্তব্যের যাথার্থ্যের প্রমাণ পেতে পারি। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দী-ভাঙা খেয়ালগুলি ("আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়," "শূন্য এ বুকে পাখী মোর", "দামিনী দমকে" ইত্যাদি) বড্ড বেশী পরিচিত রাগরূপ-ঘেঁষা বাংলা গান, ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ধারাবাহী, শাস্ত্রসঙ্গীতের ঐতিহ্যের স্মারক। তার সঙ্গে তুলনা করুন ভীষ্মদেবের "ফুলের দিন হল যে অবসান", "নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো", "তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি", এ গানগুলি মৌলিক সুরসৃষ্টির এক আশ্চর্য নিদর্শন। এগুলি থেকে প্রতিভার দ্যুতি যেন ঠিকরে ঠিকরে

বেরুচ্ছে। গানগুলি প্রচলিত রাগরূপকে আশ্রয় করে গাওয়া হলেও সুরের জাদুপ্রভাবে রাগের অভ্যস্ত চেহারাটির যেন গোত্রবদল হয়ে গেছে। শোনা যায় বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞরাও এই গানগুলি শুনে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেন। সম্প্রতি ভীষ্মদেবের এক সতীর্থ সঙ্গীতকার শ্রীজীবন উপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানতে পেলুম, জন আর্ভিন নামক এক ইংরেজ সঙ্গীতরসিক (তিনি যুদ্ধকালে তৎকালীন বাংলার গভর্নরের একান্ত-সচিব ছিলেন।) শুধুমাত্র ভীষ্মদেবের বাংলা গানগুলি শোনার জন্যে ভীষ্মদেবের গানের আসরে রাত ভোর করে দিয়েছিলেন। এ থেকে মৌলিক সুরসৃষ্টির মাদকতার সার্বভৌমত্বেরই শুধু প্রমাণ হয়।

এ থেকে আরও যা প্রমাণ হয় তা হল, বাংলাদেশে মৌলিকতারই জয়জয়কার, সৃষ্টিকুশলতারই বিজয়-বৈজয়ন্তী সদা উড্ডীয়মান ; এখানে শাস্ত্র-সঙ্গতির আদর্শের খুব বেশী বাজারদর বা কদর নেই। এ কথা কি রাগসঙ্গীত কি বাংলা ভাষার গান উভয় ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ প্রত্যেকেই ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁরা এই আদর্শেও বাংলা গান বেঁধেছেন, তখন তাকে কাব্যধর্মে ঐশ্বর্যবান্ করেছেন, আবেগে মণ্ডিত করেছেন। ফলে তাঁদের গান সত্যিকারের বাংলা গান হয়ে উঠেছে, নিছক হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের কপি হয় নি। প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রলালের "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে" (জয়জয়ন্তী), "সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই" (বাগেশ্রী), রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক গান, অতুলপ্রসাদের "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে" (তিলক-কামোদ-দেশ মিশ্র) প্রভৃতি। এ সব গানের সুরের বাঁধুনি অনুধাবন করলেই বোঝা যায় বাংলা গানের বিশেষ প্রকৃতিটি। এ নিছক রাগসঙ্গীতের অনুলিপি নয় আবার নেহাত বাংলা লোকসঙ্গীতের জাতভাইও নয়। দুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় মধ্যগ স্বর্ণবিন্দুতে কোথাও এদের অবস্থিতি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা সঙ্গীতের এই বিশেষ ধাঁচ-ধরন মেজাজটিকে বিধিমতে বুঝেছিলেন। তাই দেখতে পাই সঙ্গীতজীবনের প্রথম অধ্যায়ে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদাঙ্গ গানের ঢঙয়ে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেও পরে তিনি সঙ্গীতরচনার এই ঋজু-কঠিন শাসনবদ্ধ সংস্কার থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। মধ্য ও শেষ জীবনের সঙ্গীতরচনার পর্বে তিনি যে সকল গান

রচনা করেছেন তার বাইরেকার রূপটির ভিতর ধ্রুপদের কলি বা 'তুক' বিভাগের কিছুটা আমেজ থাকলেও তার আন্তর রূপের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল : সেখানে বাংলার নিজস্ব লৌকিক সুরের লীলা হিন্দুস্থানী সুরভঙ্গিকে হটিয়ে দিয়ে আপনার বিশেষ দাবি ও অধিকারের জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধ্য ও পরিণতকালীন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের বাঁধুনিতে বাউল সুরের প্রভাব সবিশেষ, এ কথা সকলেই জানেন। এসব বিষয় নিয়ে ইতঃপূর্বে সবিস্তার আলোচনা হয়ে গেছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ করতে চাইনে। শান্তিদেব ঘোষ ও শুভ গুহঠাকুরতা তাঁদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের বই দুইটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। বিশেষ, শুভ গুহঠাকুরতার বইটিতে ('রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা') সুরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে তিন পর্ববিভাগ করা হয়েছে তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতিকে বোঝাবার পক্ষে খুবই সহায়ক। সম্প্রতি শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ' বই (১ম খণ্ড) প্রকাশ করেছেন। তা-ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে একটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। কাজেই এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করবার আবশ্যকতা নেই, শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যখন থেকে রবীন্দ্র-চেতনায় গভীরভাবে প্রতীত হয়েছে যে, বাংলা গানের স্বরূপ হিন্দুস্থানী গানের স্বরূপের থেকে কিছু পৃথক্, তখন হতে তিনি আর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-সংস্কারের বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করেন নি, ধীরে ধীরে বাংলার আপন সুর-ভাণ্ডারের 'বিবিধ রতনের' দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন ; যদিও এ কথা বললে ভুল হবে যে, হিন্দুস্থানী সুরাদর্শের সঙ্গে তিনি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তা তিনি করতে পারেন না, কারণ এ দেশের রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশী সঙ্গীতের ঐতিহ্যের নিবিড় যোগের কথা তিনি মানতেন, যদিও সেই সঙ্গে তাদের প্রকৃতিভেদও স্বীকার করতেন। হিন্দুস্থানী গান আর বাংলা গানের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সঙ্গীতেরও এইরূপ দুই প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আকারে, আর হচ্ছে

কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত ; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'।"

এই ভাবটিকেই তিনি আরও একটু বিস্তার করেছেন পরে, তাতে বাংলা গান আর হিন্দুস্থানী গানের পার্থক্যটি আরও পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলছেন—

"সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে সেখানে তার নিয়ম-সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীত-রীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়-সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।"

অর্থাৎ বাংলা গানের নিজস্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ কবেই চলতে হবে বটে, কিন্তু 'পরম্পরাগত সঙ্গীত-রীতি' অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-রীতির সঙ্গেও যোগ রক্ষা করে চলা চাই। তা না হলে নিয়ম-সংযমেব শুচিতা থেকে ভিন্ন পথে চলার অধিকার জন্মাবে না।

এই কথাটি আমাদের ভাল কবে বোঝা দরকার। আমরা বাংলা গান অবশ্যই ভালবাসি এবং তার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য সর্বপ্রকারে প্রযত্ন করতে আগ্রহশীল, তা বলে উচ্ছৃঙ্খল হবার কোনই অধিকাব আমাদের নেই। সর্বনিয়মবন্ধন, সংযমশাসন অস্বীকার করবার চেষ্টা করলে নৈরাজ্যের বদ্ধজলাব মধ্যে পড়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরতে হবে। বর্তমান বাংলায় বাংলা গান নামে যা চলছে তার সঙ্গে না আছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব যোগ না আছে বাংলা গানেব পরম্পরাগত ঐতিহ্যের যোগ। এ গানের ঢঙ একেবারেই এদেশের সাঙ্গীতিক সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্করহিত, পুরোপুরি বিদেশ থেকে আমদানি। বিদেশেরও শ্রেষ্ঠ সুরের সংস্কারের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, ফিল্মের গানের ছিটেফোঁটা উচ্ছিষ্টের সঙ্গে এর কাববার। ভারতীয় বা বঙ্গীয় অর্থে এ সব গানে সুর বলে কোন পদার্থ নেই। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের গানে কাব্যের প্রভূত আমেজ থাকলেও তাতে সুরের কত-না সম্মোহন। বাণীর কথা ভুলে সাময়িকভাবে সুরের জাদুতেই মজে থাকা যায়। আর

এইসব তথাকথিত আধুনিক বাংলা গানে না আছে কবিতা না আছে সুর। সুরের নামে এ একপ্রকার সানুনাসিক আবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু নয়।

ভাববেন না পুরাতনের প্রতি প্রীতিবশতঃ নূতনের বিরুদ্ধাচরণ করছি। নূতনকে তো আমরা অভিনন্দন জানাতেই চাই, কিন্তু সব সময় তার সুযোগ মেলে কই। আধুনিক সঙ্গীতকাররা সঙ্গীতামোদীদের সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ দিন, দিয়ে সকলের ধন্যবাদভাজন হোন, মনেপ্রাণে তা-ই কামনা করি।

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে সে হচ্ছে বাংলা গান শুধু আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যেই বাংলা গান আখ্যা পায় নি। ওটিকে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশেষ শ্রেণীভেদ রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ বাংলা গান শুধু বাংলা দেশের গান বলেই বাংলা গান নয়, একটি বিশেষ কুলগোত্রচিহ্নমণ্ডিত সঙ্গীতের শ্রেণীর দীর্ঘদিনের একটানা অনুশীলনের ফলে বাংলা দেশের বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাংলা গানের চেহারা নিয়ে ফুটে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্য বলতে যেমন শুধু চলতি কালের সাহিত্যকেই বোঝায় না, একটা বিশেষ ধরনের স্বাদগন্ধযুক্ত বিশেষ চেহারার সাহিত্যকে বোঝায় এও অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার। ভারতীয় সঙ্গীতে আমরা নানা শ্রেণীর গানের উল্লেখ পাই—ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরী ভজন কাওয়ালী গীত ইত্যাদি। বাংলা গানও সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট শাখা। বাংলা গানের মূল্যায়ন এই দিক থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়; নিছক আঞ্চলিকতার মাপকাঠিতে বাংলা গানকে মাপা চলে না।

বালা গানের কী সেই বৈশিষ্ট্য, যার জন্য বাংলা গান নিছক একটি ভৌগোলিক এলাকার সঙ্গীত না হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট শাখারূপে গণ্য হবার যোগ্য? এই প্রশ্নটি নিয়েই বর্তমান নিবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ নিবন্ধের বক্তব্য আঞ্চলিকতার দৃষ্টিতে বিচার না করে সাঙ্গীতিক দৃষ্টিতেই মুখ্যতঃ বিচার করবেন।

প্রাচীন বাংলা গানের কাল থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা গানের সুর-বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলা গান কাব্যপ্রধান, এতে বাণীর মর্যাদা বিশেষরূপে স্বীকৃত। কথা এবং সুরের অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের একটি সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলাই বাংলা গানের উদ্দেশ্য। সঙ্গীতে কথা বড় কি সুর বড়—এই রকমের একটা বিতর্ক অনেক কাল থেকে চলে আসছে। (আজ থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর

আগে 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় এই নিয়ে একটা ধারাবাহিক আলোচনা-ক্রমের সূত্রপাত হয় এবং এই আলোচনায় শেষ অবধি রবীন্দ্রনাথকেও যোগ দিতে হয়েছিল)। এই বিতর্কটি উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বেলায় শুধু প্রাসঙ্গিক বলা চলে; বাংলা গানের ক্ষেত্রে এর কোন কার্যকারিতা নেই। হিন্দুস্থানী গানে কথা অনেক সময় সুরের নিছক অবলম্বন মাত্র, যেমন লতাকুঞ্জের অবলম্বন মালঞ্চ; তার বেশী মর্যাদা কথা সেখানে দাবি করতে পারে না। "বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়" (আমার বাহুবন্ধন খুলে খুলে যাচ্ছে), কিংবা "ননদিয়ারে জিয়া না মানত মোর" (ওগো ননদী, [কানাইয়ের জন্যে] আমার মন মানছে না)—এসব কথার মধ্যে খুব গভীর ভাবের দ্যোতনা আছে বলে মনে হয় না। অত্যুৎসাহী হিন্দুস্থানী প্রেমিকের পক্ষেও এসব কথার মধ্যে গভীর কাব্যসৌন্দর্য বা অনুরূপ গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার করা শক্ত। এসব গান যাঁরা রচনা করেছেন এবং যাঁরা এসব গেয়ে থাকেন তাঁদের উভয়েই জানেন, কথাগুলি শুধু সুরকে কণ্ঠে পরিস্ফুটনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, এদের আর বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। সে রকম ভূমিকা এসব গানের কাছ থেকে কেউ আশাও করে না। উপরে উল্লিখিত গান দুটির কথা তো তবু পদে আছে, এর চেয়েও কত নিকৃষ্ট কথায় গান বাঁধা হয়ে থাকে এবং বড বড় কলাবন্ত সঙ্গীত-কাররা অবাধে সে সব গান গেয়ে থাকেন। ওই নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর হিন্দুস্থানী গানের জগতে কারও নেই। কোন এক সঙ্গীতসমালোচক হিন্দুস্থানী গানকে "কণ্ঠবাদন" আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী গান কণ্ঠের এক প্রকার বাদন (বাজনা) বিশেষ। বাদ্যযন্ত্রে যেমন সুর সৃষ্টিটাই লক্ষ্য, কথার ভূমিকা সেখানে অনুপস্থিত—এও কতকটা সেই রকমের ব্যাপার। 'কণ্ঠবাদন' বড় সুন্দর অভিধা! অভিধাটির মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি থাকলেও একে একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই।

বাংলা গান আদৌ কণ্ঠবাদন নয়। কথার মর্যাদা এখানে সবিশেষ এবং সুরের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত প্রমুখ প্রখ্যাত গীতিকারদের যে কোন গানের পদ পরীক্ষা করলেই এ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। রবীন্দ্রনাথের "তার অন্ত নাই গো যে

আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ", দ্বিজেন্দ্রলালের "ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত এক ভেসে আসে", অতুলপ্রসাদের "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে", রজনীকান্তের "তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম মুছায়ে"—ইতস্ততঃ নির্বাচিত চারটি গানের প্রথম কলি এখানে সংকলিত হল। এ নির্বাচনের ভিতর কোন পরিকল্পনা নেই। এ রকম আরও বহু লাইন উক্ত কবিচতুষ্টয়ের গীতরচনায় পাওয়া যাবে। বিশেষ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভূরি ভূরি। এ থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, বাংলা গানে অন্ততঃ সুর বড় কি কথা বড়—এই বিতর্ক অবান্তর, নিরর্থক। বাংলা গানে কথা আর সুর আপন আপন সৌন্দর্যে মহীয়ান্। বাংলা গানের কথা এতই সুন্দর যে সুর বাদ দিয়ে তাকে নিছক কবিতা হিসাবে পড়লেও তার ভিতর সুরের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। কাব্যস্বাদ বাংলা গানের কলিতে পদে পদে। এ কথা যে শুধু এ কালের প্রখ্যাত গীতিকারদের গীতিরচনার বেলাতেই সত্য তা নয়, প্রাচীন বাংলা গানের বেলায়ও সত্য। আমাদের বাংলা দেশের কোন গানই পুরাপুরি কাব্যস্বাদ বর্জিত নয়, তা ইদানীন্তন সময়ের গানই হোক আর প্রাচীন বাংলা গানই হোক। বিগত যুগের একটি বাংলা গানের পদ: "কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত শীতল রাগে, মোহতিমির নাশে, প্রেম মলয় বয়", কিংবা অন্য একটি গান: "বাঁধ না তরীখানি আমারি নদীকূলে। একা যে দাঁড়িয়ে আছি, লহ না আমারে তুলে॥" আধুনিক রুচির মানদণ্ডে গান দুটির শব্দ-ব্যবহার যে রকমেরই হোক, এদের কাব্যসৌন্দর্য অনস্বীকার্য।

এ রকম ভাবের গান বাংলায় প্রচুর আছে, কিন্তু হিন্দুস্থানী গানে খুব সুলভ নয়। উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী গানে উৎকৃষ্ট ভাব তথা কাব্যস্বাদযুক্ত পদ অতীব বিরলদর্শন (ভজন গানগুলিকে বাদ দিয়ে এ কথা বলা হচ্ছে)। তেমন পদ কিছু থাকলেও সেগুলিও বাংলা গানের কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনীয় কিনা সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গানে হসন্ত স্বরের প্রাধান্য। এ রকমটা যে শুধু ভাষা-বৈশিষ্ট্যের জন্যই হয় তা নয়। (হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় ভাষায় হসন্ত স্বরের ব্যবহার কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই হয়ে থাকে)। অনেক সময় সুরের প্রয়োজনেও এই প্রাধান্য ঘটানো হয়। হসন্ত সুরের উচ্চারণে হিন্দুস্থানী গানের সুর গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে সুবিধা পায়; সেই

কারণে অধিকাংশ হিন্দুস্থানী গানেই হলন্ত স্বরের ব্যবহারের প্রতি গীত-রচয়িতাদের একটা পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। এই পক্ষপাতের সব সময় যে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে তা নয়। তার অর্থ, হিন্দুস্থানী গানে সুরের দাবি মেটাতে গিয়ে পদকে সুরের অনুগত ও অধীন করা হয়। সেখানে সুরটিই আদৃত; কথার ভূমিকা গৌণ। "ফুল্ বন্ কি গ্যাদন্ ম্যয়্ কো মোরি আলি য়েনে হ্যায়্" এই লাইনটির মধ্যে হসন্ত স্বরের আধিক্য লক্ষণীয়। কথার সৌন্দর্য এতে বৃদ্ধি পাক বা না পাক, হসন্ত স্বরের এ রকম বহুল ব্যবহারে সুরের গতি যে অনেক শ্রুতিমধুর ও ছন্দোময় হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে স্পষ্টতঃই বাণীর সৌন্দর্যের হানি ঘটে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এই-জাতীয় হসন্ত-প্রধান পদ অজস্র দেখতে পাওয়া যাবে। বাংলা গানে তেমন নয়। বাংলা গানে হসন্ত পদ নেই তা বলেছি নে—বাংলা ছড়ার ছন্দের কবিতা যাকে ছান্দসিকেরা স্বরবৃত্ত কবিতা বলেন প্রকৃতপক্ষে এই স্বরের ভিত্তিতেই রচিত, এবং এই ছন্দের গানও আছে,—কিন্তু তার ব্যবহার অন্যান্য ছন্দের পদের তুলনায় কম। বাংলা গানে তিন মাত্রা আর চারি মাত্রার ছন্দের ব্যবহারই সমধিক প্রশস্ত। কবিতায় যেটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সেটাকে গানে রূপান্তরিত করলে তা তিন মাত্রার ছন্দের অর্থাৎ দাদরা কিংবা একতালার লয়ে পরিণত হয়। যেমন, বিশ্ব ব্যাপিস্বা | বিরাজিছ তুমি | পাই না কেন, হে | খুঁজিয়া ॥ অথবা, কবিতায় যেটা পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নামে পরিচিত, তা গানে রূপান্তরিত করলে চারি মাত্রার ছন্দে অর্থাৎ কার্ফা কিংবা ত্রিতালের লয়ে পবিণতি লাভ কবে। যথা: পাতকী ব | লিয়া কি গো | পায়ে ঠেলা ভাল হয় | তবে কেন পাপী-তাপী | এত আশা করে রয় ॥ এটি এক চতুর্মাত্রিক ছন্দের বাংলা গান। অবশ্য স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দের গানও ঝোঁক অনুযায়ী ত্রিমাত্রিক বা চতুর্মাত্রিক তালের গানে রূপান্তরিত করা যায়, তবে মাত্রাবৃত্ত বা পয়ার ছন্দের গানেই এইরকম সুযোগ বেশী।

তবে ত্রিমাত্রিক ছন্দের গানই হোক আর চতুর্মাত্রিক ছন্দের গানই হোক, উল্লিখিত গান দুটিতে হসন্ত স্বরের ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত, এটি লক্ষ্য করবার মত। তেমন গানের সংখ্যাই বাংলায় বেশী যাতে হসন্তের ব্যবহার স্বল্পমাত্র বা শূন্যপ্রায়। এটি বাংলা গানের একটি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গানের একটা সামগ্রিক হিসাব ধরলে সম্ভবতঃ দেখা যাবে, তাতে হসন্ত স্বরের পদ অপেক্ষা স্বরান্ত শব্দযুক্ত সংখ্যাই বেশী। যেমন,—

১। ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক-পারে।

২। যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।

৩। আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন বাজে।

৪। বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।

৫। যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।

৬। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে॥

এই রকম আরও গানের নাম করা যায়। একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ গীতিকারদের গানেও স্বরান্ত শব্দের আধিক্য। "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, তোমার প্রতিমা এ বিশ্ব নিখিল" (দ্বিজেন্দ্রলাল), "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ" (রজনীকান্ত), "ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে" (রজনীকান্ত), "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে" (অতুলপ্রসাদ) এ সব গানে হসন্তের ব্যবহার নেই বললেই চলে। বাঙালীর আবেগপ্রধান ভাবগম্ভীর প্রকৃতির সঙ্গে ঢুলকি চালের হসন্ত পদ অপেক্ষা স্বরান্ত পদের ভাবটিই যে বেশী মেলে তা একটু পরীক্ষাতেই ধরা পড়তে পারে।

হসন্তের পরিবর্তে স্বরান্তের সমধিক ব্যবহারের জন্য বাংলা গান মূলতঃ মীড়প্রধান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এত যে মীড়ের আধিক্য, তার মূল এইখানে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। হসন্তের ঢুলকি চালে গমক ফোটাবার অবসর প্রচুর, কিন্তু মীড়ের প্রয়োগ তাতে সম্ভব হয় না। মীড় সর্বদাই আপনার স্ফূর্তির জন্য স্বরান্তের স্থির আর প্রশান্ত পরিবেশটুকু খোঁজে। একটু জায়গা করে বসতে না পেলে, একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে হাত-পা ছড়াবার সুযোগ না পেলে মীড়ের আরাম হয় না। কিন্তু গমক তেমন নয়।

তার চলা উটকো। লাফিয়ে লাফিয়ে এগোনো তার স্বভাব। গমকের এই জঙ্গম ভাবটি হস্-অন্তযুক্ত শব্দের মেজাজের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। এই কারণে দেখতে পাই, হিন্দুস্থানী গানে গমকের যেমন জাঁক ও জমক, বাংলা গানে তার সিকির সিকিও নয়। হিন্দুস্থানী গানে ঝরনার উপল-প্রহত গতি; বাংলা গানে নদীর একটানা শান্ত প্রবাহ। সুর প্রয়োগের এই বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদটিকে আমরা বাংলা গান ও হিন্দুস্থানী গানের একটি মূলগত প্রভেদ আখ্যা দিতে পারি।

বিলম্বিত চালেব হিন্দুস্থানী খেয়াল গানে অবশ্য তুল্‌কি গতির ব্যবহার দেখা যায় না, তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে হিন্দুস্থানী গান যে হসন্তের প্রতিঘাতে প্রহত চাঞ্চল্যের বেগযুক্ত একটা বিশেষ সুর-লয়ের গান তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা গানের সঙ্গে খেয়ালের ভাবগত সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন নয়, কিন্তু চপল-চঞ্চল ঠুংরী, দাদরা, মধ্য ও দ্রুত লয়ের খেয়াল কিংবা কাওয়ালী গীত প্রভৃতির সঙ্গে বাংলা গানের মিল বিশেষ নেই। ধ্রুপদাঙ্গ গানের আলাপের গাম্ভীর্য, বিলম্বিত খেয়াল গানের সুরের শান্ত আবেশ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এ সব উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য বাংলা গানে পরিস্ফুট করে তোলা শক্ত নয়। কিন্তু ছন্দের দ্রুতগতি চাপল্য এবং গমক, তান-বাঁট ইত্যাদির অস্থির উৎক্ষেপ বাংলা গানে তেমন মানায় না। তান-কর্তব, গমক-গিটকিবি সহযোগে বাংলা গান গাইলে বাংলা গানের সহজ মাধুর্য ক্ষুণ্ন হয়। বাংলা গানের প্রকৃতিটাই তান-কর্তব ইত্যাদির বিরুদ্ধ। অবশ্য বাংলায় দ্রুতগতি-বিশিষ্ট গান যে নেই তা নয়, যথেষ্ট সংখ্যায় আছে, বিশেষ, আধুনিক কালীন রুচির চাপে এ রকম গানের রেওয়াজটাই আজকাল বেশী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; তবে এটি যে বাংলা গানের আসল ধাত নয় সেটি একপ্রকার জোর করেই বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের অগণিত ব্রহ্মসঙ্গীত আছে, তাদের মূল ভাবটি পবিত্র গাম্ভীর্যের দ্বারা মণ্ডিত। পরম মঙ্গলময়ের নিকট আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক আকূতি গানগুলির ভিতর একটা শান্তরসাস্পদ ভাবের আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। "আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে", "তোমারই রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো", "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন", "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে"—এ সব গানের বাণী ও সুরের ভিতর একটা আশ্চর্য আত্মসমাহিত

প্রশান্তির ভাব আছে। তার উপর এগুলি বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে রচিত। আজকালকার মত যদৃচ্ছ সুরের মিশ্রণে এ-সব গানের কাঠামো নড়বড়ে করে তোলা হয় নি; একটি মাত্র রাগের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সেই কাঠামো স্থির অচঞ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রাচীন বাংলা গান, দ্বিজেন্দ্রলালের উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সঙ্গীত, রজনীকান্তের গান—সবই মূলতঃ একরাগভিত্তিক সঙ্গীত আর ওইখানেই ওইসব গানের আসল জোর।

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গেলে দেখতে পাব, রাগের একরাগভিত্তিকতা এবং সুরের শান্ত রস—এ দুটি বাংলা গানকে একটি বিশেষ মহিমায় ভূষিত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি প্রসিদ্ধ গানের দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে নেওয়া যাক। "ওই নীলাকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো" ও "ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত এক ভেসে আসে"। এই গান দুটি যদিও সংজ্ঞার্থে ধ্রুপদ গান কিংবা বিলম্বিত খেয়ালের সুরের পর্যায়ভুক্ত নয়—এ দুটি আসলে কাব্যসঙ্গীত—তা হলেও এদের রসটি কিন্তু ধ্রুপদভঙ্গিম। সুরের গতিটিও বেশ মন্থর—যে বৈশিষ্ট্য বাংলা গানেরই একটি মৌলিক লক্ষণ। বাংলা গানের গতি শান্ত আর মন্থর হলেই তার রূপ খোলে ভাল। আবেগটিও সেই ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়। অতুলপ্রসাদের গানেও আমরা এই অনস্থির মন্থরতার ভাব লক্ষ্য করি। অতুলপ্রসাদ যদিও প্রধানতঃ ঠুংরী সুরের ভঙ্গিমায় তাঁর বাংলা গানের সুরের ছাঁচ তৈরি করেছেন, তা বলে হিন্দুস্থানী ঠুংরী গানের মত তাঁর গানগুলির ভঙ্গি চঞ্চল নয়। বাংলা গানের বিশিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেসব গান শান্তশ্রী-মণ্ডিত। "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে", "কত গান তো হল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়া", "সবারে বাস রে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে"—এসব গানের সুর ঠুংরিভঙ্গিম, অথচ তা ঠুংরির চাঞ্চল্যবর্জিত। আমাদের বাংলা দেশেব সুরকাররা সুরকারও বটেন আবার গীতিকারও বটেন। অর্থাৎ একাধারে তাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। তাঁদের কবিত্ব-বৈশিষ্ট্য তাঁদের চটুলতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাঁদের কবি-স্বভাব কখনও তাঁদের ছন্দ, লয় ও সুরের কাজে উদ্দাম হয়ে উঠতে দেয় নি, যে পরিণতি হিন্দুস্থানী

গানে প্রায়শঃই ঘটেছে। হিন্দুস্থানী গানে বাণীর সৌন্দর্য ও লালিত্যের দিকে ততটা জোর দেওয়া হয় না যতটা জোর দেওয়া হয় সুরের সৌষ্ঠবের দিকে। ফলে বাণী ব্যাহত হয়, আর তার প্রতিক্রিয়ায় সুর তার অন্যান্য সম্পদ্ সত্ত্বেও অনেকটা চপলতাধর্মী হয়ে ওঠে। বাংলা গানের কাব্যস্বভাব বাংলা গানকে ওই অবাঞ্ছিত পরিণাম থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। বাংলা গানের সুরকাররা সুরকার তো বটেনই উপরন্তু কবি, এই তথ্যটি আমাদের কোন সময়েই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

বর্তমান বাংলা দেশের সুরকার ও গায়কেরা বাংলা গানের এই পূর্বতন তথা সনাতন ঐতিহ্য থেকে অনেকখানি ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। এখন আর সুরবিশুদ্ধি সুরগাম্ভীর্য সুরের প্রশান্ত ভাব রক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। কবি আর সুরকারের কাজ দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে সুর ও বাণীর সুসমঞ্জস ঐক্যের আদর্শটিতেও অনেকটা চিড় ধরেছে। আধুনিক গীতিকারদের মধ্যেও সত্যিকার কবির সংখ্যা অপ্রতুল, তাতে বাণীর সৌন্দর্যের সুস্পষ্ট খর্বীকরণ ঘটেছে। আজকাল সুরের যে রকম নিরঙ্কুশ মিশ্রণ চলেছে তাতে বাংলা গানের আর জাত রইল না। বিশেষতঃ 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় সঙ্গীতের ভিতর সুরমিশ্রণের নামে নৃত্য শুরু হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন কথা তেমনি সুর। এ বাংলা গানের সুর কি কামস্কাট্‌কার সুর তা চিনে ওঠা কঠিন ব্যাপার। গাইবারও সে কী কিম্ভূত ভঙ্গি! গলার স্বর চেপে আধা-বেসুরা আর সানু-নাসিক ঢঙয়ে যে সকল গান গাওয়া হয় তা আদৌ সঙ্গীতপদবাচ্য নয়; তাকে বিকৃত উচ্চারণের আবৃত্তির রকমফের বলা যায়। এই প্রকার কৃত্রিম গায়ন-পদ্ধতির আর একটি মারাত্মক ত্রুটী ধরা পড়ছে। তা হল সুরের অবলোপ। সুর বা 'মেলডি' (melody) বলে এখন আর গানে কিছু নেই। সুরের 'ধুন্' সৃষ্টি করতে হলে সুর খরজে অথবা মধ্যমে অথবা পঞ্চমে অথবা তারার সায়ে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্ততঃ স্থায়িভাবে দাঁড়ানো দরকার। এখন সুর মোটে কোথাও দাঁড়াতে চায়ই না। তা কেবলই স্বর থেকে স্বরান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বেড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত-উত্তর অর্থাৎ মধ্য ও শেষ পর্বের গানগুলি থেকে এই প্রক্রিয়ার শুরু; এখন সেই প্রক্রিয়া অবনতির নিম্নতম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁচেছে। এখনকার গানে সুরের কোথাও একদণ্ড

দাঁড়াবার জো নেই ; তার অবস্থা হয়েছে নিয়তপ্রবহমান অস্থির জলধারার মত। কিংবা অস্থির মনের সঙ্গে এই সদাচঞ্চল সুরের তুলনা করা যায়। চঞ্চল মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ত পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে ; কোন একটি বিন্দুতে সংহত হবার ক্ষমতার অভাবে তার শক্তির অপচয় হচ্ছে। বর্তমান বাংলা গানের সুরেরও ঠিক সেই অবস্থা। সুর ক্রমাগত দোদুল্যমান, সুতরাং তাকে একটি বিশেষ সুরের আধারে ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। এই কারণে বর্তমান কালের বাংলা গানকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বাংলা গান বলে আর চেনা যায় না। শান্তরসের ঐতিহ্য থেকে 'আধুনিক বাংলা গান' দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে স্খলিত হয়ে পড়েছে। বাংলা গানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে সেই ঐতিহ্যে আবার আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

বাংলা গানের আকাল

বাংলা গান আর এগোচ্ছে না। আজকাল রেডিও গ্রামোফোন বৈঠক ও ব্যক্তিগত আসরে যে ধরনের বাংলা গান শুনতে পাই তাতে এই সিদ্ধান্তই মনে বদ্ধমূল হয় যে, বাংলা গানের চলা হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। গানে সুরের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, গাওয়ার মধ্যেও প্রাণ নেই—সব কিছুই কেমন যেন এক প্রেরণাহীন গতানুগতিকতার পথ অনুসরণ করে চলেছে। অবশ্য, বাংলা গানের অনুশীলন যথেষ্টই হচ্ছে; নতুন নতুন গাইয়েও নিত্য আত্মপ্রকাশ করছেন—কিন্তু কারও গানেই সেই সুরটুকু খুঁজে পাই নে যা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলা যায়, হাঁ, গান শুনলাম বটে!

এই নৈরাশ্যকর অবস্থার একমাত্র কারণ আমার যা মনে হয় তা হচ্ছে, সঙ্গীতক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অভাব। বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তবু বরং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গায়ক কেউ কেউ আছেন কিন্তু যাকে আমরা আধুনিক বাংলা গান বলি, সেখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গায়কের অভাব সুস্পষ্ট। গান আজকাল অনেকেই গাইছেন, কিন্তু গাওয়ার মত গান কেউ গাইছেন না—সঙ্গীতের গোটা ক্ষেত্র জুড়ে মাঝারিদের রাজত্ব চলছে।

এখনকার বাংলা গান শুনলে মনে হয়, সঙ্গীতশিল্পীরা ঠিক সেই অবস্থায় এসে পৌঁচেছেন যেখানে উপনীত হলে পুরাতন পদ্ধতিকে ক্রমাগত পালিশ দিয়ে দিয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করার ইচ্ছাটাই মনে প্রবল হয়, বলিষ্ঠতার বা মৌলিকতার পথে অগ্রগমনের কথা কারও মনে হয় না। সাহিত্যে চিত্রশিল্পে সঙ্গীতে কিংবা যে-কোন ললিতকলার ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের অবস্থা দেখা দেয়, তখন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। এই অবস্থায় শিল্পীরা শুধু মৃদুমধুরের সাধনা করেন, পূর্বাচার্যরা যে ঐতিহ্য নির্মাণ করে গেছেন তাকে মেজে-ঘসে আরও কত সুচিক্কণ করে তোলা যায় সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় তারা ব্যতিব্যস্ত থাকেন; নতুনের পথে পা বাড়াতে আর তাঁদের সাহস হয় না। সঙ্গীতের যে সমস্ত প্রয়োগপদ্ধতি ও আঙ্গিক আগে থেকে প্রচলিত সেগুলির সবিশেষ অনুশীলন করা এবং সম্ভব হলে তাদের আরও বিকশিত করে তোলা—এই হল আজকের দিনের সঙ্গীত-

শিল্পীদের কাজ। কিন্তু কী হলে পুরাতন ঐতিহ্যের জটিলজাল ছিন্ন করে সঙ্গীত-শিল্পকে নতুনের অভিসারী করে তোলা যায় সে কথা বড় কেউ ভাবছেন না। সঙ্গীতক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাবই যে এর কারণ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে সে কথা পরিষ্কার হবে।

বাংলা গানের বিভিন্ন শাখায় কিছুকাল আগে পর্যন্ত বহু প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। কি বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত প্রবর্তনায়, কি সুরযোজনায়, কি সঙ্গীত রচনায়, কি কণ্ঠের বিকাশে এমন সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তির সৃষ্টির দানে আমাদের সঙ্গীত সমৃদ্ধ হয়েছে যাঁদের সৃজনকুশলতার পরিমাপ এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে অসম্ভব। সে চেষ্টা এখানে করব না। শুধু তাঁদের কতিপয়ের পরিচয়টুকু অল্প কথায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যে সব বাংলা গান শুনতে পাওয়া যায় তাদের প্রবর্তনার ইতিহাসটুকু অনুধাবন করলে দেখতে পাব, তাদের প্রত্যেকের পিছনে এক একজন সৃষ্টিধর সঙ্গীতসাধকের মৌলিক প্রচেষ্টাব ছাপ রয়েছে। সাধনসঙ্গীতের প্রবর্তনায় কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ; টপ্পায় নিধুবাবু; জাতীয় সঙ্গীত রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল; বাণী ও সুরের সুসমঞ্জস লালিত্য বিধানে রবীন্দ্রনাথ; ঠুংরীতে অতুলপ্রসাদ; গজলে ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের গানে কাজী নজরুল ইসলাম; ভক্তিভাবের গানে ও বিচিত্র সুরমিশ্রণের প্রয়োগে দিলীপকুমার; এবং অন্যান্য আরো কতিপয় প্রতিভাশালী সঙ্গীতকার বাংলা গানকে বিচিত্রভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে গেছেন।

এ যুগের বিশিষ্ট সুরকার পরলোকগত হিমাংশু দত্তর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ গীতিকার বাংলা গানের বাণীর ক্ষেত্রটিকে পদলালিত্য ও ভাবমাধুর্য উভয়তঃ সমৃদ্ধ করে গেছেন। আধুনিক গীতিকারদের মধ্যে শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব রায় প্রভৃতি এই সেদিনও সুন্দর সুন্দর গান রচনার দ্বারা কণ্ঠশিল্পীর সুরকে ভাষার আশ্রয় দিচ্ছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সুরযোজনার অভাবে তাঁদের বাণীরূপ যথাযথভাবে পরিস্ফুট হতে পারে নি বলে মনে হয়।

কণ্ঠরূপায়ণে বাংলার পূর্ববর্তী গায়কদের কৃতিত্বের তুলনায় আজকের

দিনের গায়কদের কৃতিত্ব ম্লান। এককালে যেখানে অঘোরনাথ চক্রবর্তী, লালচাঁদ বড়াল, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং কিছুদিন আগেও গিরিজা চক্রবর্তী, অন্ধ সাতকড়িবাবু, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতির নাম পাই, এখন সেখানে রামা-শ্যামার নাম করে মুখ রক্ষা করতে হয়। আজ সঙ্গীতের অগাধ জলবিস্তার পূর্বের তুলনায় সমধিক আলোড়িত হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অত্যধিক আলোড়নের ফলে সমগ্র জলটুকুই ঘুলিয়ে উঠছে, আর সেই পঙ্কিল জলকেলির নায়ক হলেন রাশি রাশি চুনোপুঁটির দল!

এ কথায় বর্তমান সঙ্গীতকারদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হবেন জানি, কিন্তু সত্য স্বীকার করে নিয়ে ত্রুটিটুকু সংশোধন করাই বোধ হয় অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। গায়কদের কথাই আবার বলি। বর্তমান বাংলায় যে সব কণ্ঠশিল্পী সাধারণ্যে পরিচিত এবং রেডিও গ্রামোফোন ও বৈঠক এই ত্রিবিধ স্থানে আদৃত, তাঁদের ভিতর যথার্থ শক্তিমান গায়ক কয়জন আছেন তা ভেবে দেখবার মত। মৌলিকতার দিক দিয়ে, স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়ে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন এমন গায়ক গায়িকা সমস্ত বাংলা দেশ চষে বেড়ালেও দুটি চারটির বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সঙ্গীতক্ষেত্রে গায়ক-গায়িকার সংখ্যা আজ অগণন—এঁদের অনেকেরই গাইবার গলা চমৎকার, সুরকে পরিমার্জিতভাবে ফুটিয়ে তুলতেও এঁরা সুদক্ষ। রুচির ক্ষেত্রে এঁদের পছন্দ-অপছন্দ আগেকার দিনের কণ্ঠশিল্পীদের পছন্দ-অপছন্দের তুলনায় অনেক বেশী খুঁতখুঁতে; সেইহেতু সুরকে সুচিক্কণ, মৃদুমধুর ভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতাও এঁদের সবিশেষ। কিন্তু যে বিশেষ ক্ষমতা থাকলে সুরসৃষ্টিকে স্বকীয় প্রতিভার অনুগত করে তাকে নূতন নূতন পথে চালিত করা যায়, অনন্যসাধারণ করে তোলা যায়, সেই ক্ষমতা আজকের দিনের খুব কম গায়কগায়িকার মধ্যেই উপস্থিত। বর্তমানের শিল্পীরা, আগেই বলেছি, কেবলই মৃদুমধুরের সাধনা করছেন—যা আছে তাকে আরো সুন্দরভাবে প্রকাশের চেষ্টাতেই তাঁদের উদ্যম নিঃশেষিত। কিন্তু যে বলিষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি শিল্পীকে নূতন সৌন্দর্যসৃষ্টির (তা সে সৌন্দর্য যতই রুক্ষ হোক) পথে প্রণোদিত করে, বর্তমান সুরশিল্পীদের মধ্যে সে দুটি গুণের একান্ত অসদ্ভাব।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শিল্পী হিসাবে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে পুরাপুরি আদর্শ গায়ক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। তবু তাঁর গানের এমন একটা নিজস্ব ঢঙ ছিল যা আজকের দিনের গায়কে পাওয়া যায় না। এখানেই আধুনিক গায়কদের উপর প্রবীণ কৃষ্ণচন্দ্রের জিত। এসব ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধমাত্র নিষ্ঠার কথাও যদি বিবেচনা করা যায় তা হলেও দেখা যাবে, তাঁর পাশে তরুণ সঙ্গীতসাধকদের কেউ টেঁকেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের চাইতে অপেক্ষাকৃত নবীন শ্রীশচীন দেববর্মনের কথা ধরুন। তাঁর ভাটিয়ালি গান—সেটা তাঁরই নিজস্ব। এ ছাড়া রাগপ্রধান বাংলা গানেও তিনি নতুন ধারার প্রবর্তক। শচীন দেববর্মণের প্রতিভা খুবই সীমাবদ্ধ প্রতিভা, কিন্তু ওই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দুঃখের বিষয়, এই-জাতীয় স্বকীয়তা আজকের গায়কের গানে তেমন পাওয়া যায় না। আরেকটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—শ্রীপঙ্কজকুমাব মল্লিক। দেববর্মনের মত তাঁকেও ঠিক আধুনিকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কুমার শচীনদেব সম্পর্কে যে কথা বলেছি, পঙ্কজবাবু সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। পঙ্কজবাবুব রবীন্দ্রসঙ্গীত শান্তিনিকেতনেব অনুমোদিত হোক বা না হোক, তাঁর আধুনিক বাংলা গানগুলিতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের প্রভাব আশানুরূপ থাকুক বা না থাকুক, এ কথা অস্বীকার কবা চলে না যে তাঁর গান ও সুর নিঃশেষে তাঁরই, তাকে অন্য কাবও গান বলে ভুল করার যো নেই। আজকের কয়জনার সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করা চলে? সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুগায়ক, কিন্তু তাঁরা কি বাংলা গানে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন?

আমাদের মনে হয় সঙ্গীতে নতুন স্টাইল, নতুন শ্রেণী প্রবর্তনের প্রক্রিয়া আধুনিক কালে এসে হঠাৎ থেমে গেছে। এ সম্বন্ধে যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তব প্রয়োগ-প্রচেষ্টা সবই বিগতকালে ঘটেছে এবং এ যুগে একমাত্র কাজী নজরুল ও দিলীপকুমারই এ ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কাজী নজরুলেব বাংলা গজল এবং লুপ্ত ও অর্ধলুপ্ত হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীগুলির অনুকরণে বাংলা খেয়াল রচনার কথা সঙ্গীতমহলে সুবিদিত। এই ধরনের প্রচেষ্টা আজকাল হচ্ছে বলে জানি না। দিলীপকুমারের বিদেশী ও স্বদেশী সুরের মিশ্রণে তৈরি বাংলা গান এবং ভক্তিভাবের গান

সঙ্গীত জগতে একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছে। সেই পথ সম্প্রসারিত করবার জন্য আধুনিক আর কোন শিল্পীকে এগিয়ে আসতে দেখলুম না। ব্যক্তিগত-ভাবে দিলীপকুমারের আত্যন্তিক ভক্তিরসাশ্রিত গানের আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু এ কথা তো মানতে হবে, তিনি ভক্তিভাবের গানের মধ্য দিয়ে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, যার অনুরূপ প্রচেষ্টা এ যুগে আর কোনো শিল্পী করেন নি। মনে হয় নব নব ধারার প্রবর্তন প্রয়াস দিলীপকুমারে এসে বিরামলাভ করেছে, আর তার প্রসারিত হবার সম্ভাবনা অল্প। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে তো নয়ই। অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপকুমারের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ সুরজ্ঞরা বাংলা গানে যে নব নব রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার কাহিনী এতই সুবিস্তৃত যে এঁদের প্রত্যেকের সুরসৃষ্টির বিষয়ে এক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা চলে। এখানে শুধু বক্তব্য, অপেক্ষাকৃত পুরাতন সুরকারদের মধ্যেই শুধু আমরা নতুন নতুন রূপসৃষ্টির তাগিদ খুঁজে পাই; এ যুগের সুরকারদের মধ্যে সেই তাগিদটুকু মরে গেছে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সঙ্গীতে নতুন নতুন আইডিয়ার বীজ ছড়াবার প্রয়োজনও যেন আমরা ভুলে যেতে বসেছি। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রচলিত সঙ্গীতপদ্ধতিকে বর্জন করে তার সমাধির উপর নাট্যসঙ্গীত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, দেখেছিলেন। এজাতীয় স্বপ্ন আজকের সঙ্গীতকারদের চোখ থেকে একেবারেই মুছে গেছে।

সুরযোজনার বেলায়ও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। বাংলা গানের সুররচনার দিক সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুর-কারদের সুরযোজনার উৎস শুকিয়ে গেছে। এখন যাঁরা সুর দিচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশ সিনেমার আজ্ঞাবহ, অতএব আংশিক খণ্ডিত। আদর্শনিষ্ঠ দু'একজন সুরকার সুরযোজনার পুরাতন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন বটে, কিন্তু মনে হয় বর্তমান কালের পরিধির মধ্যে সুরসাগর হিমাংশু দত্তই সুরযোজনার সফল প্রচেষ্টার শেষ দৃষ্টান্ত। এই প্রচেষ্টার সূত্র আর নূতন কেউ তুলে ধরবেন না তা বলি নে, তবে সাম্প্রতিক লক্ষণ থেকে সে সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া চলে না। নিকট ভবিষ্যতে অন্ততঃ সেই শুভ সংঘটনের সম্ভাবনা দেখছি নে। বর্তমানে দুজনমাত্র যথার্থ প্রতিভাবান বাঙালী

সুরকার আছেন—তিমিরবরণ ও রবিশঙ্কর। কিন্তু তাঁদের সুর মূলতঃ যন্ত্রসঙ্গীতের সুর, কাজেই বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা অবান্তর। সলিল চৌধুরীর গানের সুরযোজনার মধ্যে অবশ্য কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা গানের এখন ভাটির কাল। সুরের উৎসমুখ পর্যন্ত সেই ভাটির টানে শুকিয়ে এল। কেউ কেউ বলতে পারেন, যা বিগত হয়েছে তার প্রতি মোহই সমালোচক-লেখককে বর্তমানের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। নতুনের অনুরাগী আমরা কারও চাইতে কম নই, কিন্তু বিচারবোধ বিসর্জন দিয়ে শুধু নতুন বলেই নতুনকে অভিনন্দন জানাতে হবে এমন গোঁড়ামি আমাদের নেই। যে-কোন চক্ষুষ্মাণ (কর্ণবান?) ব্যক্তি একটু কষ্ট করলে সাম্প্রতিক বাংলা গানের বন্ধ্যাত্ব দশা আবিষ্কার করতে পারেন।

উপরে যে সব কথা বলা হল আমাদের সঙ্গীতশিল্পীরা তাঁদের সঙ্গীত-সাধনার ফাঁকে ফাঁকে তার প্রতি খানিকটা মনোযোগ দিলে বাধিত হব; আধুনিক গায়কদের অনুরোধ, চিন্তা করবার অভ্যাসটুকু তাঁরা রাখবেন, একেবারে ষোল আনা সুরব্রহ্মে লীন হয়ে যাবেন না। তাতে তাঁদের নিজেদের লাভ সমাজেরও লাভ।

সুরস্রষ্টা তিমিরবরণ

আমাদের দেশের ট্র্যাডিশান-এ সুরকারের চাইতে গায়ক-বাদকের মর্যাদা বেশী। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক তার উল্টো। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, এদেশের সঙ্গীত মুখ্যতঃ স্বরৈশ্বর্যের ভিত্তিতে রচিত, ইউরোপীয় সঙ্গীতে স্বরের চাইতে বিভিন্ন স্বরের সমন্বয়ের আদর্শের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। এদেশে গায়ক-বাদককে আমরা তারিফ করি এজন্য যে, সুরকার যেভাবেই সুরযোজনা করুন না কেন, গায়ক অথবা বাদক স্বীয় প্রতিভাবলে তাকে লীলায়িত করতে পারেন। সুরকে কণ্ঠে কিংবা যন্ত্রে ইচ্ছামত খেলাবার স্বাধীনতা ভারতীয় সঙ্গীতে অবারিত।

কিন্তু ইউরোপীয় গায়ক-বাদকদের তেমন কোন স্বাধীনতা নেই। তাঁরা সুরকারের আজ্ঞাধীন। বলতে গেলে তাঁদেব হাত-পা বাঁধা। সুরকার সুরের যে চৌহদ্দি দেখিয়ে দেবেন তার বাইরে তাঁদের এক পা-ও নড়বার উপায় নেই। ইউরোপীয় শিল্পীর কৃতিত্ব সুর খেলাবার স্বাধীনতার জন্য নয়; কণ্ঠের সম্পদের জন্য, বাদনকুশলতার জন্য। একই গান বা গৎ যে বিভিন্ন গায়ক-বাদকের কণ্ঠে ও যন্ত্রে কৃতিত্বের তারতম্য নিয়ে ফোটে তার ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই।

ভারতীয় সঙ্গীতে গায়ক-বাদকেরা এতকাল যে মর্যাদা পেয়ে এসেছেন তাতে কেউ ভাগ বসাতে যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হয় এখন থেকে সুরস্রষ্টাদের জন্যও একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। সেটা যে সব সময় গায়ক-বাদকের পাশেই হবে তার কোন কথা নেই, উপরেও হতে পারে।

সুরকার হিসাবে তিমিরবরণের নাম বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত। Orchestration-এর ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে সহজেই আমরা তাঁকে প্রচলিত গায়ক-বাদকের উপরে স্থান দিতে পারি। তিনি একজন বাদকও বটেন। বহু বৎসর একাগ্র সাধনায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তিনি স্বরোদ যন্ত্রে সঙ্গীত অভ্যাস করেছেন। কিন্তু সেটি তাঁর গৌণ পরিচয়, মুখ্যতঃ সুরস্রষ্টা হিসাবেই তাঁকে আমাদের বিচার করে দেখা দরকার। প্রথম যখন তিনি

প্রখ্যাত নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গীতপরিচালকরূপে সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন তখনই থেকেই তাঁর এই বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। পরে বিভিন্ন কাজে তাঁর এ পরিচয় আরও বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বর্তমানে তিনি স্বরস্রষ্টা হিসাবেই সমধিক পরিচিত; স্বারোদবাদক হিসাবে তাঁর পরিচয় অপ্রধান।

তিনি কিছুদিন চলচ্চিত্রে সঙ্গীতপরিচালনার কাজ করেছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্র তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি। বোধ হয় প্রযোজকদের অতিরিক্ত কর্তৃত্বব্যঞ্জক মনোভাব ও রসবোধহীনতায় বিরক্ত ও পীড়িত হয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত ওই কাজে ইস্তফা দেন। চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে এটা মস্ত ক্ষতি সন্দেহ নেই। মনে হয় চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন নি। স্বাধীনভাবে তিনি এর পর যে কয়টি নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন তার থেকেই প্রথম আমরা স্বরসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা জানতে পারি।

মঞ্চের জন্য, পর্দার জন্য, কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে, যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য অনেকেই গৎ কিংবা অর্কেস্ট্রার স্বর তৈরি করে থাকেন। তাঁদের কারুর কাজেই এমন কোন বিশিষ্টতা চোখে পড়ে না যাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা যায়। কোনমতে একটা গৎ খাড়া করে অনেকগুলি যন্ত্রে একসঙ্গে সেই স্বর বাজানোকেই আমরা বলি অর্কেষ্ট্রা—সেই গৎ সুশ্রাব্য হোক আর নাই হোক, যন্ত্রগুলির ভিতর সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক। ঐকতানবাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিসদৃশ যন্ত্রের জগাখিচুড়ি (hotchpotch) এমনই পীড়াদায়ক যে স্বরসরস্বতীর উপর তাকে রীতিমত অত্যাচার বলা যায়। আর গৎগুলিও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মামুলি ধরনের—একটি মূল স্বরকে আশ্রয় করে কোন-রকমে একটা অবয়ব খাড়া করতে পারলেই হল, তাতে অভিনবত্ব থাকুক আর নাই থাকুক।

তিমিরবরণের সঙ্গীতকে এর সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম বলা যায়। তাঁর কোন গতেই মামুলি ধরনের স্বয়যোজনার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন মালকোষ রাগ। অন্য কেউ হলে প্রচলিত পদ্ধতিতে সা জ্ঞা মা দা ণা র্সা-র উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ স্বর দাঁড় করিয়েই হয়ত তৃপ্ত থাকতেন, কিন্তু তিমিরবরণ সে পথের পথিক নন। বৈশিষ্ট্যচিহ্নাঙ্কিত গৎ রচনাই তাঁর

লক্ষ্য। এইজন্য প্রয়োজনতঃ দু' একটি বিবাদী সুর বসাতে হয় তো তাতেও তিনি পেছপা নন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁর মালকোষ গৎ শাস্ত্রানুমোদিত রাগরূপ থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৌলীন্য বাঁচিয়ে চলাটাই আসল নয়। দুই-একটা false note লাগিয়ে যদি রাগকে নতুন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, নতুন ইঙ্গিতে ইঙ্গিতময় করে তোলা যায় তা হলে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই উচিত বলে মনে করি। যাঁর প্রতিভা আছে বাঁধা পথ মাড়িয়ে চলা তাঁর জন্য নয়, তিনি নিজেই নিজের পথ কেটে নেন।

তিমিরবরণ পরিকল্পিত 'অপরিচিতা' গতের সুর যিনি শুনেছেন তিনিই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। শুধু সুরের অভিনবত্বের জন্যই নয়, তিনি এই গৎটিতে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করেছেন তা থেকেও তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, Saxophone যন্ত্রটির কথা ধরা যেতে পারে। ভারতীয় ঐকতানবাদনের ক্ষেত্রে বিদেশী যন্ত্রের আমদানী এর আগেও কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই মিলন সুষ্ঠু হয় নি। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতির সঙ্গে সে সব যন্ত্রের সুর কেমন যেন বেমানান ঠেকেছে। কিন্তু মালকোষের গৎ-এ তিমিরবরণ যে ভাবে Saxophone যন্ত্রটিকে ব্যবহার করেছেন তাতে তিনি ঐকতানবাদনের ক্ষেত্রে একটা নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অপরে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উপকৃত হতে পারেন।

তারপর ধরুন তাঁর পরিকল্পিত 'ললিতাগৌরী' সুরটির কথা। 'পূরিয়া' আর 'ললিতাগৌরী' সুরের সমন্বয়ে তিনি এক অপূর্ব সুররূপ খাড়া করেছেন। 'পুরিয়া' ও 'ললিতাগৌরী' দুটি পরস্পরবিরোধী রাগ—তাদের জাত আলাদা। এদের ভিতর মিলন ঘটিয়ে তিমিরবরণ অসাধ্য সাধন করেছেন। ঘটকালির তিনি পাকা ওস্তাদ বটে।

তিমিরবরণ তাঁর প্রযোজিত নৃত্যানুষ্ঠানগুলিতে যে সব সুর দিয়েছেন সেগুলির অধিকাংশেরই ধরন অভিনব, কোনটি প্রচলিত সুরের সঙ্গে মেলে না। সামান্য পিলু বা বৃন্দাবনী সারঙ সুরের গতেও তাঁর সুরযোজনার বৈশিষ্ট্য ঝিলিক দিয়ে যায়। "ব্ল্যাক-আউট" ও "ভুতুড়ে বাড়ি" নৃত্যের সঙ্গে তিনি যে সুরযোজনা করেছেন তাতে grotesque ভাবের চরমরূপ প্রকাশ পেয়েছে। "মহাবুভুক্ষা" নৃত্যের সুরের ভিতর হাহাকার ধ্বনি কী বেদনা-

করুণ ভাবেই না অভিব্যক্ত হয়েছে। "প্রেরণা" নৃত্যটির সুরের প্রেরণা অননুভূতপূর্ব। "আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ" নৃত্যে তৎপরিকল্পিত নৃত্যের অনুষঙ্গী সুরগুলিতে সংস্কারমুক্ত সুরযোজনার আদর্শ বিশেষভাবেই প্রকট।

তিমিরবরণের চরম কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ইউরোপীয় ধরনে স্বরসঙ্গতি বা harmonisation-এর চেষ্টায়। সবগুলি যন্ত্র একই সঙ্গে একই 'স্কেল'-এ একই 'নোট' বাজাতে থাকলে ঐকতানের রস ফোটে না। এ পদ্ধতি ভারতীয় হতে পারে, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যের অবকাশ কম। এইজন্য দেখি, ইউরোপীয় আর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন যন্ত্রী সুরকারের পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন স্কেলে বিভিন্ন নোট বাজান, আলাদা ভাবে সে সব সুর discordant হলেও সবশুদ্ধ তাদের 'এফেক্ট' হয় চমৎকার। সবগুলি যন্ত্রের সম্মিলিত বাদনে সুরের অপরূপ সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

তিমিরবরণ ভারতীয় ঐকতানবাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অংশতঃ অনুসরণ করেছেন। একে প্রাথমিক বৈপ্লবিক প্রয়াস বলা যেতে পারে। প্রগতিমুখী অপরাপর সঙ্গীতশিল্পীরা প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে তিমিরবরণ প্রবর্তিত প্রয়াসকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ভারতীয় অর্কেস্ট্রার বৈচিত্র্য সাধন করতে হলে এই পথেই অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়।

এ দেশের সুরকাররা কদাপি তাঁদের পরিপূর্ণ মর্যাদা পান নি। সুরের ভিতর নিজের নাম ও ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে লুপ্ত করে দেওয়াই ছিল তাঁদের রীতি। বহু প্রাচীন ভারতীয় রাগ-রাগিণীর নামের সহিত আমরা পরিচিত, কিন্তু যাঁরা সে সব সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের কয়জনার নাম আমরা জানি? বর্তমানে এই রীতির পরিবর্তন আবশ্যক। সুরকারের প্রাপ্য মর্যাদা দানে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। তিমিরবরণকে দিয়ে এই পরিবর্তনের সূচনা হোক।

বাংলার লোকসঙ্গীত

সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে 'মার্গসঙ্গীত' ও 'দেশী সঙ্গীত' এই দুই নামে ভারতীয় সঙ্গীতের বিভাগ করা হয়েছে। মার্গসঙ্গীতের পদ্ধতি-প্রকরণ জটিল, কলাকারু বহু ও বিচিত্র, কিন্তু দেশী সঙ্গীতের সুরের আবেদন সরল ও প্রাণময়। জাতির অন্তরের অন্তস্তল থেকে দেশী সঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত। একটা জাতির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পরিচয় নিতে হলে দেশী সঙ্গীতের গভীরে ডুব দেওয়া প্রয়োজন, কারণ জাতির প্রাণের কথা মনের কথা দেশী সঙ্গীতের মাধ্যমে যেমন সুরময় অভিব্যক্তি লাভ করে, এমন আর কোন গানের মাধ্যমেই নয়। দেশী সঙ্গীতের অনুশীলনের পরিধি সঙ্কুচিত, কিন্তু তার ভিতর সহজ প্রাণেব আবেগ প্রচুর মাত্রায় বর্তমান। নগরজন-সুলভ 'বিদগ্ধ' সংস্কৃতির নানাবিধ কৃত্রিমতা থেকে দেশী সঙ্গীত মুক্ত। এক কথায় দেশী সঙ্গীত অনায়াস, স্বতোৎসারিত, আন্তরিক।

সঙ্গীত-শাস্ত্রগ্রন্থোক্ত দেশী সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত—এ দুটি নামকে সমার্থক জ্ঞান করা যেতে পারে। লোকসঙ্গীত কি না লোক-হৃদয়ের গভীর গুহা থেকে অবলীলায়িতভাবে উচ্ছ্রিত সুরেব ধারা। এ সুর আয়ত্ত করতে দীর্ঘস্থায়ী সাধনার প্রয়োজন হয় না, প্রাণের গভীর আবেগোচ্ছ্বাসের তাড়নায় সুর আপনা থেকে কণ্ঠে এসে ভর করে। ভারতবর্ষের অগণিত পল্লীর সাধারণ মানুষের জীবনে শিক্ষার অবকাশ অল্প, সাধনার অবকাশ ততোধিক; তা বলে তাদেব আত্মপ্রকাশের আকুলতা কিছু কম নয়। বিশেষ করে সুরকে আশ্রয় করেই এ আকুলতা সব চাইতে বেশী নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। পল্লীবাসীর হৃদয়ে যখন কান্না জমে ওঠে, প্রধানতঃ সুর হয়েই তা ঝরে ঝরে পড়তে চায়। উৎসবমুখরতা বা হর্ষোচ্ছ্বাসের বেলায়ও এই সুর মুখ্য আশ্রয়। সুরের মত গভীর মনোভাবের প্রকাশক বস্তু আর নেই, এবং সুরের মত উপকরণ-নিরপেক্ষ শিল্পও আর নেই। অন্যান্য শিল্পকলায় নানারকমের উপাদানের প্রয়োজন হয়, সঙ্গীতে সে সব বালাই নেই। এই দ্বিবিধ কারণে লোকসঙ্গীত পল্লীবাসীর ভাবজীবনের একটি প্রধান অবলম্বন।

অনেকে মনে করেন, ভারতীয় লোকসঙ্গীত ভারতীয় মার্গ বা রাগ-সঙ্গীতের পরবর্তী যোজনা। এ ধারণা ঠিক নয়। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রবিৎ ও ঐতিহাসিক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বিচিত্র প্রমাণপঞ্জী উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে মার্গসঙ্গীতের পাশে পাশে লোকসঙ্গীতেরও অনুশীলন হত। সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারের মতে লোক-সঙ্গীত মার্গসঙ্গীতের অনুগ বা অধীন নয়, সহগ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। রাগসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত উভয়ে উভয়ের পরিপূরক বললে এ দুইয়ের স্বরূপের যথাযথ পরিচয় দেওয়া হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের এই মত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কেন না এর দ্বারা লোকসঙ্গীতকে মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। যাঁরা লোকসঙ্গীতকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্রাত্য বা অন্ত্যজ মনে করেন তাঁরা অভিমতটি অনুধাবন করবেন আশা করি।

বাংলার লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন ও গভীর। বস্তুতঃ, লোক-সঙ্গীত বাংলার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের প্রধান একটি অঙ্গ বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। লোকসঙ্গীতের ভিতর বাংলা গানের সুরের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এ সুর বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে, বাংলা দেশের হাটে-বাটে-মাঠে সহস্র কণ্ঠে এ সুরের নিত্য উৎসার। বাঙালীর প্রাণ কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি ইত্যাদি গানের সুরে যত সহজে সাড়া দেয়, এমন আর কোন সুরেই নয়। এর কারণ বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি সুরের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী যেন এক সুরে বাঁধা। বাউল সুরের ভিতর যে উদাস শূন্যতার ভাব আছে, তা যেন প্রত্যেক বাঙালীর মনের গভীরে অবস্থিত সংসার-বিমুখ বিবাগী মানুষটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ভাটিয়ালি ও সারি গান বেদনাপীড়িত মানুষের ক্রন্দনপরতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ভাটিয়ালি সুরের ভিতর সুস্পষ্ট একটি wailing বা কান্নার ভাব আছে। এ সুর অনুভূতিশীল হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। পল্লীকবি যখন গেয়ে ওঠে—

মনদুখে মরি রে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে,
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী আইন্যা দে
আমারে রে।

কিংবা,

গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না
চল সজনি যাই গো নদীয়ায়—

তখন বিশিষ্ট মানুষের রূপকের আশ্রয়ে এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষের বিরহকাতরতা কান্নার বেদনায় মিশে দুর্নিবার আবেগের আডনায় আমাদের অন্তরকে মথিত করে তোলে। এ গানে কথা বড কি সুর বড় সে প্রসঙ্গ অবান্তর; পরন্তু কথা ও সুরের সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে তার সার্থকতা। লোকসঙ্গীতের বাণী-অংশে যে আপাতরুক্ষতা আছে, যে আপাত-অমার্জিত পদযোজনার দ্বারা বাণীকে সেখানে বন্ধুর করে তোলা হয়েছে, তা আসলে লোকসঙ্গীতের বহিরঙ্গের সমস্যা মাত্র। এর দ্বারা লোকসঙ্গীতের প্রাণস্ফূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং অমার্জিত শব্দাশ্রিত পদযোজনায় লোকসঙ্গীতের অন্তরের কথাটি আরও সহজে ফুটে ওঠে। একদিকে পদের অন্তর্নিহিত খাঁটি ভাব, অন্য দিকে সুরের মনোহারিত্ব—এ দুয়ে মিলে লোকসঙ্গীতের আকর্ষণ রসিকচিত্তের উপর সত্যই দুর্নিবার। হয়ত লোকসঙ্গীতের সুরের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণ অলঙ্করণসমৃদ্ধি নেই, কিন্তু তার জন্যে মনে আক্ষেপ জাগে না। কলাকারু-ঘটিত জটিলতার আশায় আমরা লোকসঙ্গীতের দুয়ারে হাত পাতি না, আমরা লোকসঙ্গীত ভালোবাসি সুরের সরল মাধুর্যের জন্য। সুরের মর্মস্পর্শী আবেদনের তলায় মণ্ডনপ্রিয়তা সহজেই সেখানে চাপা পড়ে যায়। তান-লয়-মান, সুরের নিখুঁত চাতুর্য লোকসঙ্গীতের জন্যে নয়। নাগরিক সঙ্গীতের প্রধান আশ্রয় হল বৈদগ্ধ্য। দীর্ঘ দিনের অনুশীলনের দ্বারা এই বৈদগ্ধ্য আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু নাগরিক সঙ্গীতের যা শোভা, লোকসঙ্গীতে তাই হল বন্ধন। অলঙ্কারবহুলতা নয়, অলঙ্কাররিক্ততার মধ্যেই লোকসঙ্গীতের সুরের উৎকর্ষ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যের পরম অনুরাগী ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। সঙ্গীতকার হিসাবে বাউলের কাছে তিনি তাঁর ঋণ বার বার স্বীকার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক

গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" বাউল গানের প্রতি কবির এই আকর্ষণ অকারণ নয়। বাউলের সুরের সারল্য, ভাবের গভীরতা ও ঔদাস্য স্বতঃই কবিচিত্তকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের গঠনের ভিতর রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরকে দু'হাতে গ্রহণ করেছিলেন। বাউল সুরের প্রভাবমণ্ডিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা বিস্তর। কবির উত্তরকালের রচিত অধিকাংশ সঙ্গীতের সুরের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের ভিতর বাউল সুরের খোঁচ কোথাও না কোথাও অন্তর্লীনভাবে মিশে আছে। বাউল সাধকদের জীবনাদর্শও রবীন্দ্রগীতিসাধনাকে কম প্রভাবিত করে নি। রবীন্দ্রনাথ কীর্তন ভাটিয়ালি প্রভৃতি অন্যান্য লৌকিক সুরগুলিকেও তাঁর গানের ভিতর গ্রহণ করেছিলেন, তবে বাউলের তুলনায় তার পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্য ও প্রকরণাদির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যে সঙ্গীতেব সুররূপ নির্মাণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাতেই প্রমাণ, বাংলা গানের সুরের গঠন কেমন হবে না হবে সে বিষয়ে তাঁর মনে ক্রমশঃ একটি মত দানা বেঁধে উঠেছিল। উত্তর জীবনে তাঁর সুস্পষ্ট পক্ষপাত ন্যস্ত হয়েছিল লোকসঙ্গীতের উপর। কবির প্রথম বয়সেব ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির গঠন ধ্রুপদভঙ্গিম, তাতে তাঁর রাগসঙ্গীতমনস্কতা প্রকাশ পেয়েছে। অন্য পক্ষে কবির পরিণত বয়সের গানগুলি লোকসঙ্গীতের সুবাসে ভরপুর। কবির সঙ্গীতজীবনের এই বিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। রাগসঙ্গীতের সুরাদর্শ থেকে সরে এসে সেই-যে তিনি ক্রমশঃ সহজ সুরের আদর্শকে উত্তরোত্তর আঁকড়ে ধরেছিলেন, এতে কবির দৃষ্টিতে রাগসঙ্গীতের উপর লোকসঙ্গীতের প্রাধান্য সূচিত হয়।

ভৌগোলিক সংস্থান ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ভেদে বাংলাদেশের এক এক এলাকায় এক এক ধারার লোকসঙ্গীতের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তরবহুল, তার ধু-ধু করা উদাস শূন্য মাঠে গেরুয়া রিক্ততা।

বাউলের ভাবের সঙ্গে এই উদাস রিক্ততার ভাবটি বড় চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে। অধিকাংশ সাঁই বা বাউল গুরুর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে, এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জীবন ও জগৎকে দেখবার ভঙ্গির মধ্যে যেখানে উদাসীনতার প্রাবল্য, সেখানে আড়ম্বর ও মণ্ডনপ্রীতি পালাবার পথ খুঁজে পায় না। এই কারণে দেখতে পাই, বাউলের সুরের ভিতর কোনরূপ জটিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বাউলের সুরের আদর্শটি বড়ই সরল, বড়ই আভরণরিক্ত। বাউলের সুর যেমন একহারা, তেমনি তার যন্ত্রটিও হল একতারা। বাউলের বাণী ও সুরের ভিতর দার্শনিকতার আমেজ বেশী, তার কারণ ঔদাস্যের আবহাওয়ায় দার্শনিকতা খোলে ভালো। বাউলদের জীবনদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন নানা প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। জনাব মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' গ্রন্থে এবং ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বইয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য বাউল গানের সংগ্রহ আছে। বাউলদের জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কেও তাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অনুসন্ধানীদের পক্ষে এ সকল নিবন্ধাদি অপরিহার্য।

এদিকে পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালি ও সারি গানের প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, তাই স্বতঃই সেখানে নদীপথের গানের ব্যাপক প্রচলন। নদীজপমালা-ধৃতপ্রান্তর পূর্ববঙ্গের আকাশে-বাতাসে ভাটিয়ালির বিষাদের কারুণ্য মিশে আছে। বাউলের ভিতর দার্শনিকতা বেশী, ভাটিয়ালির ভিতর মানবিকতা। বেদনা-বিষাদ যেন ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ভাটিয়ালি ও সারি দুই-ই নদীপথের গান, তবে তাদের প্রকরণে তফাৎ আছে। ভাটিয়ালি মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক; সারির রূপ যৌথ। একটিতে ব্যক্তিমনের বিষাদের অবলীলায়ন, অপরটিতে যৌথ জীবনের সুখদুঃখের অভিব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ, ভাটিয়ালির গতি বিলম্বিত, ভাটির টানে আর বিষাদের ক্লান্তিতে তার পদক্ষেপ মন্থর; কিন্তু সারির লয় দ্রুত। অর্থাৎ একটি নিঃশেষে lyrical; অপরটি নাটকীয়। সারি গানের নমুনা—

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে,
ও আমার পরান বন্ধুরে।
তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল যেন
হয় পরপারে।

বিধি যদি দিত রে পাখা
উইড়্যা যাইয়া দিতাম দেখা,
আমি উইড়্যা পড়তাম সোনার বন্ধুর দেশে।
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়্যা আইস্যা দেখা দাও
তুমি দাও দেখা আমার জুড়াক পরান রে।

ভাটিয়ালি সারি প্রভৃতি নদীপথাশ্রিত গানগুলির ভিতর একটি কান্নার ভাব মিশে আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীতের গঠনের ভিতর একই প্রকার কান্নার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ কান্না আদিম মানুষের কান্না। বিরহবেদনার অন্ধকার গোপন গুহামুখ থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকগীতি, হাঙ্গেরীয় ম্যাগায়ারদের গান, স্পেনীয় ও রুশ লোকসঙ্গীত, দক্ষিণসমুদ্র-দ্বীপগুলির বাতাসের স্রোতে ভেসে-আসা দারুচিনির সুবাসমণ্ডিত হাল্কা সুরের গান, আরব্য লোকগীতি, চৈনিক সঙ্গীত—সর্বত্র লোকগীতির সুরে এই কান্না ভেঙে পড়ছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ভাটিয়ালির অনুরূপ সুরের সাক্ষাৎ মেলে। গুজরাটের ঝাঁঢ় সুরে, বিহার ও পাঞ্জাবের দেহাতী সুরগুলির ভিতর ভাটিয়ালিভঙ্গিম ক্রন্দনাকুলতা একটু কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যাবে। রাগসঙ্গীতের ভিতরও এ কান্না অনুপস্থিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভীমপলশ্রী, ভীম, পাহাড়ী, কাফি, ঝাঁঢ়, পটদীপ, ধানী, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগিণীগুলির উল্লেখ করা যায়। এই সব রাগিণীর ভিতর একটা কান্নার ভাব থমকে আছে এবং সে কান্না ভাটিয়ালির কান্নার অনাত্মীয় নয়। এ থেকে এই শুধু প্রমাণ হয় যে, আমাদের রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের সুরগঠনের আদর্শের ভিতর কোথায় যেন একটি গভীর ঐক্য বিদ্যমান। রাগই হোক আর লোকই হোক, সমস্ত সঙ্গীতের আদি উৎস যে এক, এ দৃষ্টান্তে বারংবার সে কথা মনে পড়ে।

বাংলা লোকগীতির রকমারি নমুনা। অঞ্চল ভেদে এক এক জায়গায় এক এক জাতীয় গানের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। তবে এই সব বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন মালদহের গম্ভীরা, পূর্ববঙ্গের নীলের গান এবং বীরভূমের গাজন। এদের আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তুগত মিল আছে। এ তিন ধারার গানই শিবের বন্দনা-

মূলক গান, তবে নিছক দেববন্দনার মধ্যেই তার আবেদন সীমাবদ্ধ নয় দেববন্দনার উপলক্ষ্যে কৌশলে গানগুলির ভিতর সামাজিক স্থানিক এবং সাময়িক সমস্যাকেও গ্রথিত করা হয়েছে। বাংলা দেশের পল্লীবাসী মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা শিবস্তোত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে রূপায়িত। এ রকম না হয়ে যায় না, কারণ এটি বিশেষভাবে বাঙালী প্রতিভার লক্ষণ। বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতাসমূহকে আমাদের মনের মত আকার অর্থাৎ লৌকিক আকার দিতে না পারলে যেন আমাদের সাধ অতৃপ্ত থেকে যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এ জিনিস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারতেও একই রকমের লৌকিকীকরণ দেখতে পাই। বাংলার লোকসঙ্গীতের বেলায়ও ওই এক কথা। গম্ভীরা বা গাজন বা নীলের গানের উপাস্য দেবতা শিব শাস্ত্রোক্ত ত্রিমূর্তির অন্যতম সংহারের দেবতা শিব নন, তিনি বাংলা দেশের উদাসী ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে দেবতা শিব, শ্মশানে-মশানে তাঁর বিচরণ। নেশাভাঙ করে কোথায় কখন পড়ে থাকেন তার ঠিক নেই, একপত্নীকত্বের আদর্শে যে তাঁর বিশেষ আস্থা আছে, তা অন্ততঃ তাঁর কার্যকলাপ প্রমাণ করে না। এই লৌকিক দেবতা শিবকে গানের ভিতর এনে প্রকারান্তরে তার মাধ্যমে বাংলার পল্লী অঞ্চলের একাধিক পারিবারিক সমস্যার উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। নীলের একটি গান—

দুর্গা দেবী ভাগীরথী দুই সতীনে ঝগড়া,
শিবে কয় উপায় কী করা।
আমি কিইন্যা আনলাম ঝগড়া,
দৈবের কাম কবালে করে ধৈয ধরে থাক্ তোরা।
শিবে কয় উপায় কী করা!

দ্বিপত্নীকত্বের সমস্যার উপর হাস্যবিদ্রূপ সমাচ্ছন্ন কটাক্ষ। অন্য দিকে গম্ভীরার গানে পাই গণ-দেবতা শিবের ছন্নছাড়া বিবাগী রূপ—

ভোলা বেশ ভালো তো মজা,
এ কেমন তোমার পূজা?
এবার করলি কেকম একি রকম
ঠিক যেন ভ্যাক ভ্যাকম বাজা।
এ কেমন তোমার পূজা?

বাংলার লোকসঙ্গীতের অসংখ্য বৈচিত্র্য। তাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর আলাদা আলাদা পরিচয় দিতে গেলে আলোচনা নিরতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। সে-কারণ গুটিকয় দৃষ্টান্তের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত। তা ছাড়া, এ আলোচনা গানের পঞ্জী নয়, এখানে লোকসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত আদর্শটিকেই মূলতঃ তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। লোক-সঙ্গীতে একদিকে যেমন আমরা পাই প্রকৃতি ও দেবতার উপাসনার আদর্শের প্রতিফলন, তেমনি অন্য দিকে তার ভিতর আছে সামাজিক সমস্যার আলোড়ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ টুসু গানের নাম করা যেতে পারে। টুসু গান মেয়েদের ব্রতকথার গান, বাঁকুড়া অঞ্চলে এর সমধিক প্রচলন। তবে ব্রত-কথার গান হলেও এর কথার বাঁধুনির ভিতর লৌকিক তথা সামাজিক সমস্যার অবতারণা অপাংক্তেয় নয়। বরং খতিয়ে দেখলে শেষোক্ত বিষয়-গুলিরই সেখানে আধিপত্য। প্রয়োজনে টুসু গানকে যে আরও ব্যাপক, আরও কল্যাণপ্রদ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যায়, মানভূমের সত্যাগ্রহে তা প্রমাণিত হয়েছে। টুসু গান বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার কার্যে প্রযুক্ত হয়ে অনবদ্য মহিমা লাভ কবেছে।

টুসু গানের মত বারোমাস্যার গান, ছাদপেটানো গান, জারি গান—এ সবের মধ্যেও পারিবারিক আঞ্চলিক তথা সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। জারি গানের একটি নমুনা—

আইজ বুঝি তোবে যাবে লইযা লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোবে যাবে লইযা।
ও তুই কাঙ্খিত কোণায কাঁদিস ক্যানে
ঘোমটা মুড়া দিযা লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোবে যাবে লইযা।
ও তুই বাগ কবিস না ঘবে আয বউ
চুল বাইন্ধ্যা দেই
বাঙা ফিতা দিযা,
আইজ বুঝি তোবে যাবে লইয়া।

স্পষ্টতঃই জারি গান মুসলমানদের গান, তবে লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিযয় এই যে, এই ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি এক অখণ্ড বৃহত্তর ঐক্যে সমন্বিত হয়েছে। যেমন বৈষ্ণব কবিতায় তেমনি বাংলার

লোকসঙ্গীতের ভিতর হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি এক সাধারণ মিলনভূমিতে এসে সঙ্গত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক মিলন বিশেষভাবে আমরা দেখতে পাই মুর্শিদ্যা গানে, সত্যপীরের পাঁচালীতে, গাজীর গানে এবং এ-জাতীয় আরও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত গানের নমুনায়। মুর্শিদ্যা গান বাউলেরই দেহান্তরিত রূপ মাত্র। মুসলিম দরবেশদের গাওয়া সত্যপীরের গান ও গাজীর গানের ভিতর হিন্দু দেবদেবীর মহিমা প্রকীর্তিত। এই দিক দিয়ে লোকসঙ্গীতের বিচার করলে তার অশেষ কল্যাণকর সম্ভাব্যতা চোখে পড়বে। লোক-সঙ্গীত বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের শ্রেষ্ঠ একটি প্রতীক। এই প্রতীক-চিহ্নটিকে যত বেশী নিবিড়ভাবে আঁকড়ে থাকা যায় ততই আমাদের কল্যাণ। বাংলা দেশ ভাগ হয়েছে, তা বলে বাংলা সংস্কৃতি ভাগ হয় নি। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমরা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখব, এই আমাদের পণ হওয়া উচিত। লোকসঙ্গীতের সার্থকতা এখানে যে, তা এই সাংস্কৃতিক মিলনের কাজ সহজতর করবে। বাংলার সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে কিছু পরিমাণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই বিভাগটি সেই অশুভ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কাজেই বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে লোকসঙ্গীতের পোষকতা সর্বথা বৃদ্ধি পাক, এই কামনা করব।

মুর্শিদ্যার মত দেহতত্ত্ব বাউলের অপর একটি শাখা। দেহতত্ত্ব নামটি স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ এর ভিতর তত্ত্ব প্রধান। মানবজীবনের অস্তিত্বের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর ভাবের কথা এই গানে রূপকের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত। দু' একটি দৃষ্টান্ত দিই—

ও তুই দিন থাকতে গুরু চাঁদকে
উঠা নৌকাব পব,
নইলে রৌদ্র উঠে যাবে চটে
শেষে দোহাই দিবি কাব ॥
ছয় বোম্বেটে আছে নেযে
তাবা আস্তে আস্তে নেবে বেযে,
তোবে ছেড়ে দিবে খোলায় নিয়ে
কেঁদে কেঁদে কূল পাবি না আর ॥
গুরু চাঁদকে দে হালেব কাঁটা,
হরি চাঁদ আপনি এসে টানবে বৈঠা।

এবার ফটিক চাঁদকে শুধে পাঠা
(ও তুই) নৌকায় বসে মুন্সীগিরি কর ॥

কিংবা,

বঁধু, বাঁশী দাও মোর হাতেতে,
আজ নিশি বাজাইয়া দেই নিও প্রভাতে।
ওরে তোমাব বাঁশী তুমি নিবা সন্দ কি তায় মনেতে ॥
বাঁশীতে বন্ধ্র আছে সাত,
কোন রন্ধ্রে কোন্ গুণ ধবে
দেখব আজি বাত।
বন্ধু, তুমি গুণী কি আমি গুণী বাষ্ট্র হোক জগতে ॥
কোন বন্ধ্রে জল বয় বে উজান,
কোন্ বন্ধ্রেতে যোগী ঋষি যোগে ছাড়ে ধ্যান,
ওরে কোন্ বন্ধ্রেতে যায রূপসী জল ফেলে জল আনিতে ॥
আজ নিশি বাজাইযা দেই নিও প্রভাতে ॥

এই অপূর্ব সুন্দর রচনাটিকে রাধাকৃষ্ণের দুর্নিবার প্রেমালেখ্যও ভাবা যায়, আবার ভক্ত-ভগবানের নিগূঢ় সম্পর্কের চিত্রণও মনে করা যায়। বোধ করি শেষোক্ত দিক থেকেই গানটি সমধিক সার্থক। "বন্ধু, তুমি গুণী কি আমি গুণী রাষ্ট্র হোক জগতে।" ভক্তের মুখে প্রেমের এত বড় 'চ্যালেঞ্জ' কে কবে শুনতে পেয়েছে?

সর্বশেষে কীর্তন। আমরা এতক্ষণ ইচ্ছা করেই কীর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি। তার কারণ কীর্তন লোকসঙ্গীত কিনা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহলে মতভেদ আছে। কীর্তনকে যাঁরা লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলবার পক্ষপাতী নন তাঁদের যুক্তি এই যে, কীর্তন অনুশীলনসাপেক্ষ সঙ্গীত, তার সুর-তান-লয়-মান অত্যন্ত জটিল। পিছনে দীর্ঘকালীন সাধনার পোষকতা না থাকলে কীর্তনের ভাব ও আঙ্গিক আয়ত্ত করা দুরূহ ব্যাপার। অনুশীলন ও মনন যদি বিদগ্ধ বা নাগরিক সঙ্গীতের প্রধান লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তা হলে কীর্তনকে কোনক্রমেই লোকসঙ্গীতের আওতায় ফেলা চলে না। কীর্তন অনুশীলননির্ভর সঙ্গীত, সুতরাং বিদগ্ধ সঙ্গীতের কোঠাতেই তার স্থান হওয়া উচিত। অন্যপক্ষে. এক দল কীর্তনকে লোকসঙ্গীত বলতে চান এই যুক্তিতে যে, কীর্তনের সুরের আবেদন সর্বব্যাপী এবং অত্যন্ত লোকরঞ্জক। কীর্তনের

সুরের মাধুর্যে মুগ্ধ হয় না এমন লোক কম আছে। তা ছাড়া কীর্তনের সুরের সঙ্গে ভাটিয়ালি প্রভৃতি সুরের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কীর্তনের একটি মূল আশ্রয় হল খাম্বাজ রাগিণী, এই খাম্বাজ সুর সূক্ষ্মভাবে ভাটিয়ালিরও উপজীব্য বটে। ভাটিয়ালির মধ্যে যে ক্রন্দনপরতা চোখে পড়ে তা কীর্তনের সুরের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। কীর্তন গায়কের ক্রন্দনভারাবনত আবেগগদগদ কণ্ঠস্বর বাদ দিলে কীর্তনের একটি বড় লক্ষণ বাদ পড়ে যায়। কীর্তনের বহিরঙ্গ আয়ত্ত করতে সাধনার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু কীর্তমের অন্তর্দেশে স্বতস্ফূর্ত আবেগটাই প্রধান কথা। এ সব বিচারে কীর্তনকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করলে অন্যায় হয় না।

কীর্তনের মতো বিশেষজ্ঞাশ্রিত, প্রয়োগনির্ভর একটি ব্যাপারে আমাদের মতামতের মূল্য সামান্য, তবু সাধারণ শ্রোতা হিসাবে এখানে একটি মত সবিনয়ে উপস্থাপিত করছি।

কীর্তনেব দুই ধারা। এক, বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলী কীর্তন ও রসকীর্তন; দুই, লৌকিক কীর্তন। এই লৌকিক ধারার কীর্তনকে স্বচ্ছন্দে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। পদাবলী কীর্তন বিশেষ সাধনা ও অনুশীলন সাপেক্ষ ব্যাপার, সুতরাং তাব পক্ষে বিদগ্ধ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে বাধা নেই। কিন্তু লৌকিক ধারার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত একক কীর্তনগুলিকে লোকসঙ্গীতের কোঠায় ফেলাই যুক্তিযুক্ত। সাধাবণতঃ পল্লী অঞ্চলের বৈষ্ণব ভিখারী ও বৈরাগীদের মুখে এ জাতীয় কীর্তন শুনতে পাওয়া যায়। খঞ্জনী বাজিয়ে তারা গান গায়। একটি নমুনা দিই—

আব কি কুলে রব লো সখী
আব কি কুলে বব।
কালিযা কালিযা বিষম কালিযা
কে বলে কালিয়া ভালো।
কালিযাব সনে পীবিতি কবিযা
কাঁদিতে জনম গেল।
(লো সখি কাঁদিতে জনম গেল)

* * *

মৃত্তিকা উপরে জলেব বসতি জলের উপবে ঢেউ,
ঢেউয়েরই সনে পবনের পীরিতি

নগবে জানে না কেউ (লো সখী
নগবে জানে না কেউ) ।
(আবাব) মৃত্তিকা উপবে ফুলের গাছটি
তাহাতে ধইবাছে ফুল,
ফুলেব উপবে গুঞ্জবে ভ্রমবা
মজাইয়া গেল দুই কূল ॥ ইত্যাদি

কীর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটু অগ্রসর হয়ে আমরা বলব, কীর্তন মূলত: ভক্তিরসাত্মক গান হলেও কীর্তনের সুরের এমনি অপ্রতি-রোধ্য মাধুর্য যে ভক্তিভাব-নিরপেক্ষভাবেও কীর্তন গাইতে বাধা নেই। ভক্ত হোক অভক্ত হোক, কীর্তনের সুর সকলেরই মনোহরণ করতে বাধ্য। কীর্তনের ভক্তিভাব তার পদের ভিতর নিহিত, কিন্তু সুরের তেমন কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন থাকতে পারে না। কীর্তনের সুরের রসের দরবারে সকলেরই সমান আসন, সকলেরই সমান অধিকার। গানে সুরই হল আসল, সুতরাং সুরেব দাবি সর্বাগ্রে মান্য। দিলীপকুমার আধুনিক ধারার গানে কীর্তনের ঢঙে আখর যোজনা করেছেন, আর একটু এগিয়ে গিয়ে ভক্তি-নিরপেক্ষ সাধারণ ভাবের গানে কীর্তনের সুর প্রয়োগে বাধা দেখি না।

ভারতীয় সঙ্গীতে প্রগতিলক্ষণ

সঙ্গীত শিল্পকলাব অন্যতম প্রধান শাখা হলেও এই শাখা আজও আমাদেব দেশে অল্পবিস্তব অনাদৃত হয়ে বয়েছে। তাব একটি প্রমাণ সমাজপ্রগতিব সঙ্গে ভাবতীয় সঙ্গীতেব অদ্যাবধি প্রাণেব যোগ স্থাপিত হয় নি। সাহিত্যে চিত্রকলায় নৃত্যে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে সমাজেব চলমানতাব রূপ নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত। সমাজদেহে যখনই যে নূতন ভাবধাবাব অভিঘাত লাগছে সাহিত্য চিত্রকলা ইত্যাদিতে তখন-তখুনি তাব স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে: সামাজিক বিবর্তনেব সঙ্গে তাল বেখে সাহিত্য চিত্রকলা ইত্যাদিবও নিত্য নূতন রূপান্তব সাধিত হচ্ছে। সাহিত্যে সমাজপ্রগতিব অভ্রান্ত লক্ষণ, আমবা বোমান্টিকতাব স্বপ্নকুযাসা অতিক্রম কবে বিযালিজমেব কঠিন মাটিতে এসে পা দিযেছি। বাস্তবচেতনাব দ্বাবা সঞ্জীবিত কবে নিয়েছি অলৌকিক আদর্শবাদকে। ফর্ম বা আঙ্গিকেব ক্ষেত্রে এসেছে স্পষ্টতা আব প্রাঞ্জলতাব দিকে ঝোঁক, যদিও চিন্তাপ্রণালীতে এসেছে সহস্রবিধ জটিলতা। তেমনি চিত্রকলাব ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হযেছে নানাবিধ নূতন প্রকাশভঙ্গিব পবীক্ষা। কিউবিজম স্যুববিয়ালিজম্ ফিউচাবিজম—চিত্রকলাব ক্ষেত্রে এই যে নানাবিধ নূতন প্রকাশবীতি নিয়ে এক্স্‌পেবিমেণ্ট চলছে, শিল্পোৎকর্ষেব দিক দিয়ে এগুলিব নিহিত মূল্য যাই হোক, এগুলিব মধ্যে পাবিবর্তিত সমাজমানসেব অনেকখানি প্রতিফলন ঘটেছে তাতে সন্দেহ থাকতে পাবে না। পুবাতন দিনেব চিত্রকলায় চিত্রেব বিষয় আব তদন্তর্নিহিত ভাব পবিস্ফুটনেব পক্ষে বলিষ্ঠ বেখা আব বঙেব ব্যঞ্জনাই যথেষ্ট ছিল। এখন সমাজেব রূপ বদলেছে, সমাজ-বিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে মানুষেব মন ক্রমশঃ জটিল হয়েছে, তদনুপাতে তাব জীবনযাত্রাপদ্ধতি আব লক্ষ্যেবও ঘটেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য পবিবর্তন। কাজেই সনাতন অঙ্কনপদ্ধতি নিযে এখনকাব দিনেব চিত্রকলাব আব কাজ চলতে পাবে না। প্রযোজনতঃ তাকে হতে হয়েছে অন্তর্মুখী। নির্জন মনেব অর্ধস্ফুট কল্পনা ভাবনাকে আজকেব দিনেব শিল্পীবা তাঁদেব চিত্রে পবিস্ফুট কববাব চেষ্টা কবছেন।

শিল্পকলাব ক্ষেত্রে এই যে নূতন নূতন পবীক্ষা, এ সবই হল যুগধর্মেব

সময়োচিত বহিপ্র্কাশ। এই বহিপ্র্কাশ দিয়ে শিল্পের অগ্রগতি বুঝে নিতে হয়। নূতন পরীক্ষারীতির কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ—সে কথা হচ্ছে না। ভাল-মন্দ নির্বিচারে পরীক্ষা-প্রয়াসগুলির সামাজিক উপযোগিতা আছে, আর সেইটিই আসল কথা।

পরিতাপের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতের দেহে সমাজের চলমানতার রূপ তেমন পরিস্ফুট নয়। ভারতীয় সঙ্গীত এখন পর্যন্ত পুরাতনের জাবর কেটে চলছে। পৌনঃপুনিকতার চোরাগলির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরছে। এর একটা কারণ, এখন পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীত যে-শ্রেণীর মানুষের করধৃত হয়ে রয়েছে তাঁরা আধুনিক কালের মানুষ হলেও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তাঁদের আধুনিক যুগের প্রতিভূ মনে করা যায় না। ভাবাদর্শ আর রুচির দিক দিয়ে তাঁরা কাল-বারিত পুরাতন যুগের মানুষ। কাজেই এঁদের অনুশীলিত সঙ্গীতের ভিতর প্রগতিলক্ষণ আশা করা মূঢ়তা।

যেমন রাজা মহারাজা জমিদার শ্রেণীর লোক। এতাবৎ ভারতীয় সঙ্গীত এই অবসরভোগী পরশ্রমপুষ্ট শ্রেণীর মানুষদের দ্বারাই প্রধানতঃ অনুশীলিত হয়ে এসেছে। এঁদের হাতে সঙ্গীতের কোনরূপ বিকাশ হয় নি বললে সত্যের অপলাপ কবা হবে। তবে সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয়, এঁদের প্রভাব-পরিধির মধ্যে সঙ্গীতকলা নিবদ্ধ রয়েছে বলেই আজও ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তি সাধিত হল না। প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাততন্ত্রের প্রভাবচক্রের বাইরে সঙ্গীতের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র যদি তৈরি হত, জনগণের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ স্থাপিত হত, তা হলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রগতির প্রমাণ অনেক আগেই আমরা পেতুম। কিন্তু সে-রকম কোন আশাপ্রদ লক্ষণ অদ্যাবধি অনুপস্থিত। সত্য বটে ভারতের রাষ্ট্রদেহ থেকে আজ রাজতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের মোটামুটি উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয়েছে, তবু এখনও নূতন কালের সূচনা হয় নি। প্রথা দূর হলেও মনোভাব এত সহজে দূর হয় না। বাতিল সামন্ততন্ত্রের সংলগ্ন মনোভাব আজও ভারতবাসীর চিন্তায় কর্মে প্রবলরূপে বিদ্যমান ও প্রকাশমান। ভারতীয় সঙ্গীত আজও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার আবর্তে লক্ষ্যহীনভাবে আবর্তিত হয়ে ফিরছে।

আমাদের দেশে এতকাল বিধিবদ্ধভাবে যাঁরা রাগসঙ্গীতের চর্চা করে এসেছেন, যাঁদের মধ্য দিয়ে রাগসঙ্গীতের ধারা পুরুষানুক্রমে বাহিত হয়ে

এসেছে, অর্থাৎ 'ঘরানা' ওস্তাদের দল, এঁদের সঙ্গীতনৈপুণ্যের তুলনা নেই। কিন্তু এই নৈপুণ্য সবটাই গড়ে উঠেছে অশিক্ষিতপটুত্বের ভিত্তির উপর। পল্লীঅঞ্চলের স্বভাবকবির মধ্যে, লোক-গাথার রচয়িতার মধ্যে, আউল-বাউল শ্রেণীর সাধুদরবেশের মধ্যে যে অশিক্ষিতপটুত্বের নিদর্শন আমরা পাই, ওস্তাদদের অশিক্ষিতপটুত্ব অনেকটা সেই গোত্রের। এই অশিক্ষিতপটুত্বের সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। অসুবিধাই বেশী। শিল্প-সংস্কৃতি-শিক্ষার প্রবহমান ধারার সঙ্গে যদি অন্তরের যোগ না থাকে, সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যদি পরিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকাবী না হওয়া যায়, স্বাভাবিক বা পরিবেশগত পটুত্ব মানুষকে খুব বেশী দূর টেনে নিয়ে যেতে পারে না। পরিবেশগত পটুত্বের সঙ্গে যখন শিক্ষালব্ধ রুচির বৈদগ্ধ্য এসে যুক্ত হয়, শিল্পসাধনা তখনই যথার্থ সার্থকতামণ্ডিত হয়ে ওঠে, তার আগে নয়।

আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে রুচির বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর যেখানে রুচির উৎকর্ষ নেই, সেস্থলে প্রগতিশীলতাও আশা করা চলে না। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ওস্তাদদের সঙ্গীতনৈপুণ্যের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে গেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদেব চিত্তের অনুদাবতা আব অসহিষ্ণুতার প্রতিও অঙ্গুলিনির্দেশ করতে ভোলেন নি। ভাতখণ্ডেজীর প্রগতিশীল মন ওস্তাদদের গোঁড়ামি বরদাস্ত করতে পারে নি। ওস্তাদরাও সেই কারণে তাঁর উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু ভাতখণ্ডেজীর বিশ্লেষণই সত্য। ভারতের বুক থেকে গোঁড়ামির লক্ষণযুক্ত ওস্তাদতন্ত্র প্রায় বিলুপ্ত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ঘরানা সঙ্গীতের প্রতিনিধিরা একে একে অস্তমিত হচ্ছেন। ওস্তাদী ধারার সঙ্গীতকাররা যদি আধুনিক যুগপ্রভাবের সঙ্গে তাল রেখে চলতেন, তাঁদের ভাগ্যে এমন দশা ঘটত কিনা সন্দেহ।

ওস্তাদদের যে অনুদারতা আর অসহিষ্ণুতার কথা বলা হল সেটি মুখ্যতঃ বর্তমান কালেব ভাবাদর্শগুলি সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা। আর যে পরিমাণে তাঁদের বর্তমান যুগ সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, সে পবিমাণে তাঁদের অতীত সম্পর্কে মোহ। অতীতের মোহ একটা সর্বব্যাপী প্রভাবের মত তাঁদের সমগ্র সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওস্তাদদের এক এক ঘরে বিশেষ বিশেষ গানের বিশেষ বিশেষ ঢঙ ও 'বন্দেজ্' প্রচলিত। এই বৈচিত্র্য

খুবই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ওস্তাদদের রীতি নিয়ে। একটি গান যে-ঘরে যেভাবে গাওয়া নিয়ম তার থেকে একচুল এদিক-ওদিক হল কি ওই ঘরের ওস্তাদের দল মারমুখো হয়ে এলেন। যেন গানে প্রাণ বড় কথা নয়, গানের স্বরবিশুদ্ধিটাই সব চেয়ে আদৃত কথা। বেহাগ রাগিণীতে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার প্রশস্ত, কিন্তু কোন কোন ঘরানায় শুনতে পাই বেহাগ গানে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে, কড়ি মধ্যমযুক্ত বেহাগই হোক আর কড়ি মধ্যম-বিবর্জিত বেহাগই হোক, বেহাগ রাগিণীর বিশেষ ঢৌলটি যদি এই দুই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলা যায় তবে এই দুই পদ্ধতিই গ্রাহ্য। গায়ক যদি গানে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারেন তবে শুদ্ধমাত্র স্বরবিশুদ্ধি রক্ষা করে এমন কী চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে। মালকোষ—সা জ্ঞা মা দা ণা র্সা এই পাঁচটি স্বরের আরোহাবরোহক্রমে তৈরি একটি অনবদ্য রাগ। পাঁচ স্বরের ওঠানামার মধ্যে রাগের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির অবকাশ সঙ্কুচিত ; কিন্তু মালকোষে পাঁচটি স্বরের সীমার মধ্যে রাগের কী লীলায়িত রূপই না ফুটেছে! গায়ক মালকোষের রূপদানকালে সাধারণতঃ তাঁর গান উল্লিখিত পাঁচটি স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন এইটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু একেবারেই তা থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না তাই বা কেমন কথা? কেউ যদি মালকোষের রাগরূপ অবিকৃত রেখে অকস্মাৎ অন্য কোন সুরের খোঁচ লাগিয়ে মালকোষকে সুন্দরতর করতে পারেন তাতে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয় বুঝি না। তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রায় মালকোষ রাগের গৎ কেউ কেউ শুনে থাকবেন। তাতে মালকোষের শাস্ত্রোক্ত রাগরূপ রক্ষিত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। অথচ রাগটির কী অপরূপ সম্ভাবনাই তা তাতে প্রকটিত হয়েছে! জৌনপুরীতে শুদ্ধ নিখাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অথচ অতুলপ্রসাদ তাঁর একটি জৌনপুরী গানে ("তব চরণতলে সদা রাখিয়ো দীনবন্ধু") জৌনপুরী স্বরক্রমের মধ্যে শুদ্ধ নিখাদ যেরূপ অবলীলাক্রমে মিশিয়েছেন তাতে তাঁর সুরদক্ষতার তারিফ না করে পারা যায় না।

আমাদের কথা হল, রাগের মৌলিক রূপ অবিকৃত রেখে রাগের ভিতর দুই-একটা বাড়তি সুরের খোঁচ লাগিয়ে যদি তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়, তাতে এমন কি মহাপাতক হয় বুঝি না। কিন্তু ওস্তাদের দল

গায়কের এই স্বাধীনতার অধিকার মানতে প্রস্তুত নন। কবে কোন্ সময়ে একটি বিশেষ রাগের আর গানের বিশেষ ঢঙ প্রবর্তিত হয়েছিল তা থেকে তিলমাত্র বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখলেই তাঁরা সুগভীর বিপদপাতের আশঙ্কায় সব হা-হা করে ছুটে আসেন। শিল্পের ক্ষেত্রে এই অতীতাশ্রয়িতা শ্রদ্ধেয় নয়। মানি প্রত্যেক শিল্পেরই কতকগুলি আত্ম-আরোপিত অনুশাসন মেনে চলবার প্রয়োজন আছে, সংযমবন্ধন অতিক্রম করলে শিল্পমাত্রই স্বৈরাচারের এলাকায় গিয়ে প্রবেশ করে। সঙ্গীতের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু নির্ধারিত সংযমবন্ধনের মধ্যে স্বাধীনতার অনেকখানি ক্ষেত্র পড়ে থাকে, যা অকর্ষিত থাকলে অচিরেই শিল্পের বন্ধ্যাত্বদশা দেখা দেয়। ভারতীয় সঙ্গীতেরও হয়েছে সেই দশা। শিল্পীর স্বাধীনতার অধিকার ভারতীয় সঙ্গীতের একটি স্বীকৃত আদর্শ হলেও এখনকার সঙ্গীতকারেরা তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত। নির্দিষ্ট একটি গণ্ডীর মধ্যে সঙ্গীত কেবলই পাক খেয়ে ফিরছে আর তার দেহে একঘেয়েমির সমস্ত পরিচিত লক্ষণগুলি ফুটে উঠছে। একঘেয়েমির ব্যাপারে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের তুলনায় দক্ষিণী বা কর্ণাটী সঙ্গীতের বিচ্যুতি আরও বেশী। দক্ষিণী সঙ্গীতে বৈচিত্র্য প্রায় নেই বললেই চলে, যদিও দক্ষিণী সঙ্গীতকারদের সঙ্গীত-নিষ্ঠা অসাধারণ। দক্ষিণী সঙ্গীতের এই বৈচিত্র্যহীনতার মূলে রয়েছে দক্ষিণী সঙ্গীতকারদের অতিরিক্ত শাস্ত্রপ্রীতি। শাস্ত্রোক্ত বিধানের বাইরে তাঁরা এক পা অগ্রসর হতে নারাজ। ফলে দক্ষিণী সঙ্গীতের মধ্যে রসবৈচিত্র্যের স্থান কম ; সঙ্গীতের অচলপ্রতিষ্ঠ ঊষর শাস্ত্ররূপটাই তাতে বড় হয়ে উঠেছে।

ওস্তাদদের আরেকটি ধারণা এই যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের বিশেষ কোন যোগ নেই। বরং শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি নাগরিক সভ্যতার ভূষণগুলি সঙ্গীতের পরিপন্থী। ওস্তাদরা যে জীবনভোর কুশিক্ষিত থেকে যান অথচ তার জন্য মনে কোন গ্লানিবোধ করেন না, বোধ করি এই মনোভাবই তার মূলে। আসল কথা, শিক্ষার কোন তাগিদ তাঁদের মনে নেই। নইলে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ বা অবকাশ তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে।

ওস্তাদদের এই শিক্ষাবিমুখতার মনোভাব তাঁদের সমূহ অনিষ্ট করেছে। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, রুচি পরিমার্জিত করে, তাকে মহত্ত্বের প্রেরণা দেয়। শিক্ষাবর্জিত শিল্পসাধনা খানিকদূর অবধি মন কেড়ে নেয়,

কিন্তু মনন ও সূক্ষ্ম অনুভূতি মিলিয়ে শিল্পের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ, সে এলাকায় শিক্ষাবিবর্জিত সাধনার প্রবেশাধিকার নেই। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত ওস্তাদ-কুলের মধ্যে সচরাচর যে সঙ্গীতনৈপুণ্য দেখা যায় সেটি আরও অনেক বেশী পরিশীলিত অনেক বেশী সম্মার্জিত হতে পারত, যদি তাঁদের রুচি যুগধর্ম অনুযায়ী আশানুরূপ কর্ষিত হত। বস্তুতঃ এ কথা বললে কিছু অন্যায় বলা হয় না যে, শিক্ষার অভাবই মুখ্যতঃ ওস্তাদদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিবিমুখ করে রেখেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতার রূঢ় হস্তাবলেপ দ্বারা তাঁদের সাধনা কলঙ্কিত। এর কারণ তাঁদের সঙ্গীতনৈপুণ্যের অভাব নয়—তাঁদের সঙ্গীতনৈপুণ্য যথেষ্ট আছে—, এর কারণ তাঁদের মানসিকতায় যুগোচিত সচলতার অভাব। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে নৈপুণ্যটাই সব কথা নয়, দেখতে হবে সে নৈপুণ্য প্রগতির স্বীকৃত লক্ষণগুলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। তা যুগপ্রভাবের অনুগত কিনা। এই মানদণ্ডে কালোয়াতী সঙ্গীতের ঐতিহ্য মুহূর্তের বিচার-বিশ্লেষণের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারে কিনা সন্দেহ।

প্রশ্ন উঠবে, যুগপ্রভাবের অনুকূলে এত যে কথা বলা হচ্ছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার বিশেষ রূপটি কী। শুধু প্রগতি আর যুগলক্ষণের কথা বলাই যথেষ্ট নয়; সঙ্গীতের ন্যায় উপকরণবাহুল্যবর্জিত শিল্পের বেলায় তার প্রয়োগ কী ভাবে হতে পারে সেটি জানা দরকার। চতুঃষষ্টি শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে abstract শিল্প হচ্ছে সঙ্গীত। অন্যসব শিল্পে বিবিধ উপকরণাদির প্রয়োজন হয়, সঙ্গীতে সে প্রয়োজন অনুপস্থিত। সঙ্গীতের একমাত্র উপকরণ সুর; যেখানে সুর নিয়ে কথা, সেখানে প্রগতি-অপ্রগতির কথা আসে না।

প্রশ্নটি ভাবিয়ে তোলবার মত। সত্যিই তো, সঙ্গীতের মধ্যে প্রগতি-লক্ষণ আমরা চিনব কী উপায়ে? সাহিত্য চিত্রকলা ইত্যাদির মত সঙ্গীতের ভিতরও যদি মননের অবকাশ থাকত, সঙ্গীতের প্রকাশ সবটাই যদি অনুভূতিসম্বল না হত, তা হলে সঙ্গীতের প্রগতিলক্ষণ চেনা সহজ হত। কিন্তু সঙ্গীত যে মাত্র সুরময়, তার বেশী কিছু নয়। মননক্রিয়াবিরহিত ভাবব্যঞ্জনার এলাকায় প্রগতিলক্ষণ মেলাব কার সঙ্গে, কী দিয়ে?

এখানে ডুয়েট ত্রয়ী সঙ্গীত চাতুর্মুখ সঙ্গীত সমষ্টি-সঙ্গীত প্রভৃতির কথা ওঠে। আমাদের দেশের সঙ্গীতসাধনার ঐতিহ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দ্বারা সবিশেষ অনুপ্রাণিত; মিলিত অনুভূতির স্থান তাতে বড় একটা নেই।

সুর প্রধানতঃ একক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে, সুরের প্রকাশটিও তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রয়ে গেছে। কি গায়ন কি বাদন, উভয়তঃ ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ মুখ্যতঃ একক। হাল আমলে অবশ্য ইউরোপীয় সঙ্গীতের অনুসরণে আমরা সম্মিলিত বাদনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কণ্ঠের বেলায় এখনও ভারতীয় সঙ্গীতের ঝোঁক মুখ্যতঃ এক-ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ। এই ক্ষেত্রে আমাদের অভিনবত্ব-প্রয়াস বড় জোর ডুয়েটের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে; 'কোরাস'ও কিছু কিছু আমরা সৃষ্টি করেছি। কিন্তু প্রকৃত যৌথ বা সমষ্টি-সঙ্গীতের রূপ আমাদের ধারণার বাইরে রয়ে গেছে।

তার অর্থ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আজও আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাব দ্বারা বিনিঃশেষে আচ্ছন্ন। প্রতি মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা প্রবল। এই চেতনা একান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তবে সুস্থ সমষ্টিচেতনার সঙ্গে তার বিরোধ না ঘটে সেটিও দেখা দরকার। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তার ভাবনা ও কর্মকে যদি দশের ভাবনা ও কর্মের সঙ্গে মেলানো যায়, তার চাইতে সুখের বিষয় আর-কিছু হতে পারে না। আজকের দিনের প্রবণতা স্বাতন্ত্র্যের চেতনাকে সমষ্টিচেতনার সঙ্গে অন্বিত ও সঙ্গতিযুক্ত করায়। প্রগতিশীল মানুষের তাবৎ চিন্তা আর কর্মের আন্দোলন এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই পরিচালিত হচ্ছে। সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রবণতার অভিব্যক্তি ক্রমশঃ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় সঙ্গীতে তার বিশেষ চিহ্ন নেই। ওস্তাদরা দীর্ঘদিন সুর নিয়ে যে সাধনা করে এসেছেন তাতে একক-সঙ্গীত-সুলভ সুরের যাবতীয় সম্ভাবনা প্রায় উজাড় করে ঢালা হয়ে গেছে; এখন যা চলছে তা পুরনো স্বরবিন্যাসের 'পারমুটেশন-কম্বিনেশন' মাত্র। এই পারমুটেশন-কম্বিনেশনও আর বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না; কারণ স্বরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, তা নিয়ে অনির্দিষ্ট কাল স্বরবিন্যাসের খেলা জমানো যায় না।

কাজেই ভারতীয় সঙ্গীতের মোড় নতুন দিকে ফেরাতে হবে, ফেরানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর সমষ্টিসঙ্গীতই হল সেই প্রত্যাশিত দিক। এতে পৌনঃপুনিকতাজর্জরিত একঘেয়ে সঙ্গীতের স্বাদবদলও হবে, সঙ্গীতের এলাকায় প্রগতিলক্ষণকেও বরণ করে নেওয়া হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী গীতি-কবিতার চূড়ান্ত সৌন্দর্যের রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এ যুগের খণ্ডকবিতায়;

তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একক গায়ন ও বাদনের সূক্ষ্মতম বিকাশ আমরা অবলোকন করেছি। এক্ষণে সুরসৃষ্টির এলাকায় মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সঙ্গীত বর্তমানে যে অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে কেবলই যদি একক সঙ্গীতের উপর জোর দেওয়া হয়, পৌনঃপুনিকতার অন্তহীন বৃত্তই শুধু রচিত হতে থাকবে, নূতন সৃষ্টির দ্বারা আর সুরভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে না।

বাংলা গানের যে আন্দোলন অধুনা চলছে সঙ্গীতামোদীদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই যুক্তিতে যে, আধুনিক বাংলা গানের সুররূপের মধ্যে বর্তমান যুগধর্মের আভাস পাওয়া যায়। সত্যিই কি পাওয়া যায়? বরং এই তো দেখি, আধুনিক বাংলা গানের বাণী আর সুরযোজনার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রঙে রাঙানো পুরাতন সাঙ্গীতিক ধারাটাই প্রবলভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে। আধুনিক বাংলা গানের পদযোজনায় 'হিয়া' 'মরমী' 'সখি' 'সজনী' 'চাঁদ' 'চকোর' প্রভৃতি কথার আধিক্য বিগত যুগের অবাস্তব এক রোমান্টিক ঐতিহ্যের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়, যে ঐতিহ্য এ যুগে অচল। আর সুরযোজনায় আধুনিক বাংলা গান তারই উপর দাগা বুলিয়ে যাচ্ছে মাত্র। এদিকে রুচির অধঃপতন ঘটেছে। আধুনিক বাংলা গানের ভিতর সুরের যে নির্বিচার মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায় তা সুরের ব্যভিচার ছাড়া কিছু নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও সুরের মিশ্রণ আছে, তবে সে মিশ্রণ নিছক খামখেয়ালজাত নয়, তার পিছনে পরিকল্পনা আছে। রবীন্দ্রগীতিতে বিপরীতধর্মী সুরের মধ্যে মিশ্রণের দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে; আধুনিক বাংলা গানের ভিতর এই ধরনের মিশ্রণ হামেসাই চোখে পড়ে। সুরের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিকাশের আমরা পক্ষপাতী বটে, তবে তার মানে এ নয় যে যেমন-তেমন ভাবে সুরের মিশেল দিলেই তা অনুমোদনযোগ্য হবে। উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতার মর্যাদা কদাপি দেওয়া চলে না।

বাংলা গান আজও কতদূর প্রগতিবিমুখ, একটি বিশেষ শ্রেণীর গান থেকে তার প্রমাণ মিলবে। আমরা কীর্তনের কথা বলছি। কীর্তন বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত-সম্পদ, কীর্তনের সুরৈশ্বর্যের তুলনা নেই। কীর্তনের সুরসম্ভাবনাকে যে কত নূতন নূতন দিকে উন্মুক্ত করা যায় তা বলে শেষ করা যায় না। অথচ আশ্চর্য, আমরা আজও কীর্তনের সুরকে নিছক

ভক্তিরসাশ্রিত গানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। পদাবলী কীর্তনের মধ্যে কীর্তনের সুর আর আখরের রূপ খোলে ভাল সে কথা অস্বীকার করি না, তবে পদাবলীর মধ্যেই কীর্তনকে চিরটা কাল ধরে রাখতে হবে তার কি কথা? ভক্তিমূলক পদ ছাড়া অন্য কোন পদে কীর্তনের সুরব্যবহার বারণ—এমন কি কোন শাস্ত্র-নির্দেশ আছে? অথচ সেই অজ্ঞাত শাস্ত্রনির্দেশ আমরা সকলেই কার্যতঃ মেনে নিয়েছি, আর কীর্তনের নামমাত্রে ভক্তিভাবে আমাদের চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। পুনা আশ্রমের শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায় কীর্তনের অযুত সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আধুনিক ঢঙে কিছু কিছু কীর্তন গান রচনা করেছেন। তাঁর এ প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, দিলীপকুমারের ভিতর ভক্তিভাবের সংস্কার অতিমাত্রায় বলবৎ। তিনি যদি আশ্রমসদস্য না হতেন আর তাঁর মানসিকতায় ভক্তিভাবের আতিশয্য না থাকত তা হলে হয়ত সত্যিকারের আধুনিক কীর্তন তাঁর কাছ থেকেই আমরা বহুসংখ্যায় পেতাম। কিন্তু নিজেই তিনি তাঁর অভিনবত্বপ্রয়াস খণ্ডন করেছেন। দিলীপকুমারের আধুনিক ঢঙয়ের কীর্তন গানেই যে শুধু ভক্তিভাব রয়েছে তা-ই নয়, তাঁর সকল গানেই ভক্তিভাবের প্রাবল্য পরিলক্ষণীয়। একটি বিরাট সম্ভাবনাময় আধুনিক সঙ্গীতপ্রতিভা ভক্তিরসের বদ্ধ জলায় আটকে কী ভাবে অযথা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে দিলীপকুমারের দৃষ্টান্ত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোট কথা, কি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত কি কর্ণাটী সঙ্গীত কি বাংলা গান, কোথাও প্রগতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না। সমাজপ্রগতির আন্দোলন থেকে ভারতীয় সঙ্গীত যতদিন পর্যন্ত আপনাকে দূরে রাখবে ততদিন সঙ্গীতের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি সুদূরপরাহত হয়ে থাকবে।

যৌথ সঙ্গীত

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় সঙ্গীতের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করে তাঁর 'গীতসূত্রসার' বইতে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত ক্রমশঃ নাট্যসঙ্গীতের দিকে মোড় নেবে এবং নাট্যসঙ্গীতই হবে আগামী দিনের ভারতীয় সঙ্গীতের মূল চেহারা। সঙ্গীতকোবিদ শ্রীদিলীপকুমার রায় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তিটির মধ্যে বিরাট্ সম্ভাবনার ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রতি প্রগাঢ় আস্থার নিদর্শন স্বরূপ বক্তৃতা, রচনা আর গানের মাধ্যমে তার অনুকূলে বিধিবদ্ধভাবে প্রচারকার্যও অনেক করেছেন। নিজে তিনি সম্ভাবিত নাট্য-সঙ্গীতের চেহারা কল্পনায় আঁচ করে নিয়ে সেই ধাঁচে কতকগুলি বাংলা গানও রচনা করেছেন। কৃষ্ণধনের পরিকল্পিত নাট্যসঙ্গীত বাস্তবতঃ কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে সে সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা যায় না। অকপটে স্বীকার করব, এ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ইউরোপীয় অপেরার কথা জানি, এ দেশীয় গীতিনাট্যের ঐতিহ্যও সুবিদিত, পুরাতন দিনের কবি তর্জা আর রামলীলার গানের চেহারাটাও আমাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু নাট্যসঙ্গীত যথার্থ কী বস্তু তার রূপ এখনও এ দেশের সাঙ্গীতিক ধারণায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি বলেই আমাদের ধারণা। তবে নামের মধ্যে অনেক সময় পরিচয়ের তত্ত্ব লুকানো থাকে, সেই দিক থেকে নাট্য-সঙ্গীতের একটা রূপ কল্পনা করা যেতে পারে।

নাট্যসঙ্গীত মানে যদি এই হয় যে তা হবে মুখ্যতঃ নাট্যরসপ্রধান সঙ্গীত, বাণী আর সুরের দিক থেকে তাতে নাটকীয় রসের প্রচুর উপাদান থাকবে, তার রূপ একক না হয়ে হবে যৌথ, তা হলে নাট্যসঙ্গীতের প্রতি সাগ্রহ সমর্থন না জানিয়ে পারা যায় না। এবং যুগধর্ম আর সমাজসচেতন মানুষের পরিবর্তনপ্রবণতা বিচার করে সেই দিকেই যে ভারতীয় সঙ্গীতের—যে-কোন সঙ্গীতের—মোড় ফেরানো উচিত তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু এ পথে বাধা বিস্তর। ভারতায় সঙ্গীত এবং তার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপগুলি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাতে উক্ত মহৎ সম্ভাবনা অনতিদূর ভবিষ্যতে কার্যতঃ

রূপান্তরিত হবার কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে দু একটি অস্ফুট লক্ষণ দেখে উল্লসিত হওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলি। যাত্রা কথকতা কবি তর্জা পাঁচালী প্রভৃতি যৌথ সংবেদনমূলক সঙ্গীত এ দেশীয় সঙ্গীতের লৌকিক ধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থাকলেও এ কথা কোনক্রমেই বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, ভারতীয় সঙ্গীতের মূল রস গীতি-কবিতার। মহাকাব্যের ঢোল তাতে অনুপস্থিত। তার সুরের ছন্দে ও ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতির প্রকাশ যত অবলীলায়িত আর স্বচ্ছন্দ, যূথবদ্ধ অনুভূতির প্রকাশ তেমন নয়। প্রাচীন কালের ভারতীয় সঙ্গীতে অবশ্য সামগান, স্তোত্রপাঠ, আভিচারিক সঙ্গীত ইত্যাদি যূথবদ্ধ সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে সে অধ্যায় বহুকাল আমবা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। প্রাচীন মহাকাব্যের যুগ অতিক্রম করে যেমন আমবা অধুনা খণ্ড কবিতার যুগে প্রবেশ করেছি, তেমনি সঙ্গীতেও যৌথ সংস্কার ঘুচে গিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে অনেক কাল। এরূপ হওয়াব প্রধান কারণ এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ঝোঁক সুরৈশ্বর্যের প্রতি। আর এই সুর প্রধানতঃ ব্যক্তি-নির্ভর। যৌথ অনুভূতি সঙ্গীতের মধ্যে পরিস্ফুট হলে সঙ্গীতের নাটকীয় সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নেই, কিন্তু সুর ক্ষুণ্ণ হয়। সুরের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ভারতীয় সঙ্গীতেব প্রাণ, তার ব্যঞ্জনা যৌথ সঙ্গীতে সামান্যই অভিব্যক্ত হতে পারে; তাব জন্যে চাই সুর-সাধকের একক প্রয়াস। ভারতীয় সঙ্গীতে কোরাসের চাইতে একক কণ্ঠের সঙ্গীত, অর্কেস্ট্রার চাইতে 'সোলো' বাদনের মর্যাদা অধিক। কেন অধিক উপরের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়বে।

এখন, নাট্যসঙ্গীতের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ভারতীয় সঙ্গীতের সুরৈশ্বর্যের সংস্কার কিছু পরিমাণে খণ্ডন না করে উপায় নেই। পূর্বেই বলেছি, যৌথ আবেদন নিয়ে যেখানে কথা, সেখানে সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য আশা করা যায় না। সেরকম গানে স্বর কিছু পরিমাণে ঋজু আর অমসৃণ হতে বাধ্য। ভারতীয় সাঙ্গীতিক মহলে সংরক্ষণশীলতার মেজাজ অতিশয় প্রবল; গোঁড়া ওস্তাদের দল সুরের সংস্কার বিসর্জন দিয়ে অমার্জিত স্বরভঙ্গির আদর্শ গ্রহণে উৎসাহ বোধ করবেন কিনা সন্দেহ। আর বাধাটা শুধু সংরক্ষণশীলতার বাধা নয়, সুরের মেজাজেরও বাধা। এতাবৎ যাঁদের কণ্ঠে সুরের চরমোৎকর্ষ

প্রকাশ পেয়েছে তাঁরা যদি অমার্জিত যৌথ সঙ্গীতে তেমন স্ফূর্তি না পান তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। হয়ত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন কোনও একদিন সংসাধিত হবে, কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে এই সংঘটনের সম্ভাবনা কম।

তবে সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হোক আর বিলম্বিত হোক, এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই সঙ্গীতামোদীদের কাজ করে যেতে হবে। বর্তমান যুগ গণচেতনার যুগ। গণচেতনার পরিধি ক্রমশঃ-সম্প্রসারিত হচ্ছে। চেতনার গণতান্ত্রিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতেরও আকাঙ্ক্ষিত গণ-তান্ত্রিকীকরণ সাধিত হবে, সঙ্গতভাবেই এই প্রত্যাশা করা চলে। শিল্পে সাহিত্যে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য গণচেতনার স্পন্দনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, সঙ্গীতে এখনও সে লক্ষণ অনুপস্থিত। ভারতীয় সঙ্গীতের নিজস্ব বিশিষ্ট গড়নের মধ্যেই এই অপূর্ণতার কারণ লুক্কায়িত রয়েছে বলে মনে হয়। কারণটি দূর করতে হবে। কেমন করে তা সম্ভব তার একটু আভাস দেওয়া যেতে পারে।

বাংলা গানের কথা ধরা যাক। বাংলা গানের সামগ্রিক পরিধির ভিতর সুরের সব চাইতে সুকুমার সব চাইতে সুচিক্কণ রূপ তুলে ধরেছে যে গান তার নাম—রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরৈশ্বর্যে ভরপূর, যদিও গায়কের সুরবিস্তারের স্বাধীনতা সেখানে অল্পবিস্তর খণ্ডিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতার মনে অত্যন্ত প্রগাঢ় আর নিবিড় অনুভূতির সৃষ্টি করে তার কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গড়ন মুখ্যতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তেমনি তাঁর গানে গীতিকবিতার আমেজটাই বড় কথা। এপিকের গুণ রবীন্দ্রশিল্পে প্রায়-অনুপস্থিত।

এই প্রসঙ্গে বিচার্য বিষয় হচ্ছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ছন্দে দোলায়িত সুরের যে পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে তার পর আর এ জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সুরকে টেনে বাড়ানোর অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে একটা পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে; সঙ্গীতের মুক্তির জন্য এখন আমাদের ভিন্ন পথে দৃষ্টির মোড় ফেরাতে হবে। ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সংবেদনময় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি; এবারে নাট্য বা সমষ্টি-সঙ্গীতের পালা।

কিন্তু বাংলা গানের ভিতর প্রস্তাবিত নূতন চেতনার চিহ্ন নেই। সেখানে এখন যে অধ্যায় চলেছে তাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অক্ষম অনুকৃতির অধ্যায়। আমরা 'আধুনিক বাংলা গান'-এর কথা বলছি। সত্য বটে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চিহ্নিত পথেই আধুনিক বাংলা গান নামধেয় সঙ্গীতের পরিক্রমা, কিন্তু শেষোক্ত গানে না আছে সুরৈশ্বর্য, না বা বাণীর সম্পদ। অন্ততঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পর এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে শ্রেষ্ঠ একক সঙ্গীতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে একাই তার সমস্ত সম্ভাবনা উজাড় করে দিয়ে গেছেন। ওই পথে সুরকে অধিকতর শ্রীমণ্ডিত করবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আজকের দিনে বড়জোর রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর দাগা বুলনো চলতে পারে, কিন্তু সে ধারার আর শ্রেষ্ঠতর বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্গীত উৎকর্ষের শেষ সীমায় কবেই পৌঁছে গেছে।

তবে কী জন্য বাংলার আধুনিক সুরকার আর গায়ক সম্প্রদায় আধুনিক বাংলা গানের পিছনে অযথা শক্তি ক্ষয় করছেন? নূতন সম্ভাবনার পথে কেন তাঁরা পা বাড়াবেন না? গানের বাণীতে আর সুরযোজনায় কেন তাঁরা ব্যষ্টির চেতনার উপর সমষ্টি-চেতনাকে প্রাধান্য দেবেন না?

সত্য বটে যৌথ সঙ্গীতের সংস্কার এখনও এদেশে গড়ে ওঠে নি, তবে গড়ে ওঠবার পথে বাধাই বা কোথায়। ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে 'কোরাস'-এর আদর্শ আমরা বহু পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এই দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ-এর মর্যাদা দাবি করতে পারেন। পরবর্তী যুগে অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং দিলীপকুমার কোরাস-গানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। রেওয়াজটা মরে যায় নি, বরং দিন দিন বাড়ছে। এই পথে আরও পরীক্ষা চালাবার অবকাশ স্পষ্টতঃই বিদ্যমান।

এতাবৎ বাংলায় যে সমস্ত কোরাস গান তৈরি হয়েছে সেগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাতে সুরের দিক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। সে সব গানে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কথার উপর। জাতীয়তার অনুপ্রেরণা থেকে তাদের জন্ম, তাই কথা তাদের ভিতর স্বভাবতঃই মুখ্য মর্যাদা লাভ করেছে। গানের বাণীতে দেশাত্মবোধ, বীর্যভাব অথবা সমষ্টিগত

উল্লাস-উদ্দীপনের চেষ্টা প্রকট। সুর কথার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। সুরের মধ্যে আছে নেহাৎ ইমন, ভূপালী জাতীয় দুচারটি রাগের মোটা প্রভাব, নয়ত ইউরোপীয় কোরাস-এর অস্ফুট সুরভঙ্গি। আবার দেশী-বিদেশী সুরভঙ্গির মিশ্রণের দৃষ্টান্তও আছে।

এই সুরকে আগামী দিনের যৌথ সঙ্গীতের প্রার্থিত সুরের মান রূপে কোনক্রমেই গণ্য করা চলে না। সমষ্টি-সঙ্গীত একক সঙ্গীতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অমার্জিত হওয়াই স্বাভাবিক, তাই বলে তাকে কোরাস-ভঙ্গিম নিতান্ত বৈশিষ্ট্যবর্জিত সাদামাঠা সুর আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। আরও সূক্ষ্ম সুরের ভর তার উপর চাপানো যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন নূতন সঙ্গীতের আদর্শকে মর্যাদা দেওয়া হবে, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট ঐতিহ্যটিকেও বর্জন করা হবে না। ভারতীয় সুরসমৃদ্ধির সংস্কার অক্ষুণ্ণ রেখে, সুরবিকাশের দাবি যথাসম্ভব মেনে নিয়ে সমষ্টি-সঙ্গীতের রূপ যতটা ফুটিয়ে তোলা যায় সে চেষ্টা করা দরকার। সেইটিই হবে আগামী দিনের ভারতীয় সঙ্গীতকারদের প্রধান সাধনা।

যৌথ সঙ্গীতের বিশিষ্ট রূপটি ফোটাবার জন্য সুরের ভিতর পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ঢঙ ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের আদর্শ বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের রক্ষণশীল সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হলেও তাঁর মনটি ছিল বিপ্লবী চিন্তায় পূর্ণ। নয়ত রবীন্দ্রযুগেরও পূর্বে বসে তিনি নাট্য-সঙ্গীতের পরিকল্পনা করতে পারতেন না। যে সময়ে বাংলা দেশে বলতে গেলে একক সঙ্গীতেরই যথাযথ বিকাশ হয় নি, বাংলা গান বলতে বোঝাত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ কিংবা খেয়ালের কল্পনাবিরহিত অন্ধ অনুকরণ অথবা নিতান্তই খেমটা জাতীয় সস্তা থিয়েটারী সুরের গান, সেইকালে এই সঙ্গীত-কোবিদের চিন্তায় নাট্যসঙ্গীতের সম্ভাবনা প্রতিভাত হয়েছিল—এ যে কত বড় দুর্ধর্ষ আর বলিষ্ঠ কল্পনা তা আজকের দিনে আমরা বোধ করি সম্যক্ ধারণাও করতে পারি না। কৃষ্ণধনের বেলায় এটা সম্ভব হয়েছিল বোধ করি এই কারণে যে, তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইউরোপীয় সঙ্গীতের আদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগ এত প্রগাঢ় ছিল যে, তিনি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতবাসীদের সঙ্গীত শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন

এবং এই পক্ষপাতের কার্যকরী নিদর্শন স্বরূপ তাঁর সেতার-শিক্ষার বইয়ের সমস্ত গৎ আগাগোড়া ইউরোপীয় স্বরলিপিতে সংবদ্ধ করেছিলেন। কৃষ্ণধনের সমসাময়িক কালের পক্ষে এটিও আরেকটি অমিত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এ সমস্ত লক্ষণ থেকে অনুমান করা চলে, ইউরোপীয় সঙ্গীতাদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধনের মনে নাট্যসঙ্গীতের স্বপ্ন জেগেছিল।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য যৌথ সঙ্গীতের বিশেষ অনুকূল। কি সে দেশের কণ্ঠসঙ্গীত, কি যন্ত্রসঙ্গীত নাটকীয় সম্ভাবনায় ভরপুর। আর এই নাটকীয়তা যে যৌথ সঙ্গীতের একটি মৌল উপাদান তা আশা করি এখানে বিশ্লেষণ করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। ইউরোপীয় সঙ্গীতের গোটা কাঠামো যে মূল বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার নাম 'হার্মনি'। ভারতীয় সঙ্গীত 'মেলডি'-ভিত্তিক। হার্মনি মেলডির ঠিক বিপরীত। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় মেলডি বলতে বোঝায় স্বরের পরম্পরা—এক স্বরের পর অন্য স্বরের ক্রমিক বিন্যাস এবং তার ফলে সুরমাধুর্যের সৃষ্টি ; কিন্তু হার্মনিতে স্বরের ধারাবাহিকতা অপ্রধান, সেখানে মূল কথা হল বিভিন্ন স্বরের পাশাপাশি অবস্থান, তা সে স্বর একটি থেকে অন্যটি যতই অসম প্রকৃতির হোকনা কেন। হার্মনির প্রক্রিয়া সংঘাতের মধ্যে ঐক্যের প্রক্রিয়া ; বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী অসম সুরভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া। একই গানে বা বাদনে এই যে বিপরীতধর্মী বিরোধী সুরের সংঘাত অথচ সমন্বয়, এটি নাটকীয়তার সবিশেষ পরিপোষক। যেমন নাটকের প্রাণ সংঘাতে ও সমন্বয়ে এও ঠিক তাই।

এই-যে বিভেদের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ, এটি সমষ্টি-ভাবের বিশেষ অনুকূল। মানুষের ভিন্ন রুচি, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মানুষ যখন সমষ্টির একজন তখন এই ভিন্নতার চেতনা অপসৃত হয়ে তার মধ্যে 'সামান্য' ধর্মের প্রাধান্য। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ধার ক্ষয়ে গিয়ে তখন সে man in the mass, পিণ্ডীভূত মানুষ। ইউরোপীয় সঙ্গীতের সংস্কার এই ভাবটি পরিস্ফুরণের বিশেষ সহায়ক। কাজেই যৌথ সঙ্গীতের আদর্শ বাস্তবায়িত করার সময় ইউরোপীয় সঙ্গীতকলার অনুধ্যান এবং অনুশীলন বিশেষভাবেই প্রয়োজন হবে বলে মনে করি।

সঙ্গীত ও রুচি

সঙ্গীতের আলোচনায় ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা একটা মস্ত বড় বিচার্য বিষয়। কোন্ শ্রেণীর গান কেমন লাগবে সেটা প্রধানতঃ নির্ভর করে যিনি গান শোনেন তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি আর শ্রুতিগত অভ্যাসের উপর। শিল্পীর নিজস্ব উৎকর্ষ অথবা গীত গানের শ্রেণীগত উৎকর্ষ এই ক্ষেত্রে ভাল-লাগার একটি প্রধান নির্ণায়ক হলেও একমাত্র নির্ণায়ক নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজের কথা বলি। স্বকীয় অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত নিজের কাছে সব চাইতে বেশী প্রত্যক্ষ সুতরাং সব চাইতে উজ্জ্বল। অপরের কথা বলতে গেলে শুদ্ধমাত্র চক্ষুগত প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়; নিজের বেলায় মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রমাণটাও স্পর্শগ্রাহ্য। আত্মবিশ্লেষণের সুবিধা এই যে, ওতে মন-গড়া ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কাজ চালাবার প্রয়োজন হয় না; পক্ষান্তরে অপরের মনোবিশ্লেষণের বেলায় অনুমান ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। সেই কারণে সর্ববিধ প্রমাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের অবতারণা সমধিক প্রশস্ত। বিশেষতঃ রুচির আলোচনায় সে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ আর অপরিহার্য বলেই মনে হয়। আর কোন কারণে যদি না হয় এই কারণে অন্ততঃ পাঠকবর্গ যেন লেখকের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবতারণার ব্যাপারটিকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন।

লেখকের সবচেয়ে ভাল লাগে হিন্দুস্থানী খেয়াল গান কিংবা খেয়াল-ভঙ্গিম বাংলা গান। তার পরেই কীর্তন। ভাটিয়ালি বাউল দেহতত্ত্ব মালসি এ সবও লেখকের অত্যন্ত প্রিয়। আপাততঃ এই দুই শ্রেণীর ভাল-লাগার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে নিজেকে যতদূর জানি তা থেকে বলতে পারি, ব্যাপারটা সামঞ্জস্যহীন নয়। যে কথা দিয়ে নিবন্ধের সূত্রপাত করেছি সে কথা পুনরায় বলি। গান ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মানসিক গঠন আর রুচি মস্ত বড় জিনিস, গানের শ্রেণীগত উৎকর্ষের সঙ্গে এই ভাল-লাগা মন্দ-লাগার বিশেষ সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, অধিকাংশের মতে যে গান শ্রেষ্ঠ সে গান আপনার মতে শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে; অপরের বিবেচনায় যে গান মন্দ সে গান আপনারও যে মন্দ লাগবে এমন

কোন কথা নেই। আপনার মানসিক গঠনই এই ক্ষেত্রে আপনার রুচির মূল বিধায়ক।

এই মানসিক গঠনও আবার বিশেষ কতকগুলি অবস্থাগত প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। যিনি যে প্রভাবের মধ্যে বড় হন তিনি সেই প্রভাব চিরজীবন আপনার মধ্যে বহন করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাল্য বা কৈশোরেই এই প্রভাবের গতি ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে যেটা ঘটে সেটা প্রায়শঃ প্রভাবের সম্মার্জন বা সম্প্রসারণ, তার বেশী কিছু নয়। নতুন রুচি তৈরীর বয়স তখন আর থাকে না। নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহ হয়তো অর্জিত হয়, মানসিক সচলতার গুণে নানা বিভিন্ন দিকে হয়তো কৌতূহল-দৃষ্টি প্রসারিত হয়, কিন্তু রুচি বড় একটা আর বদলায় না। প্রথম জীবনে আপনার রুচি একটা বিশেষ ছাঁচে তৈরি হয়ে গেছে, সেই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির ছাপ আপনার উত্তর জীবনের সকল কর্মে প্রতিভাত। শৈশব বাল্য ও কৈশোরের অর্জিত সংস্কার চিরজীবন লালন ও বহন করা আমাদের বিধি-নির্দিষ্ট নিয়তি।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শৈশবসংস্কার শ্রুতিগত অভ্যাস দ্বারা বহুলাংশে গঠিত। ছোটবেলায় কে কোন্ জাতের গানের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন সেইটিই মূলতঃ তাঁর সাঙ্গীতিক সংস্কারের জনক। নিজের কথা বলি। আমার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কেটেছে কুমিল্লায়। কুমিল্লা ত্রিপুরা জিলার সদর, এখন এটি পাকিস্তানভুক্ত এলাকা। বাংলা দেশের পূর্বপ্রত্যন্ত অঞ্চলগত এই ত্রিপুরা জিলা সঙ্গীতানুশীলনের জন্য বিখ্যাত। অনেক প্রথম শ্রেণীর রাগসঙ্গীতশিল্পী ত্রিপুরার মাটিতে আবির্ভূত হয়েছেন। ভারতবিশ্রুত স্বরোদশিল্পী ওস্তাদপ্রবর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জন্ম এই ত্রিপুরাতেই। আলাউদ্দিন খাঁ সাবের স্বকীয় বংশে এবং তাঁদের আত্মীয় পরিবারগুলিতে বংশগত ভাবে সঙ্গীতের চর্চা হয়ে এসেছে। খাঁ সাহেবের অগ্রজ আফ্তাবুদ্দিন খাঁ সাহেব একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী ছিলেন। তাঁর অনবদ্য বাঁশীবাদন-নৈপুণ্যের স্মৃতি সঙ্গীতামোদী কলিকাতাবাসীর চিত্তে এখনও জাগরূক রয়েছে।*

ত্রিপুরা জিলার আকাশে-বাতাসে রাগসঙ্গীতের আবহাওয়া সঞ্চারিত

* 'সঙ্গীতে তিনপুরুষ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

ছিল। এই আবহাওয়ায় আমরা বড় হয়েছি, ফলে আমাদের মধ্যে রাগসঙ্গীতপ্রীতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তত্ত্বগত ভাবে এ কথা আমি জানি যে, রাগসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ রুদ্ধ, সঙ্গীতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিঃশেষিত, এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু নিবন্ধাদিও লিখেছি ; কিন্তু এই তত্ত্বগত বিশ্বাসের সঙ্গে আমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার সম্পর্ক নেই। ছোটবেলা থেকে আমার কান রাগসঙ্গীত শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়েছে, সেই অভ্যস্ততার দ্বারা আমার রুচি নির্মিত হয়েহে। খেয়াল গানে আমার শ্রবণের সমধিক স্ফূর্তি, কেন না রাগসঙ্গীতের এই বিশেষ শাখার গানের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতম। আমার এক সঙ্গীতনিষ্ঠ গায়ক বন্ধু ছিলেন, তিনি এখন স্বর্গত, তাঁর কুমিল্লার গৃহে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের প্রচুর গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। আমরা কৈশোর কালে তাঁর গৃহে নিয়মিত সমাগত হয়ে সেই রাগসঙ্গীতসুধা আকণ্ঠ পান করেছি। জোহ্‌রা বাই, গহরজান, আগ্রাওয়ালি মালকা জান, জানকী বাঈ এঁদের রেকর্ড আজকাল দুষ্প্রাপ্য, আমরা ছোটবেলায় এঁদের গানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলাম। কুমিল্লায় মহম্মদ খুরসীদ নামে একজন গায়ক ছিলেন, গজল গানে তিনি পারদর্শী শিল্পী, খেয়াল ঠুংরীতেও তাঁর কুশলতা কিছু কম নয়। বিশেষ করে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক (theoretical) বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। এই ওস্তাদপ্রবরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের আমার সুযোগ হয়েছে। এ ছাড়া সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, কুমার শচীন দেববর্মন এঁদের সঙ্গেও পরিচয় ছিল নিবিড়।

এর পর কলকাতা আসি এবং কলকাতার সাঙ্গীতিক মহলে মেলামেশার সুযোগ পাই। কলকাতার রাগসঙ্গীতকারদের সঙ্গেই সঙ্গ করি বেশী।

এই সব বিবিধ অবস্থাগত যোগাযোগের ফলে—যার উপর আমার নিজের কোন হাত ছিল না—সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমার রুচি একটা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়েছে। রাগসঙ্গীত, বিশেষ করে খেয়াল গানকে ঘিরে আমার রুচি নিরূপিত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আজ চেষ্টা করলেও এই রুচির প্রভাব অতিক্রম করতে পারি না। রাগসঙ্গীতের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ভিতর এমন অনেক বিষয় আছে যা বুদ্ধিগত বিচারে আজ বিসদৃশ মনে হয়, কিন্তু এটা হল নিছক মনন-প্রক্রিয়া, তার সঙ্গে সত্যিকার পছন্দ-অপছন্দের যোগ নেই।

এই গেল সাঙ্গীতিক রুচির এক দিক। অন্যপক্ষে ছোটবেলায় লোক-সঙ্গীতের নানা ধারার সঙ্গেও পরিচয়লাভের সুযোগ হয়েছিল। আমরা শহরের যে অঞ্চলে ছিলাম সেটি শহর ও পল্লীর মধ্যবর্তী সন্ধি-এলাকা। সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তর, তার পাশ দিয়ে ধূলিওড়ানো পায়ে-চলা পথ দূর গ্রামের সীমানায় গিয়ে মিশেছে। গ্রামের হাটুরেরা এই পথ দিয়ে শহরে নিত্য বেচাকেনা করতে আসত। চোখের উপর সুবিস্তৃত ছিল ঢেউ-খেলানো দিগন্তবিসারী ধানক্ষেত, তার আলবাঁধা পথে চাষীদের নিত্য সমাগম। নানারকম গেঁয়ো গানের সুরে এই সকল পথঘাট মুখরিত ছিল। ছোটবেলায় এই সব অতি প্রিয় পল্লীর মানুষের কল্যাণে ভাটিয়ালি, মালসি, মারাফতী, দেহতত্ত্বজাতীয় গান বহু শুনেছি। সে সকল গানের সুর আমার সাঙ্গীতিক জীবনের উপর সুগভীর ছাপ রেখে গেছে। আমাদের শহরে বৈষ্ণবদের কয়েকটি আখড়া ছিল। সেই সব আখড়ার ভিক্ষুকেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে কীর্তন গাইত। খুব ভোরে জাগরণী গান গেয়ে শহরবাসীর ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া এদের নিয়মিত কাজের একটি অঙ্গ ছিল। গোপীযন্ত্র আর খঞ্জনী সহযোগে এরা যখন দল বেঁধে গাইত "জাগ গো বৃন্দাবনবাসী" তখন অতি বড নিদ্রাবিলাসীরও শয্যা আঁকড়ে পড়ে থাকা কঠিন ছিল।

এ সকল কথা বলছি এইটি দেখাবার জন্য যে, লেখকের মধ্যে দুটি সাঙ্গীতিক ধারা সমান্তরাল রেখায় নিরন্তর প্রবাহিত হয়েছে। একটি বিদগ্ধ সঙ্গীত, অপরটি লোকসঙ্গীত। আমার জীবনে এই দুই ধারার মধ্যে বিরোধের কোন উপলক্ষ ঘটে নি, ক্রমাগত শ্রুতিগত অভ্যাসের ফলে এই দুই ধারার গানকেই আত্মস্থ করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কীর্তন আসলে বিদগ্ধ সঙ্গীতেরই একটি শাখা, তার উচ্চ তান-লয়-মান-সুর সবই অনুশীলনসাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু আমরা যে ধরনের কীর্তনের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম তার রঙ আর রস বিশেষভাবে লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যের স্মারক। মূলতঃ সে সব গান লোকসঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ছোটবেলা থেকে কীর্তনের প্রতি আমার একটা সহজ পক্ষপাতিত্ব পড়েছে। এমন নয় যে আমি ভক্তিবাদী মানুষ, বরং তার উল্টো। তবু কেন জানি না কীর্তনের সুর আমাকে গভীরভাবে টানে। এই সুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর আকুতি, এমন একটা ক্রন্দনের বেগ আছে, যা অল্পবিস্তর

সুরবোধসম্পন্ন মানুষমাত্রকেই অভিভূত করতে বাধ্য।* ভক্তিবাদীরা বলবেন ওই আকুতির মূলে ভক্তি, পরমপ্রিয় ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হবার উদগ্র কামনা থেকে ক্রন্দনাকুলতার জন্ম (দিলীপকুমার কীর্তনের তথাকথিত ভক্তিমূলকতার জন্য কীর্তনকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আখ্যা দিয়েছেন); কিন্তু এ কথা মেনে নিতে মন সম্পূর্ণ সায় দেয় না। বরং আমার তো মনে হয় কীর্তনের সুরের উৎকর্ষ তার ভক্তিমূলকতার জন্য ততটা নয় যতটা তার গঠনগত (structural) বৈশিষ্ট্যের জন্য। ভক্তিই কী আর অ-ভক্তিই কী, কীর্তনের সুরের আবেদন তার নিজস্ব। সাধারণতঃ পদাবলীর পদে অথবা যে-কোন কবির রচিত কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক গানের বাণীতে কীর্তনের সুর যোজনা করা হয়, কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ রীতির মধ্যেই যে কীর্তনের সুরকে চিরকাল আবদ্ধ রাখতে হবে তার কী কথা আছে? ভুলেও কি আমরা কীর্তনাঙ্গ সুরের গানে অ-ভক্তিমূলক কথা বসাতে পারব না? এখন পর্যন্ত এই দিক দিয়ে ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও হয় নি, তবে প্রচেষ্টা হতে ক্ষতি কী। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুস্পষ্ট অবকাশ আছে এবং সে পরীক্ষা অচিরে আরম্ভ হওয়া উচিত। তাতে আর-কিছু ফল হোক না হোক এইটুকু অন্ততঃ জানা যাবে যে, কীর্তনাঙ্গ সুর ভক্তির আশ্রয় ছাড়াও বিকশিত হওয়া সম্ভব। কথা ও সুরের বিতর্কের প্রসঙ্গে এ কথা বহুবার বহু জনে বলেছেন যে, সুরের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, সেটি কথার উপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। যন্ত্রসঙ্গীত এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তত্ত্বটি এই প্রসঙ্গে বিচার করতে অনুরোধ করি। এক-একটি সুর আছে যার ভঙ্গির মধ্যেই ক্রন্দনাকুলতার ভাব বিদ্যমান, গানের বাণীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন ভীমপলশ্রী, ঝাঁঢ়, খাম্বাজ, পটদীপ, বেহাগ প্রভৃতি রাগিণী। খাম্বাজ সুর কীর্তনের একটি প্রধান অবলম্বন। কীর্তনের অন্তর্নিহিত যে ক্রন্দনভাব বা wailing আমাদের বিমুগ্ধ করে, তার মূল এইখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্যপক্ষে, ভাটিয়ালি সুরের মধ্যে আছে ঝাঁঢ়, খাম্বাজ, ভীমপলশ্রী, পটদীপ প্রভৃতি রাগিণীর আমেজ। ভাটিয়ালির ক্রন্দনাকুলতার মূলও এইখানে।

কী কথায় কী কথা এসে গেল। তবু কথাটা বলবার প্রয়োজন

* "বাংলা দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটা অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ"—রবীন্দ্রনাথ।

ছিল, এই প্রসঙ্গে বলে স্বেচ্ছা-আরোপিত কর্তব্যপালনের স্বস্তি বোধ করছি।

আসলে রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের ধারার মধ্যে মূলগত কোন বিরোধ নেই। বরং উল্টো। এ দুয়ের ভিতর কোথায় যেন একটি সুগভীর ঐক্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ কথার প্রমাণ এমন দু'চারজন শিল্পীর গান যাঁরা একই কালে রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতকে তাঁদের কণ্ঠনৈপুণ্যের সীমার মধ্যে বেঁধেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুমার শচীন দেববর্মনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আমাদের ত্রিপুরারই একজন বিশিষ্ট গায়ক। আজকাল যাকে classico-modern গান বলা হয় এই ধারার গানে শচীন দেববর্মন একজন কৃতী শিল্পী। এই জাতীয় গানে রাগসঙ্গীতের জ্ঞান অপরিহার্য, কেন না সুরবিস্তার ছাড়া classico-modern গান হয় না। সুরবিস্তার-প্রক্রিয়ায় দুটি জিনিস আবশ্যক : রাগ-রাগিণীর জ্ঞান এবং কণ্ঠসাধনা। এ দুটিতেই দেববর্মনের কুশলতা বর্তমান। অন্যপক্ষে দেখুন, তিনি উৎকৃষ্ট একজন লোকসঙ্গীতশিল্পীও বটেন। ভাটিয়ালি সুরের গানে তাঁর সমকক্ষ গায়ক আছে কিনা সন্দেহ। কুমার শচীন দেববর্মন যে কণ্ঠসম্পদপ্রসাদাৎ রাগপ্রধান গান সুনিপুণভাবে গেয়ে থাকেন সেই একই কণ্ঠের দ্বারা তিনি লোকসঙ্গীতের বিশিষ্ট শাখা ভাটিয়ালি গানের প্রতিও সুবিচার করছেন। এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, লোকসঙ্গীতের ধারা রাগসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্কে সম্পর্কিত; একটি বাদে অপরটির ধারণা অসম্পূর্ণ থাকে। রাগসঙ্গীতের জ্ঞান লোকসঙ্গীতের স্ফূর্তির সহায়ক; রাগসঙ্গীতের দৃঢ়সংবদ্ধ ঋজু কাঠিন্যের ভিতর সচলতা সঞ্চারের জন্য লোক-সঙ্গীতের সাহায্য অত্যাবশ্যক।

'আধুনিক বাংলা গান' বর্গীয় গান আমার তেমন ভাল লাগে না। তার কারণ এ নয় যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আধুনিকতার আমি বিরোধী, তার প্রধান কারণ এই যে আধুনিক বাংলা গান অর্কিডের ফুলের মত মূলহীন সুরের গান। তাতে না আছে রাগসঙ্গীতের আমেজ, না পাই লোকসঙ্গীতের রস। কথা এই জাতীয় গানের প্রধান আশ্রয়, আর সে কী কথা! কাব্যের প্রতি যাঁর সামান্য আসক্তি আছে তাঁব প্রাণ আধুনিক গানের কথায় 'পালাই পালাই' করবার উপক্রম। 'আধুনিক বাংলা গান' একটি কিম্ভুত সৃষ্টি।

এতে বাণীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথচ বাণীর ভাবসমৃদ্ধি কিংবা লালিত্য কোনটিরই প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি দেওয়া হয় না—সুরৈশ্বর্য এই গানে নেই বললেই চলে। রাগসঙ্গীতের স্বীকৃত অভ্যাসগুলির কোন একটিও এই ধারার গানে অনুসৃত হয় না; না সুরযোজনায় রাগভঙ্গির আশ্রয় লওয়া হয়, না গান কণ্ঠায়িত করবার কালে সুরবিস্তার করা হয়। গিটকিরি কিংবা তানকর্তব তো দূরস্থান। গিটকিরি তানকর্তব ইত্যাদি খুব ভাল জিনিস তা বলি নে, খেয়াল গানের ক্ষেত্রেও এগুলির আতিশয্য পীড়াদায়ক; তবে প্রয়োজন হলেও এগুলির সাহায্য গ্রহণ করা যাবে না সেই বা কেমন কথা? আধুনিক বাংলা গানে আলাপ সুরবিস্তার তানকর্তব না হয় নাই থাকল, কিন্তু তাদের স্থলাভিষিক্ত হবার মত অন্য কোন অলঙ্করণও তো তাতে নেই? কেবল দুটি বস্তু আধুনিক বাংলা গানে দৃশ্য: সুরের ভঙ্গিতে কথার আবৃত্তি; আর সুরের নিরঙ্কুশ নির্বিচার মিশ্রণ। দুটি প্রক্রিয়াই সমান অশ্রদ্ধেয়।

অন্যপক্ষে আধুনিক বাংলা গানের সু[illegible]সমৃদ্ধির জন্য লোকসঙ্গীতের সুবৃহৎ ভাণ্ডার থেকেও বিশেষ কোন উপকরণ গ্রহণ করা হয় না। আধুনিক বাংলা গানের সুরভঙ্গির ভিতর না পাওয়া যায় বাউল-ভাটিয়ালির আমেজ, না পাওয়া যায় কীর্তনের রস। একেবারেই লোকসঙ্গীতের আমেজ কিছু পাওয়া যায় না বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ করা হবে, তবে লোকসঙ্গীত-ভঙ্গিম আধুনিক বাংলা গানের সংখ্যা 'কোটিতে গোটিক' বললেও চলে। রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত এতদুভয়ের যে-কোন একটির প্রতি যাঁর পক্ষপাত আছে আধুনিক বাংলা গান কদাপি তাঁর নিকট শ্রবণানন্দদায়ক হতে পারে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত আধুনিক গান হলেও তার স্বাদগন্ধ সম্পূর্ণ আলাদা। লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর প্রচুর উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছে, সেই কারণে তার রূপ এত মনোগ্রাহী। এই প্রসঙ্গে পুনরায় ব্যক্তিগত রুচির কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমার প্রীতি অর্জিত, সহজাত নয়। তার একটি প্রধান হেতু বোধ করি এই যে, বাল্যবয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস গ্রহণের সৌভাগ্য আমার খুব বেশী হয়নি। এমন নয় যে একেবারেই রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছু শুনি নি বা জানতুম না;—খুব ছোটবেলার শোনা অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে

এখনও মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে। কিন্তু তার পরে একটানা দীর্ঘকাল হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যেই সময় কেটেছে। ফলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাবিধ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন আর অনুরাগপরায়ণ হওয়া সত্ত্বে ওই সঙ্গীতের প্রকাশকলার দিক আমার মনোহরণ করতে পারেনি। জানি রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং দেশ-বাসীর মধ্যে এ সঙ্গীতের যত অনুশীলন হয় ততই জাতির কল্যাণ। কিন্তু আমার এ চেতনা যতটা বুদ্ধিসঞ্জাত ততটা হৃদয়সঞ্জাত নয়। বাল্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়ার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি কেমন যেন একটা বিমুখতা থেকে গেছে, পরবর্তী অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই গ্লানির শোধন হয় নি। সম্ভবতঃ রাগসঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তিমাত্রের জীবনের অভিজ্ঞতাই এই রকম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরভঙ্গির মধ্যে সুরবিস্তারের আস্বাদ পাওয়া যায় না বলে তাঁর সুরবোধ অল্পবিস্তার অতৃপ্ত থাকাটা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রিয়দেরও এতে ক্ষোভের কোন কারণ নেই। কেন না এইটিই স্বাভাবিক, এইটিই প্রত্যাশিত। যাঁদের রুচি একনিবিষ্ট অভ্যাসের ফলে একটা বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠেছে তাঁরা ইচ্ছা করলেই তাঁদের রুচিকে ভিন্ন মুখে চালিত করতে পারেন না। রুচি বা অভ্যাস সবই গড়ে ওঠে অবস্থাগত নানা যোগাযোগের ফলে, পরিপার্শ্বের প্রভাবে—এই অবস্থা বা পরিপার্শ্বের উপর মানুষের সামান্যই হাত। রাগসঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তিদের রুচি যেমন এক দিক থেকে অপূর্ণ তেমনি একই যুক্তি অনুসরণ করে বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তিদের রুচিও অন্য আর-এক দিক থেকে অপূর্ণ। তাঁদের ভিতর রাগসঙ্গীতের চেতনা দুর্বল। সুরযোজনায় রবীন্দ্রনাথ রাগসঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে বিচিত্র উপাদান আহরণ করেছেন, তার দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীত নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে; কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে রাগসঙ্গীতজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণ পাই না। এই জন্য অবশ্য তাঁদের দোষ দেওয়া বৃথা, কেন না এক-এক আবহাওয়ার এক-এক রকম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলনে যাঁরা বিধিবদ্ধভাবে নিয়োজিত আছেন তাঁরা রাগ-রাগিণীর কথা তত ভাবেন না যত ভাবেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বিশ্বস্ততার সহিত অনুসরণের কথা। রাগরূপ বা স্বরের গঠন নিয়ে তাঁদের চিন্তা নয়, তাঁদের চিন্তা স্বরলিপি নিয়ে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে

রবীন্দ্রসঙ্গীতকারদের মধ্যে রাগসঙ্গীতের জ্ঞান অপূর্ণ থাকবে সেটা আর এমন কী বেশী কথা।

যে যাঁর রুচি নিয়ে থাকুন, তা নিয়ে বিবাদ করা চলে না, তবে রাগসঙ্গীতমনস্ক ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে আমার যে আপত্তি সে অন্য কারণে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরবিস্তারের স্বাধীনতা না থাকায় কান যেন সম্পূর্ণ ভরে না। কোথায় যেন মনের কোণায় সুরের জন্য আরও প্রত্যাশা থেকে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কদেরও এই ক্ষেত্রে কিছু করবার নেই, কেন না তাঁদের হাত-পা বাঁধা, নিরূপিত সুরের সরণি থেকে তাঁদের গান একচুল এদিক ওদিক হলেই তাঁরা সুরবিশুদ্ধির আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন। সুরের রাগরূপ যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে সুরের এই পূর্ব-নির্দিষ্টতা ও অতিনির্দিষ্টতা কিঞ্চিৎ ক্লেশকর মনে না হয়ে পারে না।

আর একটি কথা। রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যের অনুমোদিত পন্থায় স্বরসাধনা করলে সপ্তস্বর কণ্ঠে সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়ে যায়। রাগসঙ্গীতকারদের স্বরের উচ্চারণ আর আধুনিক সঙ্গীতকারদের স্বরের উচ্চারণে যোজনব্যাপী পার্থক্য। রাগসঙ্গীতসম্মত কণ্ঠমার্জনার অভ্যাস গায়কের আছে কি নেই সেটা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলে এক লহমায় বলে দেওয়া যায়। প্রথামত এবং নিয়মবদ্ধভাবে স্বরসাধনা যিনি করেন নি তাঁর কণ্ঠে সুর কখনও স্থায়ী হওয়ার সুযোগ পায় নি। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাসা-ভাসা সুতরাং আংশিক অতৃপ্তিকর। আধুনিক তথা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের অধিকাংশেরই কণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে সুমিষ্ট, কিন্তু অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্য যে, সেই সুমিষ্ট কণ্ঠ প্রায়ই সুরে বলে না। দীর্ঘ-দিনের চর্চার ফলে স্বর কণ্ঠে দৃঢ়রূপে প্রোথিত না হলে কণ্ঠস্বরে বেসুরো আমেজ দেখা দেবেই। সব-সময় ওস্তাদদের আওয়াজও সুরে 'বলে না', মন-মেজাজ বিগড়ে থাকলে কিংবা অন্য কোন দুর্জ্ঞেয় কারণবশতঃ অতি পরিমার্জিত কণ্ঠও সময়-সময় বেচাল হয়ে যায়। এঁদেরই যখন এই অবস্থা, তখন কণ্ঠসাধনার অভ্যাসবিবর্জিত গায়কগায়িকাদের কথা আর কী বলব। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের বিচ্যুতি সব চাইতে বেশী। দু'চারজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাঁদের কণ্ঠ যে পরিমাণে সুমিষ্ট সে পরিমাণে বেসুরো। কবির পুণ্যনামের দ্বারা কণ্ঠস্বরের এই ত্রুটি ঢাকা যায় না।

যা হোক, সঙ্গীতে স্বকীয় রুচির কথা বলছিলাম, অপরের রুচির সমালোচনায় কী লাভ। প্রতিবাদীরা ইচ্ছা করলে মদীয় রুচিতেও বহু ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেন, কেন না, বলাই বাহুল্য, মদীয় রুচিও ত্রুটিহীন নয়। মুশকিল হচ্ছে এই যে, রুচির প্রশ্নে কেউ কারও অধিকারভূমি সূচ্যগ্র পরিমাণ ছাড়তে নারাজ, তাইতেই যত বিপত্তি। একে অপরের কেবলমাত্র ভালোটুকু গ্রহণ করলে এই বিপত্তি দেখা দিত না।

॥ সমাপ্ত ॥

নির্ঘণ্ট